সোনালী রঙ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

ডি. এম. লাইব্রেরী
৪২, কর্নওয়ালিস ষ্ট্রীট · কলিকাতা - ৬

প্রথম সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৪৭

দ্বিতীয় সংস্করণ—বৈশাখ, ১৩৫৬

তৃতীয় সংস্করণ—আশ্বিন, ১৩৬৮

সাড়ে চার টাকা

৪২, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা-৬ ডি. এম. লাইব্রেরীর পক্ষে শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্তৃক প্রকাশিত ও শ্রীমুদ্রণালয়, ১২সি শঙ্কর ঘোষ লেন, কলিকাতা-৬ হইতে শ্রীসরোজকুমার রায় দ্বারা মুদ্রিত।

সোনালী রঙ

১

সে বৎসর হরিদ্বারে পূর্ণকুম্ভ মেলা। ফাল্গুন মাসের মাঝামাঝি শিবরাত্রিতে কুম্ভের প্রথম স্নান হয়ে গেছে। কুম্ভের প্রধান এবং শ্রেষ্ঠ স্নান ৩০শে চৈত্র মহাবিষুব সংক্রান্তির দিনে। দিন যতই সমীপবর্তী হয়ে আসছে, মেলার জনতা ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে। চার-পাঁচ লক্ষ সাধু সন্ন্যাসী, ধনী দরিদ্র, রাজা মহারাজা, স্ত্রী পুরুষের সে এক বিরাট যজ্ঞক্ষেত্র। শৈব, বৈষ্ণব, শাক্ত, সৌর, গাণপত্য—হেন সাধু-সম্প্রদায় নেই যার অন্তর্ভুক্ত সন্ন্যাসীগণ দলে দলে উপস্থিত হয়ে এই কুম্ভযোগ পর্বে যোগ না দিয়েছেন। 'হর হর বম্ বম', 'গঙ্গে হর হর' ইত্যাদি বাক্য সমস্বরে উচ্চারিত করতে করতে যখন দশনামী দণ্ডী, নাগা, আকাশমুখী, অঘোরপন্থী, লিঙ্গায়ৎ, কবীরপন্থী, দাদুপন্থী, দরবেশ, আউল, কিশোরীভজন, দশমার্গী প্রভৃতি বিভিন্ন শ্রেণীর সাধুগণ সারিবদ্ধ হয়ে পরে পরে গঙ্গা স্নানের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের দিকে অগ্রসর হন তখন মনে হয় যেন সর্ব শাখা-প্রশাখাপুষ্ট ভারতবর্ষের বিপুল ধর্মস্রোত পুণ্যতোয়া ভাগীরথী স্রোতে মিলিত হতে চলেছে।

চৈত্র মাসের মাঝামাঝি এমনই এক দিনে অসীমানন্দ স্বামীর সহিত

অমরেশ অনাবৃত দেহে এবং নগ্ন পদে গঙ্গাস্নানের জন্য ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটের অভিমুখে চলেছিল। যৌবনের সীমান্ত-রেখা পশ্চাতে ফেলে সে প্রৌঢ়ত্বের গণ্ডীতে উপনীত হয়েছে। বয়স তার চল্লিশের দুই-তিন বৎসব বেশিই হবে, কিন্তু অবয়বের মধ্যে অতিক্রান্ত-যৌবনের কোনও লক্ষণ প্রকাশ পায় নি। সুগঠিত গৌরবর্ণ দীর্ঘ বলিষ্ঠ দেহ, মাথায় ঘনকৃষ্ণ কুঞ্চিত কেশ, ক্ষিপ্র এবং আয়াসহীন পদন্যাস।

গঙ্গাস্নানোন্মুখ বিপুল জনস্রোতকে নির্দেশ করে অসীমানন্দ স্বামী বললেন. 'এর মধ্যে কি তুমি কোনো বস্তুই পেবে না অমরেশ? কোনো আনন্দ, কোনো তৃপ্তি? একেবারেই কিছু না?'

এক মুহূর্ত নীরব থেকে মৃদুস্মিত মুখে মাথা নেড়ে অমরেশ বললে, 'না প্রভু, যা পাব না ভয় করে হরিদ্বারে কুম্ভমেলায় এসেছিলাম, সত্যিই তার কিছুই পেলাম না। আনন্দ নিশ্চয় পেয়েছি, তৃপ্তিও হয় তো কিছু,—কিন্তু এ কথা নিরন্তর মনে হয় যে, ইহ বাহ্য আগে চল।' বলে অমরেশ হাসতে লাগল।

অসীমানন্দ বললেন, 'আগে তো নিশ্চয়ই চলবে, কিন্তু ইহ বাহ্য তাই বা কি করে বল? তারই বা প্রমাণ কোথায়?'

পূর্ববৎ সহাস্যমুখে অমরেশ বলল, 'আবার কিছুক্ষণ আগের সেই প্রত্যক্ষ ও অনুমানের তর্ক এসে পড়ছে প্রভু।'

অসীমানন্দও হাসিমুখে বললেন, 'তা এসে পড়ছে বটে, কিন্তু এসে যদি পড়ে তা হলে এই কথাই বুঝতে হবে যে, সে তর্কের এখনও শেষ হয় নি। তুমি দাশনিক, পণ্ডিত, জ্ঞানী; তুমি যুক্তিবাদী; ন্যায়ের প্রসাদগুণে তোমার যুক্তিপদ্ধতি সুস্থ ও সবল; কিন্তু অনুমানের প্রতি শ্রদ্ধাহীন হলেও তোমার চলবে না অমরেশ। যুক্তি পরিচালনার একটা বড রকম অস্ত্র হচ্ছে অনুমান।'

অমরেশ সংক্ষেপে বলল, 'এ কথা মানি।'

অসীমানন্দ বললেন, 'এ কথা মান না, কিন্তু স্বীকার কর।'

অসীমানন্দের মন্তব্য শুনে অমরেশ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল, বলল, 'আমার দুর্বলতা জানতে প্রভুর একটুও বাকি নেই।'

অসীমানন্দও হাসতে লাগলেন, বললেন, 'এড়িয়ে গেলে চলবে না অমরেশ। তোমাদের আইনশাস্ত্রও অনুমানকে এত বেশি স্বীকার করে যে, একটা কোনো ব্যাপার highly probablo কিংবা highly improbable হলে তার উপর নির্ভর করে দণ্ড অথবা মুক্তি দিতে ইতস্তত করে না।'

অমরেশ বলল, 'শুধু তাই কেন মহারাজ, বহু বৈজ্ঞানিক তথ্যই প্রথম অনুমানেরই সাহায্যে আবিষ্কৃত হয়েছে। বিজ্ঞান এবং আইনের চরমতম কথা যে highly probable এর ভিত্তির উপর নির্ভর করবে, মন তা মানতে চায় না। পরিপূর্ণ জ্ঞানের মধ্যে দিয়ে যেদিন বিশ্বাসকে পাওয়া যাবে সে শুভদিনের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু তার আগে কাল্পনিক বিশ্বাস দিয়ে মনকে ভুলিয়ে রাখতে চাই নে। সুতরাং আমার পক্ষে বহু দূরেই আছেন।'

স্মিতমুখে অসীমানন্দ বললেন, 'দূরে না হয় আছেন, কিন্তু আছেন তো?'

অমরেশও সহাস্যমুখে বলল, 'তাও ঠিক বলতে পারি নে। কিন্তু আপনি তো জানেন প্রভু, আমি আস্তিক না হতে পারি, কিন্তু নাস্তিকও নই। আমি বিশ্বাসও করি নি, অবিশ্বাসও করি নে।'

অসীমানন্দ বললেন, 'তা জানি,— তুমি বিশ্বাস কর না ঈশ্বরের অস্তিত্বে, আর অবিশ্বাস কর না ঈশ্বরের নাস্তিত্বে।'

অসীমানন্দের মন্তব্যে অমরেশ এবং অসীমানন্দ উভয়েই সমস্বরে হেসে উঠলেন। কিন্তু অদূরবর্তিনী এক যুবতীকে লক্ষ্য করে সেই উচ্চকিত হাস্যধ্বনি মধ্যপথেই স্তব্ধ হয়ে গেল। যুবতীর গতি থেকে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছিল যে, সে অমরেশদের উদ্দেশেই অগ্রসর হচ্ছে। মুখে তার উৎকট চিন্তা এবং দুঃখের অনুপেক্ষণীয় চিহ্ন।

অসীমানন্দ গতি রোধ করলেন, তারপর যুবতী নিকটে উপস্থিত হলে বললেন, 'আমাদের কি কিছু বলবে মা তুমি?'

তার করুণ দৃষ্টি অসীমানন্দের উপর স্থাপিত করে যুবতী বলল, 'হ্যাঁ বাবা, আমার বড় বিপদ!'

'কি বিপদ?'

'কাল রাত্রি থেকে মার কলেরা হয়েছে, এখন অবস্থা খুব খারাপ।'

'কোথায় তোমরা আছ?'

প্রান্তরের অপর দিকে একটা বৃহৎ গাছের তলায় যাত্রীনিবাসের জন্য নির্মিত একটা অস্থায়ী কুটির দেখিয়ে দিয়ে যুবতী বলল, 'গাছতলায় ওই চালাঘরে।

অমরেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে অসীমানন্দ বললেন, 'এখন কি করা যায় বল অমর?'

অমরেশ বলল, 'আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন মহারাজ, যা করবার আমি করছি। আপনি যাবার পথে দুজন স্বেচ্ছাসেবক, আর সম্ভব হলে একজন ডাক্তার পাঠিয়ে দিন। স্নান করে এখন তো আপনাকে পাঠে বসতে হবে।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে অসীমানন্দ বললেন, 'আচ্ছা, সেই রকমই হোক। পাঠ শেষ করেই আমি তোমার সাহায্যে আসছি।' তারপর যুবতীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'তোমাদের নামটা রিলিফ অফিসে লিখিয়ে দিতে পারলে ভাল হয়। তোমাদের সঙ্গে যিনি পুরুষ অভিভাবক আছেন তাঁর নাম কি মা?'

যুবতী বলল, 'বিজয়লাল দাস। কিন্তু কাল রাত্রে ডাক্তার ডাকতে গিয়ে তিনি আর ফেরেন নি। দু-তিন বার ভেদ বমি হয়েছিল, তাঁরও বোধ হয় ঐ রোগ হয়েছে।'

'তিনি ছাড়া আর কোনো পুরুষমানুষ নেই?'

'ভজুয়া নামে একজন চাকর আছে, তারও অসুখ।'

'তোমার মার নাম কি?'

'মার নাম প্রভাবতী।'

'আর তোমার নাম ?'

একবার অমরেশের প্রতি এবং তৎপরে অসীমানন্দের প্রতি দৃষ্টিপাত করে যুবতী বলল, 'আমার নাম পারুল।'

অসীমানন্দ বললেন, 'আচ্ছা, তা হলেই হবে।' তারপর অমরেশের একেবারে নিকটে উপস্থিত হয়ে নিম্নস্বরে বললেন, 'বড় কঠিন ধরনের অসুখ। সমস্ত দলটি আক্রান্ত হয়েছে। অকারণ নিজেকে বিপন্ন করো না অমরেশ, সাবধানে থেকো।'

অল্প একটু ঘাড় নেড়ে অমরেশ বললে, 'আচ্ছা।'

কুটিরের দিকে অগ্রসর হয়ে অমরেশ পারুলকে জিজ্ঞাসা করল, 'কাল থেকে আপনার মার কোনো ওষুধ পড়েছে কি ?'

পারুল বলল, 'দু চার ফোটা হোমিওপ্যাথি ওষুধ ছাড়া আর কিছুই পড়ে নি।'

'কি ওষুধ পড়েছিল জানেন ?'

'না, তা তো জানি নে,—বিজয়বাবু যতক্ষণ ছিলেন দিয়েছিলেন।'

'জ্ঞান আছে ?'

'বোধ হয় নেই। কথা বলতে পারছে না।'

আর কোনো প্রশ্ন না করে অমরেশ নিঃশব্দে দ্রুতপদে অগ্রসর হ'ল।

কুটিরে উপনীত হয়ে সর্বাগ্রে সে প্রভাবতীর নাড়ী পরীক্ষা করে দেখল। বাহুর সর্বত্র পরীক্ষা করেও কোথাও সামান্যতম নাড়ীর স্পন্দন পাওয়া গেল না। ঘরের ভিতরে বিশ্রী দুর্গন্ধ, এবং রোগিণীর দেহের উপর এক ঝাঁক মাছির উৎপাত। বাইরে বেরিয়ে এসে অমরেশ পারুলকে ডেকে বলল, 'ডাক্তার আসা পর্যন্ত আপনি বাইরে অপেক্ষা করুন, এখন আপনার মার কাছে বসে বিশেষ কোনো লাভ নেই।'

অমরেশের কথা শুনে পারুলের মুখে গভীর সন্ত্রাসের চিহ্ন ফুটে উঠল। উৎকণ্ঠিত স্বরে বলল, 'কেন ? তবে মা নেই না কি ?'

একটু ইতস্তত করে অমরেশ সান্ত্বনা করুণ কণ্ঠে বলল, 'কি করবেন বলুন, উপায় তো নেই। আমার মনে হয়, আপনি যা ভয় করছেন তাই ঘটেছে। তবে ডাক্তার আসা পর্যন্ত—'

অমরেশের কথা শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা না করে পারুল উন্মত্তের মত দ্রুতবেগে ঘরের ভিতর প্রবেশ করল, তারপর বিগতপ্রাণ জননীর দেহখানা সবলে জড়িয়ে ধরে মুখের উপর বারংবার চুমু খেতে খেতে আর্তস্বরে রোদন করতে লাগল।

ঘরের ভিতর প্রবেশ করে অমরেশ পারুলকে বেরিয়ে আসবার জন্য বারংবার অনুরোধ করল, কিন্তু কোনো ফল না হওয়ায় অগত্যা দৃঢভাবে তার বাম বাহু ধারণ করে সবলে তাকে বাইরে টেনে নিয়ে এল। বৃক্ষতলে তাকে বসিয়ে দিয়ে বলল, 'এ রকম ভাবে ইচ্ছে করে নিজের জীবনকে বিপদ্গ্রস্ত করে লাভ আছে কিছু? জানেন তো ভয়ানক ছোঁয়াচে রোগ।'

রোদন করতে করতে পারুল বলল, 'তা জানি, কিন্তু এখন আর আমারই বা বেঁচে কি লাভ বলুন?'

অমরেশ বলল, 'তা তো ঠিক বলতে পারি নে, কিন্তু দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করবার জন্যেও অনেককে বেঁচে থাকতে হয়। সংসারকে কেবল মাত্র সাজিয়ে রাখবার জন্যেই সুখী অসুখী ধনী দরিদ্র সকলেরই প্রয়োজন নেই কি?'

সৃষ্টিরহস্যের এই তত্ত্ব-কথার প্রতি কোন প্রকার মন্তব্য প্রয়োগ না করে পারুল উচ্ছ্বসিত হয়ে ফুলে ফুলে রোদন করতে লাগল, এবং অমরেশ সকৌতুক কৌতূহলের সহিত মৃত্যু ও শোকের এই সহসালব্ধ লীলামাধুর্যের গভীরতম প্রদেশে নিমগ্ন হ'ল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই ডাক্তার এবং স্বেচ্ছাসেবকেরা এসে পড়ল, এবং ডাক্তার কর্তৃক রোগিণীর মৃত্যু বিজ্ঞাপিত হওয়ার পর অতি অল্প সময়ের মধ্যে স্বেচ্ছাসেবকেরা সেই চালা-ঘর থেকে প্রয়োজন মত বাঁশ এবং দড়ি সংগ্রহ করে শব বহনের ব্যবস্থা করে ফেলল।

রোরুদ্যমানা পারুলকে সম্বোধন করে অমরেশ বলল, 'এখন এতবড় একটা কর্তব্য সামনে রয়েছে, অত কাতর হলে চলবে না তো। আপনি মনকে শক্ত করুন।'

অশ্রুসিক্ত চক্ষু মার্জিত করে পারুল বলল, 'কি করতে হবে আমাকে বলুন?'

'ভজুয়া বলে আপনাদের যে চাকরের কথা বলছিলেন, সে কোথায়?'

পারুল বলল, 'আপনার সঙ্গে ফিরে আসবার পর থেকে তাকে আর দেখতে পাচ্ছি নে। টাকাকড়ির হাত-বাক্সটাও তারই জিম্মায় ছিল।'

'নগদ টাকাকড়ি কিছুই আর তাহলে নেই?'

পারুল বলল, 'না, তা নেই। কিন্তু তার জন্যে আটকাবে না, আমি তিন-চার গাছা চুড়ি খুলে দিচ্ছি।' বলে বাম হস্ত হতে চুড়ি উন্মোচিত করতে উদ্যত হল।

অমরেশ তাকে নিরস্ত করে বলল, 'এখন থাক, প্রয়োজন হলে খুললেই হবে।' তারপর পারুলের কাছ থেকে ভজুয়া এবং বিজয়লালের আকৃতি নিরূপিত করে নিয়ে একজন স্বেচ্ছাসেবকের দ্বারা পুলিসে সংবাদ প্রেরণ করে চালাঘরটায় অগ্নি সংযোগের পর প্রভাবতীর মৃতদেহ নিয়ে শ্মশানাভিমুখে নির্গত হল।

২

অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার মন্ত্রপাঠ করবার সময়ে পরলোকগতার গোত্র জানবার প্রয়োজন হল। অমরেশ পারুলকে জিজ্ঞাসা করল, 'আপনাদের কি গোত্র ?'

পারুল বলল, 'তা তো জানি নে।'

'আপনারা ব্রাহ্মণ, না, কায়স্থ ?'

'ব্রাহ্মণ।'

'আপনার বাবার উপাধি কি ? চাটুজ্জে, বাঁড়ুজ্জে, লাহিড়ী, ভাদুড়ী—এই সব উপাধির কথা জিজ্ঞাসা করছি।'

পারুলের মুখে বিমূঢ়ভাব ছায়া সুস্পষ্ট হয়ে উঠল ; স্খলিত কণ্ঠে বলল, 'আমি যখন খুব ছোট, তখন বাবার মৃত্যু হয়,—উপাধির কথা ঠিক বলতে পারি নে।'

'বুঝেছি।' বলে শ্মশান-পুরোহিতকে সম্বোধন করে অমরেশ বলল, 'যথাগোত্র বলে কাজ সারুন।'

দাহকার্য সমাপন হলে অমরেশ পারুলকে কুশাবর্ত ঘাটে নিয়ে গিয়ে যখন গঙ্গাগর্ভে মাতার অস্থি উৎসর্গ করালে তখন অপরাহ্ণকাল। দাহকারী স্বেচ্ছা-সেবকেরা শ্মশান হতেই নিজ নিজ আখড়ায় প্রস্থান করেছিল। কুশাবর্ত ঘাটের কার্যাবসানে পুরোহিতও পারিশ্রমিক প্রাপ্তির পর বিদায় গ্রহণ করল।

উদাস অপলক নেত্রে গঙ্গার দিকে তাকিয়ে পারুল স্তব্ধ হয়ে বসে ছিল। মাত্র ঘণ্টা কয়েকের ব্যবধানে অচিন্তিত ভাবে যে মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে গেল, তার আকস্মিকতা এবং নিদারুণতার আঘাতে ক্রমশ যেন তার দেহ এবং মনের

সমস্ত অনুভূতি স্তম্ভিত হয়ে এসেছিল। এমন কি বর্তমান জীবনের সঙ্কট এবং ভবিষ্যৎ জীবনের সমস্যা পর্যন্ত তার অক্রিয় চিত্ত-পটে চিন্তার মূর্তিতে সুস্পষ্ট হয়ে ফুটে উঠতে পারছিল না। অবিলম্বেই কিন্তু মনটা অনেকখানি সাড়া দিল অমরেশের এক প্রশ্নের তাড়নায়।

অমরেশ জিজ্ঞাসা করল, 'এবার আপনার কি ব্যবস্থা করব বলুন? এখান থেকে আপনি কোথায় যেতে চান?'

উৎকণ্ঠায় পারুলের মুখ মলিন হয়ে উঠল, বলল, 'সেই কথাই মনে মনে ভাবছিলাম। আমার তো এখানে কেউ নাই।'

অমরেশ বলল, 'ভবিষ্যতের কথা ঠিক জিজ্ঞাসা করছি না, এখানকার দুই-এক দিনের জন্যে যা হয় একটা ব্যবস্থা হয়েই যাবে। কিন্তু তারপর কোথায় যাবেন? কলকাতায়?'

'হঁ্যা, কলকাতাতেই যাব।'

'সেখানেই আপনাদের বাড়ি?'

'হ্যাঁ।'

'ঠিকানা কি?'

পারুলের মুখ আরক্ত হয়ে উঠল, একটু ইতস্তত ভাবে বলল, 'গরাণহাটা স্ট্রীট; গাইয়ে বিনির বাড়ি।' তারপর কলিকাতার গৃহ সম্বন্ধে উক্তিটা যথোচিত সংশোধিত করবার অভিপ্রায়ে বলল, 'সমস্ত বাড়িটা কিন্তু আমাদের নয়, শুধু দুখানা কামরা আমাদের ভাড়ায় আছে।'

সে কথায় কোনো মন্তব্য প্রকাশ না করে অমরেশ বলল 'আপনার মায়ের কাজ করে আপনার তৃপ্তি রয়েছে তো?'

কৃতজ্ঞতার আবেগে পারুলের দুই চক্ষু ছলছল করতে লাগল, কম্পিত কণ্ঠে বলল, 'মার পূর্বজন্মের অনেক পুণ্য ছিল তাই আপনার হাতে তাঁর কাজ শেষ হল।'

অমরেশ বলল, 'আচ্ছা চলুন, এবার আমরা অসীমানন্দজীর আশ্রমে যাই,

তিনি আমাদের জন্য চিন্তিত হয়ে আছেন। তাঁর সঙ্গে আপনার বিষয়ে পরামর্শ করলে সব ব্যবস্থা ঠিক হয়ে যাবে।'

অমরেশের মত পরিণত বয়সের ভদ্র ব্যক্তির নিকট হতে 'আপনি' সম্বোধন লাভ পারুলের মনে কুণ্ঠার উদ্রেক করছিল। পথ চলতে চলতে কথোপকথনের মধ্যে এক সময়ে সে অনুনয়ের কণ্ঠে বলল, 'আপনি কিন্তু আমাকে 'আপনি' বলে ডাকবেন না।'

পারুলের প্রতি সহজ শান্ত দৃষ্টিপাত করে স্মিতমুখে অমরেশ বলল, 'তবে কি বলে ডাকব ?—'তুমি' বলে ?,

'হ্যাঁ।'

'আচ্ছা. তাই না হয় বলব। বয়সের এতখানি তফাত, 'তুমিই' তো বলা উচিত। তবে হঠাৎ কাউকে তুমি বলতে সাহস হয় না, পাছে কেউ ভুল করে অসম্মানের আচরণ মনে করে।'

পারুল এ কথার কোনও উত্তর দিল না। একটা অস্বস্তিকর চিন্তা মনের মধ্যে উৎপন্ন হয়ে তখন তাকে অতিশয় কষ্ট দিচ্ছিল। মনে হচ্ছিল, এই যে তার প্রতি অমরেশের ঐকান্তিক সহানুভূতি এবং সদয় ভদ্র ব্যবহার এর ভিত্তি যৎপরোনাস্তি দুর্বল; এর সমস্তটাই হয়তো তার পক্ষে দুষ্প্রাপ্য হত, যদি-না তার প্রকৃত পরিচয় অমরেশের কাছে অবিদিত থাকত। এ যেন চৌর্যবৃত্তির দ্বারা অমরেশের প্রসাদ লাভ করা !

এই অবাঞ্ছনীয় অবস্থা হতে মুক্তিলাভের জন্য মনে মনে বদ্ধপরিকর হয়ে সে বলল, 'দেখুন, আপনি যদি আমার আসল পরিচয় জানতেন তা হলে হয়তো আমি আপনার কাছে এত দয়া পেতাম না।'

অমরেশ বলল, 'দয়ার কথাটা না হয় পরে বিবেচনা করা যাবে; কিন্তু যদি তোমার আপত্তি না থাকে তো তোমার আসল পরিচয়টা বল না, শুনি ?'

আরক্তমুখে স্খলিত কণ্ঠে পারুল বলল, 'আমি ভদ্রঘরের মেয়ে নই, আমি বেশ্যা।'

শুনে অমরেশ হাসতে লাগল, বলল, 'আচ্ছা, জানলামই না হয় তুমি ভদ্রঘরের মেয়ে নও, তুমি বেশ্যা। কিন্তু বেশ্যা বিপদে পড়লে তাকে সাহায্য করা কর্তব্য বলে মনে করি না, তা তুমি কেমন করে জানলে?'

এ কথার কোন উত্তর না দিয়ে পারুল নিঃশব্দে অমরেশের পাশে পাশে পথ চলতে লাগল। এত বড় কথার সমীচীন উত্তর কেমন করে কোন ভাষার সাহায্যে দিতে হয় তা-ই হয়তো সে জানে না, কিন্তু এ কথা শোনার পর তাকে বস্ত্রাঞ্চল দিয়ে যে উদ্গত অশ্রু তাড়াতাড়ি মুছে ফেলতে হল তা যে শুধু মাতৃবিয়োগের শোকেই নিঃসৃত হয় নি, তা বুঝতেও অমরেশের বিলম্ব হল না। কিন্তু যে বেশ্যা-প্রসঙ্গের অবকাশে কৃতজ্ঞতা প্রকাশে এই অভিব্যক্তি-টুকু পরিস্ফুট হল, হাস্য-কৌতুকের কৌশলে তার অনতিবর্তনীয় বেদনাটুকু অপসারিত করবার জন্য অমরেশের দয়ার্দ্র অন্তঃকরণ উদ্যত হয়ে উঠল।

'পারুল!'

সকৌতূহল আগ্রহে অমরেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে পারুল বলল, 'আজ্ঞে?'

'তুমি গঙ্গাস্নানের মাহাত্ম্য মান? অর্থাৎ গঙ্গার জলে স্নান করলে, বিশেষত হরিদ্বারের মত হিন্দুদের মহাতীর্থ-স্থলে গঙ্গাস্নান করলে, আমাদের সব পাপ তাপ ধুয়ে পরিষ্কার হয়ে যায়, এ কথা স্বীকার কর?'

একটুখানি মনে মনে কি চিন্তা করে পারুল বলল, 'করি।'

'কিছু মনে করো না, একটা কথা জিজ্ঞাসা করছি। বেশ্যাবৃত্তিকে পাপ মনে কর তুমি?'

এবারও পারুল একই উত্তর দিলে, বলল, 'করি।'

মৃদুস্মিত মুখে অমরেশ বলল, 'বেশ কথা। তা হলে তুমি যে এই ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটে আর কুশাবর্ত ঘাটে দুবার গঙ্গাস্নান করলে তাতে তোমার সে পাপ নিশ্চয়ই ধুয়ে মুছে পরিষ্কার হয়ে গেছে, এ কথা ঠিক তো?'

পারুল এবার অপাঙ্গে অমরেশের দিকে চেয়ে দেখল, তারপর দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বলল, 'কিন্তু আমার যে পাপ অনেক!'

অমরেশ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল, বলল, 'অর্থাৎ কি-না তুমি বলতে চাইছ যে, গঙ্গাজল এমন কিছু জোরালো জিনিস নয়, যাতে তোমার সমস্ত পাপ ধুয়ে যেতে পারে। কিন্তু আসল কথা কি তা জান? আমাদের ধর্মগ্রন্থে গঙ্গাজলের যে রকম গুণকীর্তন আছে তা যদি সত্যি হয়, তা হলে পাহাড় সমান পাপও তাতে ধুয়ে মুছে পরিস্কার হয়ে যাবার কথা। কিন্তু সে সব গুণকীর্তন যদি মিথ্যা হয়, তা হলে এক বিন্দুও ধুয়ে যাবার কথা নয়। এখন তোমার কি মনে হয় তা বল। গঙ্গাজলে মাহাত্ম্য আছে? না, নেই?'

পারুলের মুখে ক্ষীণ হাস্যপ্রভা প্রকাশিত হল, বলল, 'আছে।'

'আচ্ছা, তা যদি থাকে, তা হলে হিন্দুধর্ম মতে তুমি এখন একেবারে নিষ্পাপ, বেশ্যা বলে সঙ্কুচিত হবার কোনো কারণ নেই তোমার। পণ্ডিতেরা সকলেই শিশু অবস্থায় মূর্খ থাকে, তাই বলে লেখাপড়া শিখে বিদ্বান হওয়ার পর আর তাদের মূর্খ বলা চলে না।' বলে অমরেশ হাসতে লাগল।

পথটা সংক্ষেপ করবার জন্য অমরেশ এবং পারুল মাঠের উপর দিয়ে পাকদণ্ডী (পায়ে হাঁটা পথ) অবলম্বন করে চলছিল। পাকা সড়কের নিকটবর্তী হয়ে তারা দেখলে, স্বয়ং অসীমানন্দ স্বামী তাদের দিকেই আসছেন।

নিকটে উপস্থিত হয়ে অসীমানন্দ বললেন, 'তোমাদের বিলম্ব দেখে চিন্তিত হয়ে ঘাটের দিকে চলেছিলাম। শরীর তোমাদের বেশ সুস্থ আছে তো?'

'অমরেশ বলল, 'তা আছে মহারাজ, কিন্তু দেশে পাঠাবার আগে এ মেয়েটির থাকবার ব্যবস্থা কি করা যায় তা বলুন। এই সদ্যশোকের অবস্থায় সাধারণ হোটেল ওয়াড়ে একে না রাখতে পারলেই ভাল হয়।'

অসীমানন্দ বললেন, 'আচ্ছা, সে বিষয়ে সুবিধামত একটা ব্যবস্থা করা বোধ হয় বিশেষ কঠিন হবে না। তোমরা উভয়ে আমার আশ্রমে যাও, সেখানে তোমাদের পানাহারের ব্যবস্থা ঠিক করা আছে। গঙ্গাদিত্য তোমাদের সেবার জন্যে অপেক্ষা করছে। পরিশ্রম হয়েছে আহারান্তে একটু বিশ্রাম

করো। সন্ধ্যার পরই আমি উপস্থিত হব, তারপর প্রয়োজনীয় কথাবার্তা হবে।'

অসীমানন্দের আশ্রমের দিকে অগ্রসর হয়ে পারুল জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি কি স্বামীজীর আশ্রমেই থাকেন?'

'না, আমার বাসা স্বতন্ত্র।'

'সেখানে কি আমার একটু স্থান হয় না? অন্তত আজকের রাত্রিটা শুয়ে থাকবার মত?'

লোকালয় হতে কিছুদূরে একটা ক্ষুদ্র গৃহের সামান্য একটু অংশ নিয়ে প্রায় মাসাবধি অমরেশ হরিদ্বারে বাস করছে। হরিদ্বারে কুম্ভমেলা দর্শন এবং ধর্ম বিষয়ে কৌতূহল নিবারণের জন্য সাধু সজ্জন সঙ্গ করা তার উদ্দেশ্য। বাসায় তার অংশে মাত্র দুইখানি ঘর, তন্মধ্যে একটিই শয়নের উপযুক্ত। সেখানে পারুলের বাসের ব্যবস্থা সমীচীন এবং সুবিধা জনক হবে কি-না ভাবতে ভাবতে অমরেশ বলল, 'আচ্ছা, স্বামীজী আসুন, তারপর তাঁর সঙ্গে পরামর্শ করে একটা যা-হয় ব্যবস্থা করলেই হবে।'

সন্ধ্যার পর কিন্তু কথাটা যখন অসীমানন্দের কাছে উঠল, তিনি পারুলের প্রস্তাবই অনুমোদিত করলেন, বললেন, 'সেই কথাই ভাল। যদি অসুবিধা হয়, অমরেশ না হয় আমার এখানে এসে শুবো।'

স্থির হল, বিজয়লাল এবং ভজুয়ার সঠিক সন্ধান না পাওয়া পর্যন্ত পারুল হরিদ্বারে অবস্থান করবে, এবং তাদের কোনো প্রকার সন্ধানের অভাবে অপর কোনো ব্যবস্থা সম্ভব না হলে ৩০শে চৈত্র কুম্ভের প্রধান স্নান হয়ে যাওয়ার পরে সে অমরেশের সঙ্গে কলিকাতায় ফিরে যাবে।

৩

পুরাতন বালিগঞ্জের একটা অপেক্ষাকৃত নিভৃত অংশে শৈলনাথ চট্টোপাধ্যায়ের প্রশস্ত অট্টালিকা। শৈলনাথ চট্টোপাধ্যায়, অর্থাৎ মিস্টার এস, এন, চ্যাটার্জি, 'ভারত এঞ্জিনীয়ারিং সিণ্ডিকেটে'র চীফ্ এঞ্জিনীয়ার এবং সিনিয়ার পার্টনার। এই বৃহৎ এঞ্জিনীয়ারিং প্রতিষ্ঠান হতে মাসিক বরাদ্দ এবং মুনাফার অংশে শৈলনাথ যে অর্থ অর্জন করেন, তা অনেক ধনীর পক্ষেই কামনার বস্তু। দক্ষিণ-ভারতের একটা দুরন্ত বেগবতী নদীর উপর সেতু নির্মিত হচ্ছে; দিন পনেরো ধরে তার কার্যাদি পর্যবেক্ষণ এবং পরীক্ষা করে দিন-দুই হল তিনি কলিকাতায় প্রত্যাবর্তন করেছেন। কিন্তু ইত্যবসরে কলিকাতা অফিসের কাজ এত জমে গেছে যে, মফঃস্বলের নিরবসর হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রমের পর একটু যে বিশ্রাম ভোগ করবেন তার উপায় নেই। প্রত্যহই সাত আট ঘণ্টা করে অফিসে রীতিমত পরিশ্রম করতে হচ্ছে।

তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। দক্ষিণ দিকের বারান্দায় একটা তক্তপোশের উপর শৈলনাথ গোটা দুই তিন তাকিয়া এবং একটা ধূমায়িত পাইপের সাহায্যে খানিকটা আরাম লাভ করবার চেষ্টায় আছেন, এমন সময়ে গৃহিণী অপর্ণা এসে উপস্থিত হলেন।

একটুখানি সরে গিয়ে অপর্ণার বসবার মত একটু স্থান করে দিয়ে শৈলনাথ বললেন 'বস।' অপর্ণা উপবেশন করলে বললেন, 'খবর কি বল?'

অপর্ণা বললেন, 'খবর বলবার সময় কোথায় যে বলব? দেশদেশান্তরে তো

পুল বেঁধে বেড়াচ্ছ, সংসারের ওপর একটা পুল বাঁধতে পার না, যাতে মাঝে মাঝে তোমার নাগাল পাওয়া যায় ?'

অপর্ণার কথা শুনে শৈলনাথ মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন, বললেন, 'সে পুল কি এখনও বাঁধবার অপেক্ষায় আছে অপু ? সে তো বহুকাল হল তোমার বাবা বেঁধে দিয়েছেন। তুমিই তো আমার সংসার নদীর সেতু।'

'তা হলে সে সেতু অকেজো হয়েছে—আর একটা নতুন সেতুর ব্যবস্থা কর।'

সহাস্যমুখে মাথা নেড়ে শৈলনাথ বললেন, 'তার আর সম্ভাবনা নেই। এই বুড়ো অকর্মণ্য এঞ্জিনীয়ারের টেণ্ডার আর কোন কন্যাদায়গ্রস্তই গ্রাহ্য করবে না।'

স্বামীর বয়স যে জৈববর্গের স্বাভাবিক ক্রিয়াশীলতা বশত আপামর সাধারণের সহিত বার্ধক্যের অভিমুখে অগ্রসর হচ্ছে, এই অখণ্ডনীয় সত্য অপর্ণা খুব সহজে স্বীকার করতে চাইতেন না। চক্ষু কুঞ্চিত করে বললেন, 'দিনরাত মুখে বুড়ো বুড়ো শব্দ ! অমন করে সদাসর্বদা আয়ুর নিন্দে করতে নেই। কি তোমার এমন বয়স হয়েছে শুনি ?'

অপর্ণার কথা শুনে গম্ভীর মুখে মাথা নেড়ে শৈলনাথ বললেন, 'রামচন্দ্র ! ও ব্যাপার আমার কেন হতে যাবে ? আমার শত্রুর হোক, আমার বন্ধু-বান্ধব সমবয়সীদের হোক। কিন্তু এসব তো হল অবান্তর কথা, আসল কথাটা কি বল দেখি ?'

অপর্ণা অভিমান করলেন ; ক্ষুব্ধ-গভীর কণ্ঠে বললেন, 'তোমার কাছে কোন্‌টা আসল কোন্‌টা নকল, তা কেমন করে জানব বল ?'

শৈলনাথও অপর্ণার গাম্ভীর্যের সহিত সমান তাল রেখে গম্ভীর মুখে বললেন, 'এ অবশ্য একটা ভাববার মত কথা। কিন্তু আমার বিষয়ে তোমার যদি সুনিশ্চিত ধারণা না থাকে, তা হলে তোমার কাছে যেটা আসল, তার কথাই না-হয় বল।'

'বলে কোনো ফল আছে কি ?'

'গীতার উপদেশ হচ্ছে—মা ফলেষু কদাচন। সুতরাং ফলের প্রত্যাশা না করেও বলতে পার।'

শৈলনাথের উত্তরের ভঙ্গীতে অপর্ণার মুখে বিরক্তির চিহ্ন দেখা দিল; ভ্রূকুঞ্চিত করে বললেন, 'আচ্ছা, ঠাট্টা-তামাসা ছাড়া কি তোমার মুখে কাজের কোন কথা জোটে না?'

সহাস্যমুখে শৈলনাথ বললেন, 'জুটবে না কেন? অবশ্য জোটে। অক্টেভিয়াস ষ্টীল কোম্পানীর বড় সাহেবের সঙ্গে জোটে, মার্টিন কোম্পানীর কেশিয়ারের সঙ্গে জোটে, টাটা আয়রণ-এর সেল্‌স ম্যানেজারের সঙ্গে জোটে। কিন্তু তোমার সঙ্গে আর তোমার মত আর দু-চার জনের সঙ্গে কথা কইবার সময়ে জোটে তুমি যাকে বলছ ঠাট্টা-তামাসা, অর্থাৎ সাধু ভাষায় যাকে বলে কৌতুক পরিহাস।'

'আমার মত আর দু-চার জন কারা শুনি?' চক্ষে পূর্ববৎ ভ্রূকুটির লীলা!

শৈলনাথ বললেন, 'সংঘাতিক জেরায় পড়লাম দেখছি! ওগো, ভয় করবার তেমন কিছুই নেই। তারা সবাই তোমার সহোদরা বোন,—তৃতীয় পক্ষের বোন একজনও নেই। কিন্তু বাজে কথা যথেষ্ট হয়েছে, এখন একটু কাজের কথা হোক। তুমি যা বলতে এসেছ, আমি তা জানি। বলব, শুনবে?'

কোন কথা না বলে নির্বাক কৌতূহলে অপর্ণা স্বামীর দিকে একদৃষ্টে চেয়ে রইলেন। অর্থাৎ,—বল না, দেখাই যাক তোমার কতটা মুরোদ!

চক্ষু ঈষৎ কুঞ্চিৎ করে শৈলনাথ বললেন, 'বাসনার বিয়ের কথা। বল, ঠিক বলেছি কি-না?'

সহসা একরাশি হাস্যে অপর্ণার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। বললেন, 'ঠিক তো বলেছ। আচ্ছা, কি করে বুঝলে?'

'অনুমানে।'

'শুধু অনুমানে?' মুখের দীপ্তি খানিকটা নিষ্প্রভ হয়ে গেল।

শৈলনাথ বললেন, 'শুধু অনুমানে। যোগবলে নয়, থট-রিডিংএর সাহায্যেও

না। কিন্তু তার জন্যে দমে যাচ্ছ কেন বাপু? অনুমান তো প্রখর বুদ্ধিরই লক্ষণ।'

অপর্ণা বললেন, 'বেশ, স্বীকার করছি তুমি খুব বুদ্ধিমান লোক। এখন [illegible] বুদ্ধি [illegible] বিয়েটা দিয়ে

[illegible] বাস্তব

[illegible]

[illegible]

বিবেচনার অনুরোধে। [illegible] তোমার মত একেবারেই ইচ্ছে না। এখন তার বয়স হয়েছে, একেবারে ছেলেমানুষটি না, তার কথাটাও ত একটু ভাবতে হয়।

অপর্ণার দুই চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল — বল কি গো! তোমার মেয়েরই বয়স হয়েছে, আর আমার বয়স হয়নি? আমার কথাটা একটুও ভাবতে হয় না। আচ্ছা মেয়ের বয়স হয়েছে, তার বিয়ে দেওয়া বেশি দরকার, না, বি এ পড়া বেশি দরকার?

শৈলনাথ বললেন, 'প্রশ্ন কঠিন। ভেবে দেখবার জন্যে সময় চাই।

অপর্ণা [illegible] বলে উঠলেন, 'কিচ্ছু সময় চাই নে, বোশেখ মাসের মধ্যে বিয়ে দিতেই হবে।' তারপর সহসা কণ্ঠের স্বর খাদায় নামিয়ে দিয়ে কোমলকণ্ঠে বললেন, 'আহা, ছেলেটার দুঃখু তো তার চোখে দেখা যায় না! সর্বদা যেন ছটফট করছে।'

কৃত্রিম বিস্ময়ের ভঙ্গীতে চক্ষু বিস্ফারিত করে শৈলনাথ বললেন, 'সে কি কথা? লক্ষণটা মোটেই সুবিধের নয় তো! কে আবার সর্বদা ছটফট করছে?'

শৈলনাথের কথা শুনে অপর্ণার বিরক্তির সীমা রইল না, বললেন, 'তাও তোমাকে নাম ধরে বলতে হবে, তবে বুঝবে না কি? কেন, নরেনের কথাটা তোমার কিছুতেই মনে পড়ল না?

শৈলনাথ বললেন, 'হয়তো মনে পড়ে, কিন্তু ধড়ফড় করার কথা বলে তুমি সমস্ত গুলিয়ে দিলে। সাধারণত ওটা বেরিবেরি রোগের লক্ষণ; নরেনের যে ও রোগ নেই, তা—'

শৈলনাথকে কথা শেষ করতে না দিয়ে অপর্ণা বাধা দিয়ে বললেন, 'কেন মিছিমিছি চালাকি কর না। বাসনার সঙ্গে শীগগির বিয়ে হবে বলে সে জন্যে নরেন কত ব্যস্ত তা তুমি জান না?'

কপট গাম্ভীর্যের স্বরে শৈলনাথ বললেন, 'ব্যস্ত হতে পারে, কিন্তু তাই বলে ধড়ফড় করবে কেন? আমাদের সময়ে এ রকম অবস্থায় আমরা বড় জোর ছটফট করতাম, কিন্তু কই ধড়ফড় করতাম বলে তো মনে পড়ে না।'

ভ্রূকুঞ্চিত করে অপর্ণা বললেন, 'ধড়ফড়ানিতে আর ছটফটানিতে কি এমন তফাত আছে শুনি?'

বিবাহব্যগ্র প্রেমাতুর মনের উক্ত দ্বিবিধ অবস্থার পার্থক্য নির্ণয়ের যথোচিত সময় পাওয়া গেল না, কারণ, দেখা গেল, এই আলোচনার সর্বপ্রধান উপলক্ষ—বাসনা—অদূরে আবির্ভূত হয়েছে।

বাসনা শৈলনাথের জ্যেষ্ঠা কন্যা, থার্ড-ইয়ার বি. এ. ক্লাসের মেধাবিনী ছাত্রী, দেখতে সুন্দরী এবং প্রখরবুদ্ধিশালিনী। স্বভাবত একটু চঞ্চল, তার্কিকতায় পটু এবং প্রতিবাদে অসহিষ্ণু। কিন্তু তার চঞ্চলতায় বর্ষাস্রোতের স্ফীত কর্দমতা নেই, আছে স্বচ্ছ গিরিনদীর গতিবেগ। অপর্ণা কর্তৃক উল্লিখিত নরেনের সহিত তার বিবাহের কথা এক রকম স্থির হয়েই আছে।

নরেন, অর্থাৎ নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, একজন বিলাত-ফেরত এঞ্জিনীয়ার। বৎসর দুই হল গ্লাসগো থেকে এঞ্জিনীয়ারিং-এর একটা বড় রকম উপাধি অর্জন করে দেশে ফিরে সে 'ভারত এঞ্জিনীয়ারিং সিণ্ডিকেটে' যোগদান করেছে। উক্ত প্রতিষ্ঠানের এখনও সে একজন বেতনভোগী কর্মচারী, কিন্তু বাসনার সহিত বিবাহ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে যে একজন অংশীদারও হবে

সে কথাও স্থির হয়ে আছে। নরেন উচ্চবংশীয় ধনবান যুবক, সুতরাং সর্বতোভাবে কন্যাপক্ষের কামনার সামগ্রী।

পিতামাতার নিকট উপস্থিত হয়ে বাসনা বলল, 'মা, শ্যামপুকুর থেকে গাড়ি এসেছে।'

একটু চিন্তিত হয়ে অপর্ণা জিজ্ঞাসা করলেন, 'হঠাৎ এ সময়ে গাড়ি এল যে?'

'মামীমা লিখছেন, পরশু থেকে দাদামশাই খাবার বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেছেন, কেউ থামাতে পারছে না।'

অপর্ণার মুখখানা ঈষৎ ম্লান হয়ে উঠল, বললেন, 'আমিও ঐ রকমই একটা-কিছু মনে করছিলাম। বেশ, যাও ত হলে। কিন্তু আজ রাত্রেই ফিরছ তো?'

এ কথার উত্তর দিলেন শৈলনাথ, বললেন, 'এত রাত্রে যাচ্ছে, আজই কি আর আসতে পারবে। কাল কিন্তু সকালেই চলে এস মা।'

'তাই আসব বাবা।' বলে বাসনা দ্রুতপদে প্রস্থান করল।

বাসনার মাতামহর নাম গগনবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়। বছর পাঁচেক হল ডিষ্ট্রীক্ট অ্যাণ্ড সেসন্স জজের পদ হতে অবসর গ্রহণ করেছেন। কার্যকালে একজন অতিশয় রাশভারি হাকিম বলে তাঁর খ্যাতি ছিল। কিন্তু অন্তরের অন্দর-মহলে যাদের সঙ্গে পরিচয়, তারা জানত গগনবিহারীর মত সরস ও সহৃদয় ব্যক্তি কদাচিৎ দেখতে পাওয়া যায়। বয়সের কাঠিন্যতাকে সহজে অতিক্রম করবার উপযুক্ত এমন ধাতু তাঁর মধ্যে ছিল যে, অবলীলার সহিত তিনি বার্ধক্য এবং তারুণ্যের যোগে একটা রাসায়নিক মিলন ঘটাতে সক্ষম হতেন। নধর ধপধপে গৌরবর্ণ দেহ, নাসিকার তীক্ষ্ণতায় এবং বক্রতায় বুদ্ধিমত্তার পরিচয়, কেশহীন চিক্কণ মস্তকের পিছন দিকের খানিকটা অংশে পাতলা এবং বিরল কেশের নিরর্থক জীবন-প্রচেষ্টা। সমস্ত মিলিয়ে বাংলা দেশের খাঁটি ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতের মত আকৃতি।

পেন্‌শন গ্রহণের বৎসর খানেক পরে গগনবিহারীর পত্নীবিয়োগ হয়। দীর্ঘকালের জীবনসঙ্গিনীকে হারিয়ে প্রথমে তিনি অতিশয় শোকাতুর হয়েছিলেন, কিন্তু দিনের পর দিন ভোগের মধ্য দিয়ে এই শোকের বাহিরের অভিব্যক্তি যখন ক্রমশ শান্ত হয়ে এল, তখন দেখা গেল তিনি মদ্যপান আরম্ভ করেছেন। পূর্বে কোনদিন তাঁকে মদ স্পর্শ পর্যন্ত করতে কেউ দেখে নি, সুতরাং সকলেই মনে করল, শোকের তীব্র দংশন হতে ক্ষণকালের জন্য মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যে এই উপায়ে অনুভূতিকে নিষ্ক্রিয় করা! হয়তো সেই কথাই ঠিক, কিন্তু গগনবিহারী তা স্বীকার করতেন না। তিনি বলতেন, মনোযন্ত্রের সমস্ত তন্ত্রীগুলো এক সুরে বেঁধে যখন পরিপূর্ণ ইন্দ্রিয়নিরোধের একটা স্তব্ধ আনন্দ উপভোগ করবার বাসনা হয়, তখনই তিনি সুরার আশ্রয় গ্রহণ করেন।

গগনবিহারীর মদ খাওয়ার মধ্যে একটু অসাধারণত্ব ছিল। তিনি কখনই নিয়মিতভাবে মদ্যপান করতেন না। চার-পাঁচ মাস অন্তর হঠাৎ একদিন পান করতে আরম্ভ করতেন, কিন্তু আরম্ভ যখন করতেন তখন তিন-চার দিন ব্যাপী অবিশ্রান্ত তার পালা চলত। তৎকালে সাধারণ পানাহার এক রকম বন্ধই থাকত এবং হোয়াইট সীল হুইস্কি ও সোডা-ওয়াটারের মুহুর্মুহু যোগান দিতে দিতে দীনু খানসামাকে আহার-নিদ্রা ত্যাগ করতে হত। সে সময়ে গগনবিহারী এমন একটা গভীর-গম্ভীর মূর্তি ধারণ করতেন যে, তাঁকে নিবৃত্ত করবার উদ্দেশ্যে কেউ তাঁর সম্মুখীন হতে সাহস করত না। একমাত্র যে সাহস করত এবং সক্ষম হত, সে তাঁর আদরের দৌহিত্রী বাসনা। সকল বিষয়ে, মায় এই অত্যন্ত খামখেয়ালি মদ্যপানের ব্যাপারেও, গগনবিহারী বাসনার বশ্যতা স্বীকার করে চলতেন। তাই প্রয়োজন হলেই মাতুলালয়ে তার তলব পড়ত। এবারেও সেই কারণেই এই ডাক।

গাড়ি-বারান্দায় উপস্থিত হয়ে মোটরে চড়ে বসে বাসনা বলল, 'বিপিন!'

ড্রাইভার পিছন দিকে ফিরে তাকিয়ে বলল, 'মা-মণি?'

'জ্ঞান ট্যান আছে তো?'

'আজ্ঞে, তা আছে। তবে এবারকার রোক্‌টা একটু বেশি মনে হচ্ছে।'

'আচ্ছা, চল।'

গেট হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে মোটর দ্রুতবেগে শ্যামপুকুরের অভিমুখে ধাবিত হল।

৪

দ্বিতলের দক্ষিণ দিকের প্রশস্ত বারান্দায় একটা ঈজিচেয়ারে গগনবিহারী শয়ন করেছিলেন। ঠিক ঘুম নয়, একটু তন্দ্রার মত এসেছিল, এমন সময় পথে মোটর থামার শব্দে চক্ষু উন্মীলিত করলেন।

'দীনো!'

অদূরে দীনবন্ধু বারান্দার রেলিং-এর ধারে নিঃশব্দে বসে ছিল, গগনবিহারীর আহ্বানে সত্বর উঠে এসে বলল, 'কর্তা?'

'একটা গাড়ী এসে যেন থামল। দেখ্ তো কে এল।'

ব্যাপারটা দীনবন্ধুর পুরোপুরিই জানা ছিল, তবু না-জানার ভান করে বলল, 'আজ্ঞে দেখি।'

গগনবিহারী যখন সাতক্ষীরায় মুন্সেফি করেন তখন পনের-ষোল বৎসরের বালক-ভৃত্য রূপে তাঁর সংসারে দীনবন্ধুব প্রথম প্রবেশ। সে আজ বিশ-বাইশ বৎসরের কথা হবে। ছুটির দিন, বারান্দায় তক্তপোষের উপর বালা-পোশ গায়ে জড়িয়ে গগনবিহারী মকদ্দমার রায় লিখছিলেন, এমন সময়ে দীনবন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে ডিক্রিজারীর পেয়াদা নটবর দাস হাজির হয়ে গগন-বিহারীর পদধূলি গ্রহণ করল; তারপর দীনবন্ধুর দিকে দৃষ্টিপাত করে বলল, 'লে, গড় কর। পায়ের ধুলো লে।' দীনবন্ধু যথোচিত আদেশ পালন করে উঠে দাঁড়ালে গগনবিহারী জিজ্ঞাসা করলেন, 'এটি কে নটবর?' হাত জোড়

করে বিনয়-নম্র কণ্ঠে নটবর বলল, 'আজ্ঞ্যা, এ আমার বাপ-মা-মরা ভাগন্যা দীনবন্ধু বটে। এতদিন আমার ঘাড়ে ছিল, আজ হুজুরের ছিচরণে এনে দিলাম।' দীনবন্ধুর আপাদমস্তক উত্তমরূপে নিরীক্ষণ করে গগনবিহারী বললেন, 'তা যেন এনে দিলে, কিন্তু ছিচরণ আঁচড়ে কামড়ে দেবে না তো?' জিহ্বার কিয়দংশ বাহিরে নির্গত করে মাথা নেড়ে নটবর বলেছিল, 'আজ্ঞ্যা না হুজুর, খুব শান্ত শিষ্টো, সে সব কিছু করবেক নাই। তবে ছোটনোক তো লয়, আসল কায়েত বাচ্চা কি না, জেতের একটু ঝাঁজ আছে।' শুনে গগনবিহারী সবিস্ময়ে বলেছিলেন, 'সে কি নটবর? তুমি নাপিত, আর তোমার ভাগনে কায়েত বাচ্চা কি করে হয়?' একমুখ হেসে নটবর উত্তর দিয়েছিল, 'আজ্ঞ্যা হুজুর, আমাদিগের জেতে ইযার চল্ আছে। আমি লাপিত বটি, কিন্তু আমার বুন তো আর লাপিত লয়।' কিন্তু কেন যে নয়, গগনবিহারীর সে রহস্য ভেদ করবার আর কোন চেষ্টা করেন নি। সেই দিন থেকে আজ পর্যন্ত দীনবন্ধু বরাবর গগনবিহারীর সংসারভুক্ত হয়ে আছে। পিতৃমাতৃহীন তো ছিলই, বিবাহও সে কোন দিন করে নি; সুতরাং একদিনেরও জন্য অন্য কোথাও যাবার প্রয়োজন হয় নি। আত্মীয়তা-রস-বর্জিত শুষ্ক মনের কঠিন ভালবাসা দিয়ে সে এ পর্যন্ত নিরন্তর গগনবিহারীর সেবা করে এসেছে। এক-দিনের জন্য তাতে ত্রুটিবিচ্যুতি ঘটে নি।

রেলিং-এর ধারে গিয়ে নীচের দিকে দৃষ্টিপাত করে দীনবন্ধু বলল, 'কর্তা, বালিগঞ্জ থেকে মা-মণি এসে থাকবেন; গাড়িখানা আমাদেরই তো বটে।'

ভ্রূকুঞ্চিত করে বিকৃত মুখে গগনবিহারী দীনবন্ধুর কথার সুর অনুকরণ করে বললেন, 'আমাদেরই তো বটে! হারামজাদা নিজে গাড়ি পাঠিয়ে এখন সাধু সাজছে!'

গগনবিহারীর এই মন্তব্য শুনে দীনবন্ধুর রাগ হল; বলল, 'বাড়ির ভেতর বউ-দিদিমণি থাকতে আমি কেন গাড়ি পাঠাতে যাব, বুঝতে নারলাম কর্তা।'

গগনবিহারী তর্জন করে উঠলেন, 'বুঝতে নারাচ্ছি তোমাদের! কাল

সকালবেলা বউদিদিমণিকে বাপের বাড়ি চালান দিয়ে তারপর জলস্পর্শ! এখন দয়া করে তাড়াতাড়ি বোতল-টোতলগুলো আলমারির মধ্যে তুলে ফেল্।' মনে মনে বললেন, যে রাগী মেয়ে, ওসব খুনে জিনিস হাতের কাছে রাখা একেবারেই নিরাপদ নয়।

পাশে একটা ছোট গোল টেবিলের উপর এক বোতল হুইস্কি, বোতল দুই সোডা-ওয়াটার আর মদ্যপানের উপযোগী একটা কাচের গ্লাস ছিল, সেগুলোকে নীচে একটা বেতের ট্রের উপর নামিয়ে রেখে দীনবন্ধু টেবিলক্লথটা টেনে নিয়ে আস্তে আস্তে ঝাড়তে আরম্ভ করল। তার এই নিরাকুল নিশ্চিন্ততার সহিত অনাবশ্যক কার্যে মনঃসংযোগ দেখে গগনবিহারীর পিত্ত জ্বলে উঠল; তীক্ষ্ণস্বরে বললেন, 'ওটা তুলে ঝাড়বার এখন কি এমন দরকার পড়ল শুনি? বোতল-টোতলগুলো তার হাতে তুলে না দিয়ে নিশ্চিন্ত হবে না বুঝি?' তারপর বারান্দার প্রান্তভাগে দৃষ্টি পড়বামাত্র চেয়ারের উপর একটুখানি সোজা হয়ে উঠে বসে ঈষৎ স্খলিত কণ্ঠে বললেন, 'আসুন। আস্তাজ্ঞে হোক।'

পিছন ফিরে বাসনাকে আসতে দেখে দীনবন্ধু তার হাতের টেবিলক্লথটা ঝুপ করে বেতের পাত্রটার উপর ফেলে দিলে, তারপর সন্তর্পণে পাত্রটা দু হাতে তুলে নিয়ে প্রস্থান করল। এ অবশ্য সে করলে কেবলমাত্র গগনবিহারীকে সন্তুষ্ট করবার জন্য; বাসনার দৃষ্টি হতে ব্যাপারটাকে গোপন করবার কোন সাধু উদ্দেশ্যই তার ছিল না।

নিঃশব্দ মন্থর গতিতে বাসনা গগনবিহারীর নিকটে উপস্থিত হয়ে তাঁর পদধূলি নিয়ে মাথায় ঠেকাল, তারপর ধীরে ধীরে বারান্দার ধারে গিয়ে রেলিং-এ হেলান দিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়াল।

গগনবিহারী ডাকলেন, 'বাসি!'

কোন উত্তর না দিয়ে বাসনা স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে রইল।

'বাসনা!'

এবারও বাসনা কোনো উত্তর দিল না।

'বাসনাদিদি !'

ইত্যবসরে দীনবন্ধু গগনবিহারীর ঈজিচেয়ারের নিকট বাসনার বসবার জন্য একটা চেয়ার স্থাপন করে গিয়েছিল। বাসনা ধীরে ধীরে এসে সেই চেয়ারে উপবেশন করে বলল, 'কি বলছ ?'

'রাগ করেছ ?'

'না।'

'অভিমান হয়েছে ?'

'না।'

বাসনার বাম হাতখানা দুই হস্তের মধ্যে গ্রহণ করে গগনবিহারী বললেন, 'তবে মুখচন্দ্রের চতুর্দিকে এমন কৃষ্ণবর্ণ মণ্ডলের আবির্ভাব কেন ?'

সে কথার কোন উত্তব না দিয়ে বাসমা বলল, 'একটা কথার উত্তর দেবে দাদামশায় ?'

গগনবিহারী বললেন, 'দয়া করে যখন এসেছ, তখন রাত বারোটা পর্যন্ত তর্ক চলবেই। সুতরাং অনেক কথাই বলতে হবে। কি তোমার কথা শুনি ?'

বাসনা বলল, 'আচ্ছা, শরীরের ওপর এই অত্যেচারটা না করলেই কি নয় ?'

বাসনার কথা শুনে গগনবিহারী ধীরে ধীরে শিরশ্চালনা করে বললেন, 'শরীরের উপর এ অত্যাচার কি-না তা জানি নে বাসু, কিন্তু মনের ওপর এ যে সদাচার তা নিশ্চয়ই বলতে পারি। মনটা যখন একদম বেসুরো মেরে যায়, তখন একমাত্র যে বস্তু তাকে সুরে ফিরিয়ে আনতে পারে তা-এই সুরা। স্বর্গে সুরগণ এই শক্তিরূপিনী সুধা সেবন করেন বলে এর নাম 'সুরা' হয়েছে। তুমি এর নিন্দে করো না।

তিক্তকণ্ঠে বাসনা বলল, 'এবার থেকে তা হলে যত সব মদখোর মাতালদের দেবতা বলে পুজো করব !'

বাসনার কথা শুনে গগনবিহারী উচ্চহাস্য করে উঠলেন; বললেন, 'মদ

খেয়ে যারা মাতাল হয় সেই অর্বাচীনদের না হয় পুজো করো না; কিন্তু মদ খেয়ে যে-সব মহাপুরুষ তুরীয় আনন্দ উপভোগ করে, তাদের পুজো করলে আমি আপত্তি করব না। মদের দুটো অর্থ আছে জান তো?'

সবেগে ঘাড় নেড়ে বাসনা বলল, 'না, আমি জানি নে।'

গগনবিহারী বললেন, 'জান না যখন, আমি বলে দিই শোন। মদের প্রথম অর্থ হল—হর্ষ, আনন্দ; আর দ্বিতীয় অর্থ হল—মত্ততা।'

বাসনা বলল, 'মদের তৃতীয় অর্থ হল—লিভার পেন, লিভার অ্যাবসেস; আর চতুর্থ অর্থ হল—মৃত্যু।'

জিভ কেটে গগনবিহারী বললেন, 'তোমার এ মন্তব্য ঐ পবিত্র পদার্থের প্রতি **blasphemy** হচ্ছে বাস্থ। সাগরপারের পশ্চিমদেশীয় পণ্ডিতেরা হুইস্কিকে '**Water of Life** বলেছেন, আর আমাদের দেশের চিকিৎসাশাস্ত্রে 'আসব' নামে এর প্রশংসা আছে। এর দ্বারা মৃত্যু হয় না, মৃত্যু নিবারিত হয়।'

গগনবিহারীর হুইস্কি-প্রশস্তি শুনে বাসনা হেসে ফেলল; বলল, 'তোমার এই **Water of Life**-এর পরিণাম কিন্তু **Death of Body** দাদামশায়। এরই মধ্যে ভুলে গেছ ছোট মেশোমশায়ের বাবার কথা? এই **Water of Life** দিয়েই পেট ভরতে ভরতে তিনি মারা যান নি কি?'

গগনবিহারী বললেন, 'তা গিয়েছিলেন, কিন্তু হরকুমারের কথা স্বতন্ত্র। তিনি মদ খেতেন না, মদ তাঁকে খেত। সবই মাত্রার কথা বাস্থ। তিল প্রমাণ যে ওষুধ খেলে জীবনী-শক্তি ফিরে আসে, সেই ওষুধ তাল প্রমাণ খেলে মানুষে মারা যায়।'

'কিন্তু তুমি তো তাল প্রমাণই খাও।'

'তা খেলেও সেটা আমার পক্ষে মারাত্মক মাত্রা নয়। এ তুমি ঠিক জেনো, মদ খেয়ে যারা কোনদিন মাতলামি করে নি তাদের কেউ কখনো লিভার অ্যাবসেসে মারা যায় নি। যে-পরিমাণ মদ চৈতন্য সহ্য করে, সে-পরিমাণ মদ লিভারও সহ্য করে। তা ছাড়া আমার মনে হয় বাস্থ, হুইস্কি

হজম করবার পক্ষে আমার একটা জন্মগত শক্তি আছে। ন-মাস ছ-মাস অন্তর যে পরিমাণ মদ খেয়ে আমি খাড়া থাকি, নিয়মিত যারা খায় তারাও বোধ করি তেমন পারে না। এ কথা তুমি মানো কি না?'

বস্তুত একথা খানিকটা না মেনে উপায় ছিল না। বন্ধু-বান্ধব, আত্মীয়-পরিজন, এমন কি দু-চারজন ডাক্তারও মনে করতেন গগনবিহারীর মদ পরিপাক করবার পক্ষে তেমনি একটা কোনো শক্তিই আছে। বাসনা কিন্তু সে কথা আদৌ স্বীকার করল না; বলল, 'যে জিনিস তোমার নিত্য না খেলে চলে, সে জিনিস ন-মাসে ছ-মাসেই বা খাও কেন?'

'কেন খাই তা তো তুমি জান। প্রয়োজন হলেই খাই, বিনা প্রয়োজনে খাই না।'

'তা হোক, এ তোমাকে ছাড়তেই হবে।'

সহাস্য মুখে গগনবিহারী বললেন, 'তা হলে তোমাকেও ঘর ছাড়তে হবে বাসু। কিষ্কিন্ধ্যা পরিত্যাগ করে বৃন্দাবনে বসবাস করতে হবে।'

সবিস্ময়ে বাসনা বলল, 'কেন? আমাকে ঘর ছাড়তে হবে, কেন? আর কিষ্কিন্ধ্যা বৃন্দাবনই বা কি তা তো বুঝলাম না।'

গগনবিহারী হাসতে লাগলেন; বললেন, 'এত বুদ্ধি ধর ভাই, আর এটা বুঝতে পারলে না? আমার বলবার উদ্দেশ্য, বালিগঞ্জ থেকে তোমাকে শ্যামপুকুরে থাকতে হবে। কিষ্কিন্ধ্যা তো কপিরাজ বালীর রাজ্য ছিল, সুতরাং বালিগঞ্জ কিষ্কিন্ধ্যার নামান্তর মাত্র। আর যে অঞ্চলে শ্যামপুকুর শ্যামবাজার প্রভৃতি পাড়া বর্তমান, তা বৃন্দাবন নয় তো আর কি?'

গগনবিহারীর ব্যাখ্যা শুনে বাসনা হাসতে লাগল; বলল, 'আচ্ছা, কিষ্কিন্ধ্যা বৃন্দাবন না হয় বুঝলাম, কিন্তু আমাকে ঘর ছাড়তে হবে কেন?'

গগনবিহারীর হাস্যোজ্জ্বল মুখে সহসা একটা ছায়াপথ হল। ঈষৎ গভীর কণ্ঠে বললেন, 'তা হবে বাসু, বাপের বাড়ি ছেড়ে তোমাকে দাদামশায়ের বাড়িতে থাকতে হবে। তোমাকে দেখলে আমার মদ খাওয়ার নেশা লোপ

পায, তা জানি, আব তুমি কাছে থাকলে আমাব মদ খাওযাব লোভ জন্মাতেই পাববে না বলে আমি বিশ্বাস কবি। কেন জান?'

স্মিতমুখে বাসনা বলল, 'বোধ হয আমাকে ভয কবেন বলে।

'ভয তো নিশ্চয কবি, কিন্তু কেন কবি?'

হাসিমুখে বাসনা বলল, 'বোধ হয ভালবাসেন বলে।'

গগনবিহাবী বললেন, 'সে কথাও সত্যি, খুবই ভালবাসি তোমাকে, কিন্তু আসল কথা বলি শোন। তোমাব দুটি চোখে যখন অসন্তোষেব ভ্রূকুটি ফুটে ওঠে, তখন তোমাব দিদিমাব কথা মনে পডতে এক মুহূর্তও দেবি হয না। তোমাব শান্ত চোখে তাব কোনো চিহ্নই খুজে পাই না, কিন্তু চোখ দুটি যখন উত্তপ্ত হযে ওঠে তখন তা়ব মবো আশ্চয মিল। মনে হয, তোমাব চোখেব ভিতব দিযে সে ই যেন শাসন কবছে।'

এ কথাব বাসনা কোনো উত্তব দিল না, তাব স্নেহময মাতামহেব হৃদযেব নিগূঢ কাহিনী শুনে সমবেদনায সে স্তব্ধ হযে বসে বইল। দাদা-মহাশয এবং নাতনীব নিবব গ্রহ প্রীতি ব্যবহাবেব মূলে যে বসাযন বস্তুটি এতদিন এক পক্ষেব দ্বাবা অনুক্ত এবং অপব পক্ষেব নিকট অপবিজ্ঞাত ছিল আজ তাব এই অবিপ্লুত প্রকাশেব আঘাতে ক্ষণকালেব জন্য উভযে চকিত হগে বইল।

'বাসু!'

'দাদামশায?'

'কোন্‌খানে আমাব দুর্বলতা, আজকেব এই দুর্বল মুহূর্তে তা তোমাকে বলে ফেললাম। তোমাব খবধাব অস্ত্রেব সন্ধানও তোমাকে দিলাম। কিন্তু আশা কবি, তাই বলে এখন থেকে অসমযে অপ্রযোজনে আমাব ওপব তোমাব অস্ত্র চালনা কববে ন'।' বলে গগনবিহাবী হাসতে লাগলেন।

অপ্রতিভ স্মিতমুখে বাসনা বলল, 'আমাব তো ভয হয দাদামশায, ঠিক

উল্টোই হবে। এতদিন যে অজানা অস্ত্র আপনা-আপনিই চলত, এখন থেকে হয়তো প্রয়োজনের সময়েও ঠিকমত চলতে পারবে না।'

গগনবিহারী বললেন, 'তা হলে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্তই হব। আমার মত কোনো কোনো বেয়াড়া লোক আরামের নিরুদ্বেগের চেয়ে আঘাতের উত্তেজনাই বেশি পছন্দ করে তা তো বোঝ বাস্থ।'

বাসনা বলল, 'তা তো খুবই বুঝি দাদামশায়। এ বিষয়ে তোমার সঙ্গে আমি এক গোত্র। কিন্তু আঘাতের উত্তেজনা বেশি পছন্দ করি বলে লোকে আমাকে ঝগড়াটে বলে।' বলে সে হাসতে লাগল।

গগনবিহারী বললেন, 'লোকের কথা ধরো না ভাই, সংসারের অধিকাংশ লোকই অরসিক। তারা জানে না, কোন্ ভাঁড়ের মধ্যে কোন্ সুধা সঞ্চিত থাকে। তোমার জীবন-পথে যে পথিক-সঙ্গীটি শীঘ্রই তোমার পাশে এসে দাঁড়াবে, সে ভাগ্যবান ব্যক্তিটিকে সর্বদা আঘাতের আনন্দে উত্তেজিত করে রেখো—তোমার প্রতি এই আমার উপদেশ।'

গগনবিহারীর পরিহাসে ক্ষণেকের জন্য বাসনার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল; তারপর মৃদু হেসে সে বলল, 'তোমার উপদেশের জন্য ধন্যবাদ দাদামশায়, কিন্তু জীবনে তোমার উপদেশ খাটাবার মত অবস্থা যে ঘটবেই, তার কোনো মানে নেই।'

কপট বিস্ময়ের সুরে গগনবিহারী বললেন, 'কেন? মানে নেই কেন? শ্যামের লাগিয়া সব তেয়াগিয়া তুমি কি যোগিনী হবে? অথবা, বিবাহ সব স্ত্রীলোককে যে নিশ্চয় করিতেই হবে—এই কুসংস্কারের বিরুদ্ধাচারিণী হয়ে এ কথা বলছ?'

গগনবিহারীর কথা শুনে বাসনা হেসে ফেলল; বলল, 'আচ্ছা, এর মীমাংসা তোমার সঙ্গে পরে হবে দাদামশায়; এখন মামীমাদের সঙ্গে একবার দেখা করে আসি।' বলে উঠে দাঁড়াল।

গগনবিহারী বললেন, 'বেশ যোয়ো। একটা কথা জিজ্ঞেস করি। পরীক্ষা তো হয়ে গেল, কেমন দিলে ?'

ধীরে ধীরে চেয়ারে উপবেশন করে মাথা নেড়ে বাসনা বলল, 'খুব ভাল দিতে পারি নি। কি করে হবে, শেষকালটা তো মাষ্টার মশায়ের সাহায্য একেবারেই পেলাম না।'

'অমরেশ কি এখনো আসে নি ?'

'না, আসেন নি তো বটেই, লিখেছেন কুম্ভযোগের শেষ স্নানটা না সারা হলে আসবেন না।'

'সে এত বড় ভক্ত হল কবে ?'

বিস্ময়ের স্বরে বাসনা বললে, 'ভক্ত ? তবেই হয়েছে! বোধ হয় ঠিক তার উল্টো। যাবার সময় আমাকে বলে গেছেন, কুম্ভস্নানে ডুব দেবার সময়ে পুণ্যকামীদের নিশ্চয় দুটো দুটো করেই হাত থাকবে; ডুব দিয়ে ওঠবার পর তাদের সেই দুটো দুটো হাতই থাকবে না, আরও দুটো করে বেশি নিয়ে উঠবে, তাই দেখতে যাচ্ছি। আচ্ছা, শুনুন তো কথা!'

গগনবিহারী বললেন, 'নাঃ, কথাটা শোনবার মতই বটে। এ যেন একেবারে চার্বাক দি সেকেণ্ড।'

'সত্যিই তাই দাদামশায়। মাষ্টার মশায় বলেন, বিদ্যেটা বৃহস্পতির কাছ থেকে আদায় করা বলে মুনি-ঋষিদের মধ্যে একমাত্র চার্বাকেরই বুদ্ধি-বিবেচনা ছিল। মৃত ব্যক্তির শ্রাদ্ধ করলে তার আত্মার যদি পেট ভরে, তা হলে বিদেশে কোনো লোক গেলে খাবার জন্যে তাকে পয়সা না দিয়ে প্রত্যহ বাড়িতে একজন করে ব্রাহ্মণকে খাওয়ালেই তো বিদেশে সেই আপনার জনের পেট ভরতে পারে। মাষ্টার মশায় বলেন, চার্বাকের এই যুক্তির কাটান নেই।'

গগণবিহারী হাসতে হাসতে বললেন, 'সত্যি, একেবারে অকাট্য। কিন্তু যাই বল বাসু, মাষ্টারটি যে আমি তোমাকে দিয়েছি, সে সত্যিকারের একজন পণ্ডিত লোক।'

প্রসন্নমুখে বাসনা বললে, 'নাঃ, সে কথা একশো বার সত্যি। পাণ্ডিত্যের থৈ নেই! কোন একটা বিষয় যখন পড়ান, তখন আগুনের সামনে বরফ যেমন দেখতে দেখতে গলে জল হয়ে যায়, তেমনি তাঁর ব্যাখ্যার সামনে সেই বিষয়টার অত্যন্ত কঠিন অংশগুলো দেখতে দেখতে জল হয়ে যায়। মনে হয়, আশ্চর্য, এই সহজ জিনিসগুলো আগে কেন বুঝি নি!'

গগনবিহারী বললেন, 'সেই জন্যেই তো তিনি তোমার বিদ্যেবুদ্ধির নিন্দে করেন।'

'কি বলেন শুনি?'

'বলেন, কঠিন জিনিসগুলো বুঝিয়ে দিলে বুঝতে পারে।'

হাসি চেপে বাসনা বলল, 'তা, বুঝিয়ে দিলেও যদি না বুঝতে পারব, তা হলে অত মাইনে দিয়ে তাঁকে রাখব কেন? আর না বুঝিয়ে দিলেও যদি বুঝতে পারতাম, তা হলেই বা মিছিমিছি রাখতাম কেন?'

গম্ভীর মুখে গগনবিহারী বললেন, 'সত্যই তো। এ যুক্তি অস্বীকার করবার উপায় নেই।' তারপর এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'আর কি বলেন জান?'

'কি বলেন?'

'বলেন, এত ছেলে-মেয়ে পড়িয়েছি, কিন্তু বাসনার সঙ্গে কারো তুলনাই হয় না।'

'বুদ্ধিতে, না, বোকামীতে?'

'বিমূঢ়তার ভঙ্গী সহকারে গগনবিহারী বললেন, 'এই দেখ, সেই কথাটা জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি! আচ্ছা, এবার এলে জেনে নিয়ে তোমাকে বলব।'

খিলখিল করে হেসে উঠে বাসনা বলল, 'আচ্ছা, তাই বলো। আমি এখন ভিতরে চললাম।' বলে উঠে পড়ল।

গগনবিহারী বললেন, 'বাসু, বউমাকে বলো তোমার খাবার যেন আমার সঙ্গে বাইরে দেন।'

'না বললেও তিনি তাই দেবেন দাদামশায়। আচ্ছা; তবু বলব।' বলে বাসনা অন্দর-মহলের অভিমুখে দ্রুতপদে প্রস্থান করল।

বাসনা চলে গেলে দীনবন্ধু গগনবিহারীর নিকট এসে বললে, 'কর্তা, আপনকার কাছে একটা নিবেদন আছে।'

ভ্রূকুঞ্চিত করে গগনবিহারী বললেন, 'এরই মধ্যে তোমার আবার কি নিবেদনের কথা মনে হল?'

'মা-মণিকে আর ছেড়ো না। তুমি—এ বাড়িতে রাখবারই বন্দোবস্ত কর।'

গগনবিহারী ধমক দিয়ে উঠলেন, 'তাতে তোমার কি উপকার হবে শুনি? হারামজাদার পেটে পেটে দুষ্টুবুদ্ধি, সব আড়ি পেতে শুনেছে!'

গভীর বিরক্তিমিশ্রিত কণ্ঠে দীনবন্ধু বলল, 'এই দেখ! ভাল কথা বললাম তবু খামকা গালমন্দ আরম্ভ করলে!'

গগনবিহারী বললেন, 'গালমন্দ দেবে না, ওঁর স্তবগান করবে! যা টেবিলের ওপর আমাদের দুজনের খাবার যোগাড় কর শীগ্‌গির।'

গজর গজর করতে করতে দীনবন্ধু প্রভুর আদেশ পালনের জন্য প্রস্থান করল।

৫

পারুলের মার মৃত্যুর পর কযেকদিন অতিবাহিত হয়েছে, কিন্তু ইতিমধ্যে বিজয়লাল অথবা ভজুয়ার কোনো সংবাদই পাওয়া যায় নি। প্রথম দিন থেকেই পারুল অমরেশের গৃহে বাস করছে এবং তার ঐকান্তিক ইচ্ছাক্রমে অমরেশকেও সেই গৃহে রাত্রি যাপন করতে হয়। মনুষ্যলোক এবং প্রেতলোক সংক্রান্ত নানাবিধ আশঙ্কায় তার মন ভারাক্রান্ত, এবং একমাত্র অমরেশ ভিন্ন হরিদ্বারে আর কোনও ব্যক্তির প্রতি তার বিশ্বাস অথবা নির্ভরতার সম্ভাবনা দেখা যায় না।

অমরেশ বলেছিল, 'জীবিত গুণ্ডাদের না-হয় দু-চার মিনিট লড়াই করে ঠেকিয়ে রাখতে পারি, কিন্তু মরে যারা গুণ্ডা হয়েছে তাদের ঠেকিয়ে রাখবার কোন কৌশলই তো জানি নে পারুল।' উত্তরে পারুল বলেছিল, 'আপনি বামুন মানুষ, আপনার কাছে তারা আসতে পারবে না।' অমরেশ বলেছিল, 'তোমার জন্যে যাকে প্রহরী নিযুক্ত করব মনে করেছি সে চৌবে, অর্থাৎ বামুন; সুতরাং সে মরা গুণ্ডা আর জ্যান্ত গুণ্ডা দুই সামলাতে পারবে।' কিন্তু এ আশ্বাস প্রদর্শনের ফলেও চৌবের প্রতি পারুলের কিছুমাত্র আস্থা জন্মাতে দেখা যায় নি। অগত্যা অমরেশকে রাত্রে তার বাসায় শয়ন করতে বাধ্য হতে হয়েছিল।

দুটি ঘরের মধ্যে বড় ঘরটি অমরেশ পারুলকে ব্যবহারের জন্য ছেড়ে দিতে চেয়েছিল, কিন্তু পারুল তাতে কিছুতেই সম্মত না হয়ে ছোট ঘরেই নিজের থাকবার ব্যবস্থা করে নিয়েছিল। প্রথম দিন-তিনেক সেই ঘরেরই একদিকে কোনো রকমে সে নিজের রন্ধন-কার্যটা সেরে নিত, বারান্দার একপ্রান্তে যথাপূর্ব কুকারে অমরেশের

আহার প্রস্তুত হত। চতুর্থ দিনে অমরেশ আপত্তি তুলল; বলল, 'আমার রান্নার সমস্ত ব্যাপারটা তুমিই তো করে থাক পারুল, আমি শুধু নামে রাঁধি। এ ছলনায় কাজ কি? আজ থেকে আমার কুকার আর তোমার কড়া এক করে নাও, এক চৌকার অন্তর্গত।'

বিস্ময়ে এবং আনন্দে পারুলের মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল; বলল, 'আমার হাতের রান্না আপনি খাবেন?'

হাসিমুখে অমরেশ বলল, 'না খাবার তো কারণ দেখি নে। সামান্য উপকরণ দিয়ে ছ্যাকছোঁক করে তুমি যখন রাঁধ, তখন তোমার কড়া থেকে যে-রকম সুবাস ছাড়ে, তাতে মনে হয় তৃপ্তির সঙ্গেই খাব।'

এক মুহূর্ত নীরবে অবস্থান করে ঈষৎ সঙ্কোচের সহিত পারুল বলল, 'কিন্তু আপনাকে তো সেদিনই সব বলেছি,—আপনি তো জানেন,—আমার কথা আপনি সবই জানেন—'

কি কথা বলতে পারুল চেষ্টা করছে অথচ কুণ্ঠিত হচ্ছে, তা বুঝতে পেরে অমরেশ তাকে কথা শেষ করবার অবসর না দিয়ে বলল, 'তোমার কথা আমি সব জানি, কিন্তু মহর্ষি সত্যকামের কথা তুমি কি কিছু জান পারুল?'

মাথা নেড়ে পারুল বলল, 'না।'

অমরেশ বলল, 'সত্যকাম একজন খুব বড় ঋষি ছিলেন। বাল্যকালে তিনি বিদ্যা শেখবার জন্য মহর্ষি গৌতমের কাছে উপস্থিত হলে গৌতম সত্যকামের বংশপরিচয় জিজ্ঞাসা করেন; বলেন, 'বাবা, তোমার গোত্র কি?' তাতে সত্যকাম বলেন, 'আমি তো জানি নে; মাকে জিজ্ঞাসা করে কাল আপনাকে বলব।' পরদিন গৌতমের নিকট উপস্থিত হয়ে সত্যকাম বললেন, 'আমার মার কাছে জানলাম যে, যৌবনে তিনি বহুচারিণী ছিলেন; সেই সময় আমার জন্ম হয়, সুতরাং আমার গোত্র কি, তা তিনি নিজেই জানেন না। আমার মা জবালা, আর আমি সত্যকাম, এই পর্যন্তই আপনাকে বলতে পারি।' সত্যকামের সত্যবাদিতায় খুশি হয়ে গৌতম তাঁকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করেন—আর তাঁর

মাতার পরিচয়ে তাঁর নাম দেন সত্যকাম জাবালি। তুমিও তো সেদিন তোমার গোত্র বলতে পার নি, তারপর স্বেচ্ছায় সহজভাবে আমাকে তোমার সত্য পরিচয় দিয়েছিলে। সুতরাং তোমার সত্যবাদিতায় খুশি হয়ে গৌতমের মত আমিও তোমার হাতে অন্ন গ্রহণ করতে সম্মত হলাম, আর তোমার মার পরিচয়ে তোমার নাম নিলাম পারুল-প্রভা। এখন বল, কি তুমি চাও? —গৌতমের চেয়ে অমরেশ হীন হয়ে যায়, তাই চাও?—না, মহর্ষি সত্যকাম জাবালির মত পারুল-প্রভা বড় হয়ে ওঠে, তা চাও না। বল, কি চাও?' বলে অমরেশ হাসতে লাগল।

এ প্রশ্নের উত্তরে পারুল কোনো কথাই বলল না, সত্যকাম ও গৌতমের যে কাহিনী অমরেশ বলল তার তাৎপর্য এবং প্রযুক্ততাও হয়তো সে সম্পূর্ণভাবে বুঝল না; কিন্তু এই দুই-তিন দিনের বাক্য এবং আচরণে অমরেশের যে পরিচয় সে পেয়েছে তাতে একথা সে নিঃসন্দেহে বুঝল যে, এ প্রসঙ্গে আর কোনো বিচার-বিতর্ক তোলবার প্রয়োজন নেই।

প্রত্যূষে যথারীতি একজন পশ্চিমা ঠিকা পরিচারিকা চৌকা এবং বাসন মেজে দিয়ে গেছে। বারান্দার এক প্রান্তে একটু ঘিরে-ঘেরে পারুল রন্ধনের জন্য যথাসম্ভব প্রশস্ত খানিকটা স্থান করে নিল, তারপর গঙ্গাস্নান সেরে এসে মহা উৎসাহের সহিত রন্ধনের উদ্যোগ পর্বে লেগে গেল।

এইটুকু অধিকার প্রাপ্তির মধ্য দিয়ে ক্রমশ অমরেশের অস্থায়ী ক্ষুদ্র সংসারের সর্বত্র পারুলের দৃষ্টি পড়ল। প্রথমে দিন তিনেক সে একান্ত ভাবে আশ্রিতা হয়েই ছিল। শুধু গ্রহণই করেছে, দান করবার কিছুই ছিল না; কিন্তু এখন ক্রমশ তার মনে হতে লাগল যে, আর কিছু না হোক, দেহ এবং মনের নির্বিকল্প পরিচর্যার দ্বারা সে হয়তো তার দুষ্পরিশোধনীয় ঋণ-ভারের কতকটা অংশ পরিশোধ করতে পারে। দুর্দিনের রক্ষাকর্তা আশ্রয়দাতা আত্মভোলা উদাসীন অমরেশের প্রতি একটা উগ্র সেবা-লালসায় পারুলের সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় উদগ্র হয়ে উঠল।

দক্ষেশ্বর শিবমন্দিরে শ্রীসম্প্রদায়ের একজন সাধু কর্তৃক বৈষ্ণব ধর্মের ব্যাখ্যা হবার কথা ছিল। সভারম্ভের পূর্বে উক্ত সাধুর সঙ্গে একটু আলাপ-আলোচনার অভিপ্রায়ে মধ্যাহ্নে আহারাদির পর অল্প কিছুক্ষণ বিশ্রাম করেই অমরেশ শিব-মন্দিরের উদ্দেশে নির্গত হল। সদর-দরজায় অর্গল লাগিয়ে দিয়ে এসে পারুল দেখল, অমরেশের কক্ষে তালা লাগানো নেই, শুধু শিকলটা টানা আছে। দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করল, শিকলে হস্তার্পণ করেও একবার কি ভাবল, তারপর শিকলটা টেনে খুলে ফেলে দরজা ঠেলে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করল। এর পূর্বে কোনো দিনই সে এ ঘরে প্রবেশ করে নি, এমন-কি বাহির হতে উঁকি মেরেও ভিতরের অবস্থা কখনো দেখে নি।

ঘরে প্রবেশ করে পারুল দেখল, জিনিসপত্র খুবই সামান্য: কিন্তু সেই সামান্য জিনিসপত্রকে অবলম্বন করে এলোমেলোমির অসামান্য লীলা দেখে তার হাসিও যেমন পেল, দুঃখও তেমনি হল। বিছানার চাদর কুঞ্চিত, অবিন্যস্ত; দু' জোড়া জুতার মধ্যে এক জোড়া দক্ষিণ দিকের কোণে অবস্থিত, তন্মধ্যে একপাটি উল্টে রয়েছে,—অপর জোড়া পশ্চিম দিকের মধ্যস্থলে বিরাজ করছে, অর্থাৎ যখন যেখানে পরিধানকারীব খেয়াল হয়েছে সেইখানেই তারা মুক্তিলাভ করেছে। পরিধেয় বস্ত্রাদির কোনটি শয্যার উপর ছাড়া, কোনটি ভাঙা চেয়ারের পৃষ্ঠদেশে বিলম্বিত, কোনটা বা স্যুটকেসের ডালার উপর জড়ো করে রাখা। কয়েক খানা বই এবং খাতাপত্র ইতস্ততবিক্ষিপ্ত।

এক টুকরো দড়ি সংগ্রহ করে পারুল সর্বাগ্রে ঘরের এক কোণে কোনো রকমে একটা আলনা টাঙিয়ে নিল, তারপর ধুতি ও পাঞ্জাবিগুলো ভাল করে গুছিয়ে তদুপরি স্থাপন করল; বাহির হতে একটা ঝাঁটা সংগ্রহ করে এনে ঘরের সমস্ত ধুলা ময়লা উত্তমরূপে পরিষ্কার করে ফেলল; শয্যা সুবিন্যস্ত করল; বইগুলো সাজিয়ে রাখল; সর্বশেষে পড়লো জুতা দু জোড়ার পালা। একটা অপরিচ্ছন্ন তোয়ালে দিয়ে জুতাগুলো পরিষ্কার করে ঘরের একটা কোণে রাখতে গিয়ে হঠাৎ কি খেয়াল হল, একপাটি তুলে নিয়ে ধীরে ধীরে মাথায়

'ঠেকাল, তারপর গৃহে দ্বিতীয় ব্যক্তি কেউ নেই যে জ্ঞান সম্পূর্ণ থাকা সত্ত্বেও বাইরের দিকে একবার চকিত দৃষ্টিপাত করে তাড়াতাড়ি মুহূর্তের জন্য জুতাটা বুকের উপর দু হাত দিয়ে চেপে ধরল। পরে অঞ্চলের অগ্রভাগ দিয়ে সব জুতাগুলাই আর একবার করে মুছে' রেখে উঠে দাঁড়াল। ঘরের চতুর্দিক ধীরে ধীরে অবলোকন করে পরিবর্তিত অবস্থার জন্য সে খুশিই হয়েছে বলে মনে হল। অবশেষে ঘর থেকে বেবিয়ে এসে দরজা বন্ধ করে শিকল টেনে দিয়ে নিজের ঘরে গিয়ে প্রবেশ করল।

সন্ধ্যার পর অমরেশ যখন গৃহে এল তখন পারুল রান্না চড়িয়েছে। নিকটে উপস্থিত হয়ে অমরেশ বলল, 'এ বেলাও সেই রকম চর্বচোষ্যের ব্যবস্থা করছ না।ক প।রুল ?'

মুখ ফিরিয়ে অমরেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে স্মিত মুখে পারুল বলল, 'বলবার মত ও-বেলা কিছুই তো ব্যবস্থা করি নি। চা খাবেন ? জল চড়াব ?'

অমরেশ বলল, 'না, চা আমি খেয়ে এসেছি।'

ঘরে প্রবেশ করে অমরেশের সর্বপ্রথম দৃষ্টি পড়ল কেরোসিন-ল্যাম্পের উপর। অপ্রত্যাশিত ঔজ্জ্বল্যের সহিত উক্ত দীপযন্ত্রটি আলোক বিকিরণ করছে। হেতু তার প্রধানত দুটি মনে হল। প্রথমত, চিমনির ক্রমসঞ্চীয়মান কালি সম্পূর্ণ ভাবে লোপ পেয়েছে; এবং দ্বিতীয়ত, শিখার আকার এবং বর্ধিত আয়তন দেখে মনে হয় বাতিটি যত্নপূর্বক কাটা হয়েছে। সমুজ্জ্বল আলোকের সহায়তায় ক্রমশ কক্ষের সর্বত্র দৃষ্টি পড়ল, এবং সর্বত্রই যে সংস্কারপরায়ণ একজোড়া সুনিপুণ হস্ত তার ক্রিয়াশীলতার চিহ্ন রেখে গেছে তা অনুভব করতে বিলম্ব হল না।

ঘর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে অমরেশ প্রথমে পারুলের ঘরে প্রবেশ করল ঃ তারপর ঘুরে ঘুরে বারান্দা, অঙ্গণ, স্নানের ঘর সর্বত্র পরিদর্শন করতে লাগল; অবশেষে পারুলের সন্নিকটে উপস্থিত হয়ে বিস্ময়মিশ্রিত স্বরে বলল, 'কি কাণ্ড পারুল!'

কাণ্ডটা যে কি, তা বুঝতে পারুলের একটুও বাকি ছিল না, পিছন ফিরে রাঁধতে রাঁধতে বলল, 'তা তো জানি নে।'

অমরেশ বলল, 'জান না? তা হলে এসব ব্যাপার কি করে হল? ভৌতিক ক্রিয়ায়, না, জাদুবলে?'

সেই রকম পিছন-ফেরা অবস্থায় হাতা নাড়তে নাড়তে পারুল বলল, 'এমন তো কিছুই হয় নি।'

অমরেশ বলল, 'যেমনই হোক, তুমি দেখছি আমাকে বিপদে না ফেলে ছাড়বে না। হরিদ্বারে এসে সাধু-সঙ্গ ক'রে মনের মধ্যে খানিকটা বৈরাগ্যের মশলা ভরে নিয়ে বাড়ি ফিরব মনে করেছিলাম, কিন্তু তুমি যদি সংসারের এই রকম মোহিনী মূর্তি দেখাতে আরম্ভ কর, তা হলে শেষ পর্যন্ত বাংলা দেশে ফিরে গিয়ে ঘটক ডাকতে না হয়!'

কড়াটা উনান থেকে নামিয়ে রেখে অমরেশের দিকে সুমুখ ফিরে সকৌতূহলে পারুল জিজ্ঞাসা করল, 'ঘটক ডাকাতে হবে কেন দাদা? আপনার কি এখনো বিয়ে হয় নি নাকি!'

অমরেশ বলল, 'সকলেরই কি সব জিনিস হয়?'

'আপনার হয়। আপনার আবার বিয়ের অভাব! করেন নি, তাই হয় নি। এখনও তো করতে পারেন।'

'এই বৃদ্ধ বয়সে?'

সবিস্ময়ে পারুল বলল, 'বৃদ্ধ বয়স কি রকম? আপনার আর কি এমন বয়স হয়েছে?'

পারুলের কথা শুনে অমরেশ হাসতে লাগল; বলল, 'তুমি কত অনুমান কর?'

অমরেশের দিকে একবার ভাল করে দৃষ্টিপাত করে একটু ভেবে পারুল বলল, 'তিরিশ-বত্রিশ।'

মনে মনে একটু হিসেব করে নিয়ে পারুল বলল, 'তা হলেও পুরুষমানুষের পক্ষে ও-বয়স এমন কিছু বেশি নয়।'

শুনে অমরেশ হাসতে লাগল ; বলল, 'তোমাদের কাছে পুরুষমানুষের সাতখুন মাফ ; তার বার্ধক্যকে ক্ষমা করতেও তোমাদের তেমন কিছু বাধে না।'

এ প্রসঙ্গ কিন্তু আর বেশিদূর অগ্রসর হল না, বাহিরে কড়া নাড়ার শব্দ শোনা গেল। সংবাদ নিয়ে এসে অমরেশ একটু ব্যস্ততার সহিত জিজ্ঞাসা করল, 'খাবার প্রস্তুত হয়েছে পারুল ?'

'হয়েছে।'

'তা হ'লে আমাকে দিয়ে দাও। আমার একটি পরিচিত লোকের আর তাঁর স্ত্রীর প্রায় একসঙ্গে কলেরা আরম্ভ হয়েছে, এখনি আমাকে যেতে হবে।'

কলেরার নাম শুনে পারুলের অন্তরাত্মা পর্যন্ত শিউরে উঠল ; ব্যগ্রকণ্ঠে সে বলল, 'আমাকেও সঙ্গে নিন দাদা। দুজন তো রুগী, আমরা ভাগাভাগি করে সেবা করব।'

অমরেশ বলল, 'না, তোমার সেখানে গিয়ে কাজ নেই। একলা থাকতে ভয় করছ তো ? কোনো ভয় নেই, আমি লখিয়ামাঈকে পাঠিয়ে দিয়ে যাচ্ছি, সে এসে তোমার কাছে শোবে। তা ছাড়া সামনেই শীতল চৌবে আছে, তাকেও বলে যাব।'

পারুল বলল, 'লখিয়ামাঈ আর শীতল চৌবে সব ভয় ভাঙাতে পারে না দাদা। আমাকে সঙ্গে নিয়ে চলুন।'

মনে মনে কি চিন্তা করে অমরেশ ধীরে ধীরে শিরশ্চালনা করতে করতে বলল, 'তুমি ছেলেমানুষ, সে অসুখের জায়গায় তোমার যাওয়া উচিত হবে না পারুল।'

উচ্ছ্বসিত স্বরে পারুল বলল, 'কাজের সময় যদি আমাকে ছেলেমানুষ বলবেন, মেয়েমানুষ বলবেন, তা হলে আজ সকালে কেন আমাকে সত্যকামের গল্প শুনিয়েছিলেন ? এ কিন্তু আপনার অন্যায় হচ্ছে !'

আরও খানিকটা কথা-কাটাকাটির পর অমরেশ যখন বুঝতে পারল যে, পারুলকে নিরস্ত করা সহজ হবে না, তখন অগত্যা তার প্রস্তাবে সম্মত হল ;

বলল, 'তা হলে তুমিও খেয়ে নিয়ে প্রস্তুত হও। খালি পেটে ওসব জায়গায় যেতে নেই।'

মিনিট দশেকের মধ্যে আহারাদি শেষ করে উভয়ে সদর দরজায় তালা দিয়ে পথে বাহির হয়ে পড়ল। গৃহের প্রতি একটু দৃষ্টি এবং মনোযোগ রাখবার জন্য অমরেশ শীতল চৌবেকে অনুরোধ করে গেল।

টর্চের আলো ফেলতে ফেলতে নিঃশব্দে দ্রুতপদে উভয়ে পাশাপাশি পথ চলছিল। সহসা এক সময়ে অমরেশ ডাকল, 'পারুল!'

একটু কাছে সরে এসে পারুল বলল, 'আজ্ঞে?'

'তুমি মেয়েমানুষ, সুতরাং সত্যকামের মত তোমার মহর্ষি হওয়া সম্ভব হবে না, কিন্তু আমি সর্বান্তঃকরণে আশীর্বাদ করছি, তুমি মহীয়সী হয়ো। মহীয়সীর মানে জান তো?'

মাথা নেড়ে পারুল বলল, 'না, গরীয়সীর মানে জানি।'

পারুলের কথা শুনে অমরেশ হেসে ফেলল; বলল, 'মহীয়সী আর গরীয়সীর প্রায় একই অর্থ! মহীয়সী মানে অতি মহৎ; গরীয়সীর মানে তুমি কেমন করে জানলে?'

কালী-দর্শন করতে গিয়ে কালীঘাট থেকে পারুল লম্বা কাচ দিয়ে বাঁধানো একটা 'জননী জন্মভূমিশ্চ স্বর্গাদপি গরীয়সী' কিনে এনেছিল। কলিকাতা গরান-হাটা স্ট্রীটের বাড়িতে এখনও সেটা টাঙানো আছে। সেই থেকেই গরীয়সী শব্দের সহিত তার পরিচয়। কিন্তু সে বিষয়ে কোন কথা না বলে সে বলল, 'দাদা, এই আশীর্বাদ করুন যে, আপনার আশীর্বাদ যেন কোনো মতেই নিষ্ফল না হয়।'

অমরেশ বলল, 'সে আশীর্বাদের বাকি রাখি নি পারুল।'

পারুল আর কোনো কথা বলল না। বেশ্যার কন্যা বেশ্যা পারুল-প্রভার মনের মধ্যে তখন প্রবল রাসায়নিক ক্রিয়া আরম্ভ হয়ে গিয়েছিল।

৬

ঘণ্টা দুয়েকের আগে-পিছে স্বামী এবং স্ত্রী কলেরা রোগে আক্রান্ত হয়েছিল। ডাক্তারের চিকিৎসা এবং অমরেশ প্রভৃতি সেবাকারীগণের নিরবসর শুশ্রূষা অবলীলাক্রমে অতিক্রম করে স্বামী প্রত্যূষে সূর্যোদয়ের পূর্বে পরলোকের যাত্রী হল। দুর্দান্ত রোগ-যন্ত্রণার উপর স্ত্রীর অসহ্য হয়ে উঠল শোকের দুর্বিসহ যন্ত্রণা। সমস্ত দিন তার মুখের বুলি হল, 'ওগো, তোমরা আমাকে সেবা করে বাঁচিয়ে তুলে আমার সর্বনাশ করো না। যেতে দাও আমাকে তাঁর কাছে, দয়া করে যেতে দাও।' সন্ধ্যার অব্যবহিত পূর্বে বিধাতা-পুরুষ অভাগিনীর করুণ প্রার্থনায় কর্ণপাত করলেন। দাহ-কার্যের ব্যবস্থা হয়ে গেলে পারুলকে নিয়ে গঙ্গাস্নান করে অমরেশ যখন গৃহে ফিরল, তখন রাত্রি প্রায় আটটা।

অল্প সময়ের ব্যবধানে চোখের সম্মুখে স্বামী এবং স্ত্রী দুইজনের মৃত্যু অবলোকন করে—বিশেষত সেই ভীষণ রোগে, যে রোগে মাত্র কয়েক দিন আগে সে তার জননীকে হারিয়েছে—পারুলের মন একটা উৎকট সন্ত্রাসে এবং আঘাতে অসাড় হয়ে গিয়েছিল। গৃহে ফিরে অল্পক্ষণ পরে অমরেশ যখন বলল, 'তোমার অনেক কষ্ট গেছে পারুল, আজ আর রান্নাবান্না করে কাজ নেই, ভাল দোকান থেকে কিছু পুরি ভাজিয়ে আনাই, সকাল সকাল খাওয়া-দাওয়া সেরে শুয়ে পড়া যাক', তখন পারুলের চেতনা স্বাভাবিকের রেখাঙ্কনের দিকে অনেকখানি ফিরে এল। বলল, 'না দাদা, এত অসুখ-বিসুখের সময় বাজারের খাবার খেয়ে কাজ নেই। আমি উননে আগুন দিয়ে চায়ের জল চড়িয়ে দিচ্ছি, আপনি হাত-পা ধুয়ে বসুন। তারপর সামান্য দুটো ভাতে-ভাত রেঁধে নেব অখন।'

অমরেশ আর এ বিষয়ে তেমন আপত্তি করল না, বিশেষত কথাটা যখন একমাত্র তারই আহার নিয়ে নয়।

রাত্রে শয়নের পূর্বে অমরেশ বলল, 'পারুল. কাল আমাদের হৃষীকেশ যাবার কথা, জান তো ? রাত্রি তিনটের সময় উঠতে হবে। আমার যদি ঘুম না ভাঙে আর তোমার যদি ভাঙে, তাহলে আমাকে উঠিয়ে দিয়ো।'

হৃষীকেশে একজন উচ্চশ্রেণীর অঘোরপন্থী যোগীর আগমনের কথা শোনা গিয়েছিল। অমরেশের পরিচিত চার-পাঁচজন সাধুর সহিত অমরেশ উক্ত যোগীকে দর্শন করতে যাবে, সে কথা কয়েকদিন থেকে স্থির হয়ে আছে। কথাটা একবার পারুল শুনেছিল, কিন্তু গতরাত্রি হতে অসুখের গোলযোগের তাড়নায় একেবারেই মনে ছিল না। চিন্তিত হয়ে বলল, 'এই পরিশ্রম আর অনিয়মের পর আজ শেষ রাত্রে না গেলেই কি নয় দাদা ?'

অমরেশ বলল, 'পরিশ্রম আর এমন কি হয়েছে ? তা ছাড়া চার-পাঁচ ঘণ্টা ঘুমিয়ে নিলে শরীরে আর কোনো গ্লানিই থাকবে না।'

'কিন্তু দিন দুই পেছিয়ে দেওয়া যায় না-কি ?'

মাথা নেড়ে অমরেশ বলল, 'না, তা যায় না। শুধু তো আমারই কথা নয় পারুল. চার-পাঁচজন সাধু নিজেদের সব ব্যবস্থা করে ফেলেছেন; তাঁদের অসুবিধা হবে।'

'হৃষীকেশ এখান থেকে কত দূর ?'

'ক্রোশ ছয়েক।'

'কিসে যাবেন ?'

'অবশ্য হেঁটে।'

অমরেশের কথা শুনে পারুল শিউরে উঠল; বলল, 'ছ ক্রোশ পথ হেঁটে যাবেন ? কেন, গাড়ি করুন না; গাড়ি তো যথেষ্ট পাওয়া যায়।'

অমরেশ বলল, 'গাড়ির অভাব নেই, কিন্তু আমাদের কাছে হৃষীকেশ যাবার প্রধানত দুটো আকর্ষণ। প্রথম হচ্ছে সাধু দর্শন, আর দ্বিতীয় পথ চলা। আমার

নিজের কাছে আবার প্রথমটা দ্বিতীয়, আর দ্বিতীয়টা প্রথম কি-না, তা ঠিক বলতে পারি নে।' বলে অমরেশ হাসতে লাগল।

পারুল উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল, 'ফেরবার সময় গাড়িতে আসবেন তো?'

'পারত পক্ষে নয়। বৈকাল পাঁচটায় রওনা হয়ে রাত্রি দশটায় এখানে এসে পৌঁছনো এমন কিছু কঠিন হবে বলে মনে হয় না।'

কিছুক্ষণ পারুল চিন্তিত মনে নীরবে অবস্থান করল, তারপর ভয়ে ভয়ে কুণ্ঠা-জড়িত স্বরে বলল, 'আমার একটা কথা রাখবেন দাদা?'

'কি কথা?'

'আমাকে সঙ্গে নেবেন?'

পারুলের কথা শুনে অমরেশ হেসে ফেলল; বলল, 'তবেই হয়েছে!'

অপ্রতিভ হয়ে পারুল বলল, 'হাঁটতে পারব না বলছেন তো? তা নিশ্চয় পারব না, কিন্তু আমার জন্য একটা গাড়ি নিলেই তো হবে।'

অমরেশ বলল, 'আর মাঝে মাঝে আমাকে তোমার সেই গাড়িতে চড়িয়ে নিলেই তো হবে, কেমন এই মতলব তো?'

'তাতে এমনই কি আপত্তির আছে?'

'তাতে আমার পক্ষ থেকে তেমন কিছু আপত্তির না থাকলেও আর সকলের পক্ষ থেকে অন্য দুটি গুরুতর আপত্তির কথা আছে।'

কৌতূহলাক্রান্ত হয়ে পারুল জিজ্ঞাসা করল, 'কি কথা?'

'প্রথম, আমাদের শাস্ত্রে আছে পথ চলতে হলে স্ত্রীলোককে সঙ্গে নিতে নেই; আর দ্বিতীয়ত, আমার মত অসাধুর কথা ছেড়ে দাও, কিন্তু আর যে সব সাধু আছেন তাঁদের সঙ্গে যেতে হলে তোমার সাধারণ স্ত্রীলোকের মত যাওয়া চলবে না, গেরুয়া বস্ত্র পরে দলভুক্ত হতে হবে! কিন্তু সে-সব ব্যবস্থা করবার পক্ষে সময়ের একান্ত অভাব।' তারপর নিজের ঘরের দিকে যেতে যেতে অমরেশ বলল, 'যাও, যাও শুয়ে পড় গিয়ে, শেষ রাত্রে উঠতে হবে। হয়তো তখন এক কাপ চা-ও করে দিতে হবে।'

অন্যমনস্ক হয়ে কি ভাবতে ভাবতে পারুল বলল, 'এ কিন্তু আমার একটুও ভাল লাগছে না দাদা,—এই ছ ক্রোশ পথ পায়ে হেঁটে যাওয়া আসা—শরীরের ওপর এত অত্যাচার করবেন না।'

পারুলের কথা শুনে অমরেশ হাসতে লাগল; বলল, 'এ সব শরীর অত্যাচারের রোদ-বৃষ্টিতে এমন করে পেকেছে যে, সামান্য অত্যাচারে বিশেষ কিছুই ক্ষতি হয় না। বরং আরামের আওতার মধ্যে ঘুণ ধরবার ভয় আছে।'

কুণ্ঠিত স্বরে পারুল বলল, 'কিন্তু—'

পারুলকে কথা কইবার অবসর না দিয়ে অমরেশ বলল, 'কিন্তু কথায় কথায় আমার বিশ্রামের সময়টা ক্রমশই কমে আসছে,—অতএব আর বিলম্ব না করে শুয়ে পড় গিয়ে।'

এ কথার পর আর কোনো কথা চলে না, অগত্যা পারুল তার নিজের কক্ষে গিয়ে শয্যা গ্রহণ করল।

৭

কয়েক ঘণ্টা পরে অমরেশ যখন হৃষীকেশের অভিমুখে যাত্রা করল তখন রাত্রি সাড়ে তিনটা। একটু বেশি রাত্রি থাকতেই তার সহযাত্রীরা এসে তাকে ঘুম ভাঙিয়ে তুলেছিল।

যাবার সময় অমরেশ পারুলকে বলল, 'লখিয়ামাঈকে না-হয় ডেকে দিয়ে যাই পারুল বাকি রাতটা সে তোমার কাছে এসে থাকুক।'

মাথা নেড়ে পারুল বলল, 'রাতের আর কতটুকুই বা বাকি আছে, তাকে বিরক্ত করবার কোনো দরকার নেই।'

দরকার সত্য সত্যই তেমন কিছু ছিল না;—পথে উষা-স্নানযাত্রীদের চলাচল আরম্ভ হয়েছিল; তা ছাড়া, সামনের বাড়িতে শীতল চৌবের কাশির শব্দ শোনা

যাচ্ছিল। অমরেশ বলল, 'আচ্ছা, তা হলে সাবধানে থেকো, আমি রাত দশটা আন্দাজ ঠিক এসে পৌঁছচ্ছি।'

অমরেশ চলে গেলে সদর-দরজায় ভাল করে অর্গল দিয়ে এসে পারুল তার শয্যা গ্রহণ করল। একটু নিদ্রা দেবার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু কিছুতেই তা হল না। একটা কি রকম অস্বস্তি, কিসের যেন একটা দুশ্চিন্তা মনকে স্থির হতে দেয় না, চঞ্চল করে রাখে। সে চিন্তাব আকার প্রকার, সঙ্গতি কারণ—কিছুই সঠিক নির্ণয় করা যায় না, অথচ মনকে তার আক্রমণ থেকে মুক্ত কবাও যায় না। এক-একটা বেদনা আছে যার অনুভূতি থাকে কিন্তু পরিস্থিতি বোঝা যায় না, হাত দিয়ে স্পর্শ করে দেখলেও তার স্থান নির্ণয় করা শক্ত হয়—এ যেন কতকটা সেই রকম। হয়তো তাব অবচেতন মনে তার একান্ত আশ্রয়হীনতার যে ভীতি যে শঙ্কা লুক্কায়িত আছে, চেতন মনের উপর এ তার অস্পষ্ট ছায়াপাত। কলিকাতা হতে এই সুদূর বিদেশে মাতৃহীন স্বজনহীন বন্ধুহীন হয়ে সে আছে একমাত্র অমবেশের সহৃদয়তা এবং করুণার উপর নির্ভর করে। কিন্তু এর স্থায়িত্ব কোথায়?—এ তো যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়তে পারে। এই তো অমবেশ তাব ইচ্ছার বিরুদ্ধে চলে গেল, সে তো আটকাতে পারল না। এ না হয় কযেক ঘণ্টার জন্য হৃষীকেশের কথা; কিন্তু অদূর ভবিষ্যতে যেদিন সে তাকে চিরদিনের মত ছেড়ে যাবে, সেদিন কি হবে? সেদিন কি আবার সেই গরানহাটার বাড়িতে সে প্রবেশ করবে?—সেই অনাচার-অত্যাচার-ব্যভিচার-কলুষিত পাপ-পুরীব মধ্যে?—সেই মদ-মাংস-চিংড়ি-কাঁকড়ার আঁস্তাকুড়, লম্পট-গুণ্ডা-বাড়িওয়ালীর লীলাক্ষেত্র গাইয়ে বিনিব গৃহে?—এই অমরেশকে পরিত্যাগ করে? এ অমরেশের পবিত্র নির্মল উদার পরিবেশ হতে কক্ষচ্যুত হয়ে।

একটা মর্মন্তুদ ঘৃণা এবং বিরক্তিতে পারুলের সমস্ত দেহ এবং মন কুঞ্চিত হয়ে উঠল।

কি সুন্দর এই অমরেশ! কি অদ্ভুত তার ক্ষমা করবার শক্তি, আর কি

বিস্ময়কর তার ঘৃণা করবার অক্ষমতা! বিপদের মহাদুর্দিনে পরিত্রাতারূপে দেখা দিয়ে পরবর্তী এই কয়েক দিনের অপরূপ আচরণের দ্বারা সে তার পাপসম্পৃক্ত মসীময় বিগত জীবনকে ধুয়ে মুছে তার এমন পরিবর্তন করে দিয়েছে যে, সে জীবনের মধ্যে ফিরে যাওয়া অসম্ভব। কিন্তু অমরেশের কাছে একটা দীর্ঘস্থায়ী পাকা আশ্রয়ও তো ঠিক সেই রকম অসম্ভব। সুদূর প্রবাসে সমাজের বাইরে একান্ত উপায়হীনতার মধ্যে যে আশ্রয় তার সম্ভব হয়েছে, কলিকাতায় অমরেশের গৃহেব ভিতর একদিনেরও জন্য তার সম্ভাবনা নেই। অমরেশের স্ত্রী-পুত্র-কন্যা নেই তা সত্য, কিন্তু সমাজ ও সংসার তো শুধু স্ত্রী পুত্র-কন্যার মধ্যেই নিবদ্ধ নয়। পারুলের মধ্যে স্ত্রীলোকের লতাধর্মী মন আশ্রয়ের লালসায় চতুর্দিকে সঞ্চরমান হযে উঠল।

বাইরে প্রত্যুষের আলোক সুস্পষ্ট হযে উঠেছে। নিদ্রাহীন শয্যা পরিত্যাগ করে পারুল বারান্দায় এসে দাঁড়াল। পথের অপর দিকে সামনের বাড়িতে শীতল চৌবে তুলসীদাসের রামায়ণ থেকে দোঁহা আবৃত্তি করছে—

সুত বিত নারী ভবন পরিবারা,
হোঁহি যাহি জগ বারহি বারা।
অস বিচার জিঅ জাগহুঁ তাতা,
মিলে ন জগমে সহোদর ভ্রাতা॥

ক্ষণেকের জন্য পারুলের মন শীতল চৌবের গভীর-মিষ্ট কণ্ঠস্বরে আকৃষ্ট হল। তারপর ধীবে ধীরে অমরেশের ঘরের তালা খুলে সে কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করল। যাবার সময়ে অমরেশ তাকে চাবি দিয়ে গিয়েছিল।

ঘরের ভিতর প্রবেশ করে পারুল অমরেশেব শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়াল। বিছানাব চাদর কুঞ্চিত; মাথার বালিশ যথাস্থান থেকে বাঁ দিকে একটু সরে গিয়েছে; পাশের বালিশটা একদিকের শয্যা-প্রান্তে ঠেলে দেওয়া; সমস্ত শয্যার উপর সদ্য-ব্যবহারের সুস্পষ্ট চিহ্ন বর্তমান। ক্ষণেকের জন্য মনের

একটা অদ্ভুতম গহ্বরে মলিন লোভ জেগে উঠল,—ইচ্ছা হল, সমস্ত দেহটা অমরেশের ব্যবহারবম্য শয্যার উপর একবার লুণ্ঠিত করে দিতে; কিন্তু নিমেষের মধ্যে মনেরই আর একটা ভৎসনার নিষেধ-বাণী জেগে উঠল—না, না। মনে মনে অপ্রতিভ হয়ে পারুল অমরেশের শয্যার পাদদেশে এসে ভূমিতলে উপবেশন করল, তারপর ধীরে ধীরে শয্যার প্রান্তদেশে তিনবার মাথা ঠেকিয়ে উঠে দাঁড়াল। ঘর থেকে বেরিয়ে যখন এল তখন লখিয়ামাঈ সদর-দরজায় কড়া নাড়ছে।

বাসন মেজে, চৌকা লেপন করে লখিয়ামাঈ উনানে আগুন দিতে উদ্যত হল। পারুল বলল, 'লখিয়ামাঈ, এ বেলা আর উনানে আগুন দিয়ো না।'

সকৌতূহলে লখিয়ামাঈ জিজ্ঞাসা করল, 'কেন মা-জী ?'

'বাবু গেছেন হৃষীকেশ, ও-বেলা আসবেন। একা আমার জন্যে আর বেঁধে কি হবে, কিছু চিঁড়ে আর দই এনে দিয়ো। চিনি বাড়িতেই আছে।'

বিস্মিতকণ্ঠে লখিয়ামাঈ বলল, 'বাবুজী হৃষিকেশ গেছেন বলে তুমি বাঁধবে না মা-জী ? আর চা ? চা খাবে না ?'

'একটু কাগজ-টাগজ জ্বালিয়ে চায়ের জল করে নেব অখন।'

লখিয়ামাঈয়ের মুখে কৌতুকের মৃদু হাস্য ফুটে উঠল; বলল, 'বাবুজী হৃষিকেশ গেছেন বলে মা-জীর মন উদাস হয়ে গেছে! ভুক পিয়াসও নেই।' তারপর একটা কি ছড়া আবৃত্তি করে উচ্চৈঃস্বরে হাসতে লাগল।

পারুলের মুখ ঈষৎ আরক্ত হয়ে উঠল, অধরপ্রান্তে মৃদু হাস্যের একটু আভাসও দেখা দিল। ছড়ার মর্ম সে একটুও বুঝতে পারল না, কিন্তু এ কথা সে নিঃসংশয়ে বুঝল যে, অমরেশের সঙ্গে তার সম্পর্কের ঠিক প্রকৃতি যদি লখিয়ামাঈয়ের জানা থাকত তা হলে ও-ছড়া আবৃত্তি করা কিছুতেই চলত না।

আলস্যে অনুৎসাহে শুয়ে বসে পারুলের সমস্ত দিনটা কোনো রকমে কেটে গেল। পড়বার জন্য অমরেশ খান দুই বই দিয়েছিল, সেগুলো নিয়ে

কিছুক্ষণ নাড়াচাড়া করে ভাল লাগে নি। সন্ধ্যা হতেই রান্না চড়িয়ে দিয়ে কর্মের মধ্যে প্রবেশ করে সে অনেকটা আরাম বোধ করল।

রাত্রি সাড়ে নয়টার সময়ে সদর-দরজায় কড়া নাড়ার শব্দ পাওয়া গেল, তখন তার রন্ধন-কার্য শেষ হয়েছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজা খুলে দিল।

গৃহমধ্যে প্রবেশ করে অমরেশ বলল, 'কি পারুল, ভয়-টয় করেছিল না-কি কিছু ?'

পারুল বলল, 'না, করে নি।'

'খবর সব ভাল তো ?'

'ভাল।'

'তবে গলার স্বর ও-রকম গম্ভীর কেন ?'

মৃদু হেসে পারুল বলল, 'না, ও কিছু নয়। আসবার সময়েও হেঁটে এলেন তো দাদা !'

'তা এলাম বৈকি।'

'খুব কষ্ট হয়েছে ?'

পাতলের কথা শুনে অমরেশ হেসে ফেলল ; বলল, 'কিছু যে হয় নি তা বলতে পারি নে, কিন্তু 'খুব' বলতে তুমি যা মনে করেছ তেমন কিছু হয় নি।'

'তা হলেই বোঝা গেছে।' বলে পারুল জিজ্ঞাসা করল, 'চায়ের জল চড়িয়ে দেবো দাদা ?'

অমরেশ বলল, 'তা দিয়ো, কিন্তু তার আগে যদি একটা বালতি করে খানিকটা অল্প গরম জল দাও তো মন্দ হয় না।'

আগ্রহভরে পারুল জিজ্ঞাসা করল, 'কি করবেন ?'

'পা দুটো খানিকক্ষণ ডুবিয়ে রাখলে একটু আরাম পাওয়া যাবে, অথচ বেদনাও হবে না।'

ব্যস্ত হয়ে পারুল বলল, 'গরম জল খানিকটা করাই আছে, আমি এখনি ঠিক করে দিচ্ছি।' বলে তাড়াতাড়ি প্রস্থান করল।

আহারাদি সমাপন করে অমরেশ ও পারুল যখন নিজ নিজ ঘরে শয়ন করতে গেল তখন প্রায় এগারোটা বাজে। শয্যা গ্রহণ করবামাত্র অমরেশের পথশ্রমক্লান্ত অবশ দেহ গভীর নিদ্রায় অভিভূত হ'য়ে পড়ল। কিন্তু সেই গাঢ় নিদ্রার মধ্যেই এক সময়ে অনির্ণেয় কারণে হঠাৎ তার ঘুম ভেঙ্গে গেল। সঠিক কিছু বুঝ্‌তে পারল না। মনে হল, ঘরের ভিতরটা যেন আরও বেশি অন্ধকার হয়ে গেছে, সম্মুখদ্বারে জ্যোৎস্না ছিল, হয়তো চন্দ্র অস্তমিত হওয়ার জন্যই হয়ে থাকবে মনে করে, সে পাশ ফিরে শুল। নিদ্রা আসতে বিলম্ব হল না, কিন্তু এবার নিদ্রা গাঢ় হবার পূর্বেই স্পষ্টভাবে একটা স্পর্শ অনুভব করে আচম্বিতে শয্যার উপর উঠে বসল। সম্মুখে একটা অস্পষ্ট মনুষ্যমূর্তি দেখে হাত বাড়াতেই একখানা চুড়ি-বালা সমেত হাত মুঠোর মধ্যে ধরা পড়ল।

গভীর কণ্ঠে অমরেশ বলল, 'এ কি? পারুল না কি?'

অমরেশের হাত থেকে নিজের হাত মুক্ত করে নেবার কোনো চেষ্টা না করে মৃদু স্বরে পারুল বলল, 'হ্যাঁ।'

'তুমি এ সময়ে এখানে কেন?'

অমরেশের যথার্থ প্রশ্নের কোনো উত্তর না দিয়ে পারুল বলল, 'আমি চলে যাচ্ছি দাদা, আপনি ঘুমোন।'

ধীরে ধীরে পারুলের হাত ছেড়ে দিয়ে অমরেশ বলল, 'আচ্ছা, আমি ঘুমব অখন, কিন্তু তুমি একটু বসো।' তারপর বালিশের তলা থেকে দেশলাই বার করে পাশের টিপয়ে রাখা ল্যাম্পটা জ্বেলে দেখল, পারুল উঠে দাঁড়িয়েছে, হাতে তার কিসের একটা বাটি।

'ওটা কি ব্যাপার দেখি।' বলে সকৌতূহলে হস্ত প্রসারিত করে বাটিটা হাতে নিয়ে দেখে বলল, 'এ যে গরম সরষের তেল!' তারপর নিজের

পদদ্বয় লক্ষ্য করে বলল, 'দুটি পায়ে বেশ করে লাগিয়েও দিয়েছ দেখছি! সেবার পক্ষে এ অবশ্য খুবই ভাল ব্যবস্থা করেছিলে, কিন্তু তবুও ভাল কর নি পারুল। এত রাত্রে এমন করে আমার ঘরে তোমার আসা ভাল হয় নি।'

বাষ্পাবরুদ্ধ কণ্ঠে আর্তস্বরে পারুল বলল, আমাকে ক্ষমা করুন দাদা।'

অমরেশ বলল, 'ক্ষমার কথা নয়, পারুল। ক্ষমা করার চেয়ে ধন্যবাদ দেবার কথা হয়তো এতে অনেক বেশি। কিন্তু এ কথাও ভুললে চলবে না যে, প্রত্যেক পুরুষের সঙ্গে প্রত্যেক স্ত্রীলোকের সম্পর্কের হিসাবে যে বিশেষ আচরণের ব্যবস্থা আছে তা বজায় রেখেই চলতে হবে। আশা করি, এ কথা তুমি ভবিষ্যতে কখনো ভুলবে না।'

'কিন্তু আমার ভবিষ্যৎ যে কি তা তো জানি নে দাদা! আপনি তো আমার আশ্রয় বেশ ভাল করেই ভেঙে দিয়েছেন।' বলে সহসা পারুল দু হাত দিয়ে মুখ ঢেকে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে লাগল।

কাছেই একটা টুল ছিল, সেটা পারুলের দিকে এগিয়ে দিয়ে অমরেশ বলল, 'উত্তেজিত হয়ো না, পারুল স্থির হয়ে বসো।' তারপর উপবেশন করলে বলল, 'আশ্রম ভেঙে দেওয়ার মানে ঠিক বুঝতে পারছি না। তুমি কি স্থির করেছ যে, গরানহাটার বাড়িতে আর ফিরে যাবে না?'

দুই হাতের ভিতর মুখ লুকিয়ে পারুল তখনো ফুলে ফুলে কাঁদছিল; বলল, মরে গেলেও না।'

অমরেশ বলল, 'তা, এ তো ভাল কথা; এর জন্যে কান্নাকাটির কি দরকার আছে? তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমোও গে, তোমার গরানহাটার চেয়ে ভাল জায়গা খুব দুষ্প্রাপ্য হবে না। আর-কিছু যদি না-ই হয়, গড়ের মাঠের গাছতলা তো কেউ কেড়ে নিচ্ছে না।' বলে সে হাসতে লাগল। তারপর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বলল, 'এ বিষয়ে কথাবার্তা পরে হবে অখন, এখন তুমি লক্ষ্মীমেয়ের মত শুয়ে পড়োগে। তোমার তেমন দরকার না থাকলেও, আমার একটু ঘুমের দরকার হয়তো আছে।'

পারুল উঠে ধীরে ধীরে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল, তারপর সমস্ত রাতটা বিছানায় পড়ে কেঁদে কেঁদে কাটাল। সে কান্নার কতখানি নৈরাশ্যের, আর কতখানি আশ্বাসের, মনোগণিতের সে একটু কঠিন অঙ্ক।

সকালে উঠে মুখ-হাত পা ধুয়ে পারুলের কাছে উপস্থিত হয়ে অমরেশ বলল, 'চায়ের কত বিলম্ব পারুল-প্রভা?'

চায়ের ব্যবস্থা প্রায় শেষ হয়ে এসেছিল। পিছন-ফেরা অবস্থাতেই পারুল বলল, 'পারুল-প্রভা নয় দাদা, পারুল।'

অমরেশ বলল, 'না না, পারুল-প্রভাই। আজকের না হলেও ভবিষ্যতে নিশ্চয়ই। তা নইলে আর গাছতলা দেখাতে সাহস করি!' বলে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল।

চায়ের কাপ হাতে করে উঠে দাঁড়িয়ে পারুল বলল, 'চলুন, ঘরে দিয়ে আসি।'

সেইদিন বৈকালে অসীমানন্দ স্বামীর সহিত একান্তে দেখা হতে অমরেশ বলল, 'পারুলকে নিয়ে একটা কঠিন সমস্যা উপস্থিত হয়েছে প্রভু।'

অসীমানন্দ বললেন, 'তোমার সমস্যা তো সমাধানের হাত ধরে উপস্থিত হয়, তবে ভাবনা কেন?'

সহাস্যমুখে অমরেশ বলল, 'এবারকার সমস্যাটা ঠিক সে রকম নয়, সত্যই কঠিন। পারুল আর তার গরাণহাটার বাড়ির গত জীবনে ফিরে যেতে চায় না।'

অসীমানন্দ বললেন, 'তোমার আশ্রয় যখন সে পেয়েছে তখন তো চাইবেই না। তুমি তার ভবিষ্যৎ জীবনের একটা ব্যবস্থা করে দাও।'

অমরেশ বলল, 'আমি কেমন করে দেবো প্রভু? সে স্ত্রীলোক, আর আমি অবিবাহিত পুরুষ—আমার শক্তিই বা কি এমন, আর সুযোগই বা কোথায়?'

অসীমানন্দ বললেন, তোমার শক্তি যথেষ্ট, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নেই;

আর শক্তি থাকলে সুযোগের প্রযোজন হয না। শোন অমরেশ, পারুল তোমার জীবনের সমস্যা নয়, সে তোমার জীবনের সুযোগ। তুমি তাকে অনেক উপরে তুলে দেবে, আর তাকে অবলম্বন করে তুমি নিজেও অনেক উপরে উঠে যাবে। এ তুমি দেখে নিযো।'

হাসতে হাসতে অসীমানন্দের পদধূলি গ্রহণ করে অমরেশ বলল, আশীর্বাদ করুন তাই যেন হয়। কিন্তু আমার প্রতি আপনার এ বিশ্বাসেব মূল অহেতুক স্নেহ ভিন্ন আব কিছুই নয় প্রভু।'

এ কথার কোন উত্তর না দিযে অসীমানন্দও হাসতে লাগলেন।

৮

বালিগঞ্জেব একটি সুবৃহৎ অট্টালিকাব একাংশে 'কমলা ক্লাব' নামে মেযেদেব একটি ক্লাব আছে। প্রতি পক্ষান্তব শনিবাবের সন্ধ্যাকালে এই প্রতিষ্ঠানেন একটি করে সাধারণ অধিবেশন হয। অধিবেশনে যথারীতি সঙ্গীত, কবিতা-আবৃত্তি, প্রবন্ধ-পাঠ ও আলোচনাদিব ব্যবস্থা তো থাকেই; অধিকন্তু, সুযোগ সুবিধা উপস্থিত হলেই পরম আগ্রহ এবং উদ্দীপনার সহিত দুর্বৃত্ত পুরুষ-জাতিব মুণ্ডপাতের ব্যবস্থা হতেও ভুল হয না। পুরুষদের প্রতি মেয়েদেব ভারি আক্রোশ। স্মবণাতীত কাল হতে পুরুষেরা স্ত্রীজাতির উপর যে আধিপত্য বিস্তার করে এসেছে তাব মূলে ন্যায সঙ্গত কোনো কারণ নেই, সুতরাং এই আধিপত্য একশ্রেণীর মানুষেব মৌলিক অধিকারের উপর অপর এক শ্রেণীব মানুষের পশুশক্তির আধিপত্য, অএতব সর্বথা রোধনীয।

প্রধানত কলেজের ছাত্রী, শিক্ষযিত্রী এবং মহিলা-প্রফেসার নিয়েই এই

ক্লাবটি গঠিত; তা ছাড়া সদস্যদের মধ্যে ছাত্রীদের অভিভাবিকা এবং অন্যান্য বয়স্কা স্ত্রীলোকেরাও আছেন। পুরুষদের পক্ষে অবশ্য এ ক্লাবের সদস্য হওয়ার বিষয়ে স্পষ্ট নিষেধ আছে, যদিও মাসিক, বাৎসরিক অথবা এককালীন চাঁদা দেওয়ার পক্ষে তাদের বিরুদ্ধে কোনো নিষেধ নেই;—এমন কি, কোনো আত্মীয়াদির মধ্যবর্তিতায় যে ব্যক্তির এ ক্লাবের সহিত কোনো প্রকার যোগ আবিষ্কার করা দুঃসাধ্য, তার পক্ষেও নেই। দুরন্ত পুরুষজাতির প্রতি কমলা ক্লাবের পরিচালিকাগণের এবম্প্রকার মনোভাব ঔদার্যের প্রমাণ বলেই স্বীকার করতে হবে।

পুরুষদের পক্ষে এ ক্লাবের সদস্য হওয়া নিষিদ্ধ হলেও সকল ক্ষেত্রে এবং সকল সময়েই তাদের প্রবেশ নিষিদ্ধ নয়। বিখ্যাত সাহিত্যিক ও পণ্ডিত-বর্গকে মাঝে মাঝে নিমন্ত্রিত করে এনে বক্তৃতাদি দেওয়ানো হয়। এই হিসাবে, সকলের চেয়ে ঘন ঘন ডাক পড়ে অমরেশের। ক্লাবের সূত্রপাত এবং গঠনকাল থেকেই এর সঙ্গে তার যোগ। যোগটা শুধু ব্যবহারিক নয়, অর্থঘটিতও বটে। সাময়িক এবং নিয়মিত অর্থসাহায্যের দ্বারা সে নিজে ক্লাবের তহবিলের অনেকটা অভাব তো পূর্ণ করেই, তা ছাড়া আরও পাঁচ জায়গা থেকে মাঝে মাঝে যে-সকল অর্থ সংগ্রহ করে দেয় তার পরিমাণও নিতান্ত অল্প নয়। এজন্য ক্লাবের পরিচালিকাগণের অমরেশের প্রতি শ্রদ্ধা এবং কৃতজ্ঞতার অন্ত নেই, এবং কাগজে-কলমে না হলেও, বচনে-ব্যবহারে তাঁরা তার সহিত একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষকের মতই ব্যবহার করেন। ক্লাবের সকল অধিবেশনেই উপস্থিত হবার জন্য তার চিরন্তন নিমন্ত্রণ আছে, কিন্তু পত্রের দ্বারা প্রত্যেকবার স্বতন্ত্র ভাবে নিমন্ত্রিত না হলে অমরেশ কখনো ক্লাবে যায় না।

বছর দুই পূর্বে অমরেশই বাসনাকে এই কমলা ক্লাবের সদস্যশ্রেণীভুক্ত করে দেয়। শিক্ষক ও ছাত্রী সম্পর্কে সেই সময় হতেই উভয়ের পরিচয়। এখন বাসনা কমলা ক্লাবের একজন নামজাদা সদস্য; ছাত্রীদের কথা তো

স্বতন্ত্র, তার সহিত বাদানুবাদ কালে যুক্তি এবং তর্কের শরাঘাতে লেডি-প্রোফেসারদেরও অস্থির হয়ে উঠতে হয়।

রাত্রি সাড়ে নয়টা। এই মাত্র ক্লাবের অধিবেশন শেষ হয়েছে। এত রাত্রি প্রায় কোনোদিনই হয় না, কিন্তু আজ আলোচনার বিষয়বস্তুটা একটু কৌতূহলোদ্দীপক ছিল এবং আলোচনাকারিণীদের সংখ্যাও অল্প ছিল না বলে সভা ভঙ্গ হতে বিলম্ব হয়েছে। সভানেত্রী কর্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে বাসনা আলোচনা-চক্রে যোগ দিতে বাধ্য হয়েছিল, কিন্তু আজ সে দু-চার কথাতেই তার বক্তব্য শেষ করেছে। আজ তার মনের অবস্থা ঠিক স্বচ্ছন্দ নয়। একটা অনির্ণীত গ্লানির ম্লানতায় মন তার মেঘাচ্ছন্ন বর্ষা-মধ্যাহ্নের মত অনুজ্জ্বল হয়ে আছে। কিন্তু, কেন?—এই প্রশ্ন সে নিজের প্রতি দিনের মধ্যে বহুবার প্রযুক্ত করেছে, অথচ একবারও সন্তোষজনক উত্তর পায় নি।

আজ হয়তো সে ক্লাবের অধিবেশনে না আসতেও পারত, কিন্তু আসবার কারণ হল, আজ সকালে হরিদ্বার থেকে পাওয়া অমরেশের লেখা একখানা চিঠি। অমরেশ লিখেছে, অনতিবিলম্বেই সে কলিকাতায় ফিরছে, কিন্তু একা নয়, সঙ্গে নিয়ে অচিন্তিত এবং অনিবার্য ভাবে পাওয়া পারুল নামে বিশ-বাইশ বছরের একটি মেয়ে, যার পাওয়ার কাহিনী মৌখিক সবিস্তারে সে জ্ঞাপন করবে।

কে সেই মেয়ে, যাকে অকস্মাৎ পাওয়া গেল, এবং পাওয়াটা কিছুতেই নিবারণ করতে পারা গেল না—সমস্ত দিন ভেবে-ভেবেও বাসনা তা ঠিক করতে পারে নি। এতই কার গলগ্রহ হয়েছিল রে বাপু সে মেয়েটা যে, তাকে পেতে অমরেশকে একান্তভাবে বাধ্য হতে হল! আর পাওয়াটাই বা কি রকম পাওয়া তাও তো' ঠিক বোঝা যাচ্ছে না! মন্ত্রপাঠ করে পাওয়া? —না, বিনা মন্ত্রেই এমনি আলগা আল্‌টপ্‌কা পাওয়া? আর, মন্ত্র করেই যদি হয়, তা হলেই কি কম লজ্জার কথা? বয়স তো আর সত্যি-সত্যিই নিতান্ত কম হয় নি; দেখায় না বলে প্রৌঢ় যে নয়, তা তো আর বলা

চলে না। এতদিনকার লম্বা-চাওড়া বচন-বাচন সবই তা হলে একেবারে ফাঁকা আওয়াজ! রবীন্দ্রনাথ যে বলেছেন, 'প্রেমের ফাঁদ পাতা ভুবনে, কে কোথা ধরা পড়ে কে জানে!' সে কথা তা হলে মিথ্যে নয়! তা নইলে এতটা কাল এই বিরাট কলকাতা শহরে বাস করে অবশেষে কি-না মাস খানেকের জন্য হরিদ্বারে গিয়ে 'প্রেমের ফাঁদ জুটল? কিন্তু তাও বলি, এই কি প্রেম?—দিন কয়েকের জন্যে একটা মেলায় গিয়ে ফাঁদে পড়া, এ তো দুর্বলতার পরিচয়! এ তো মায়া, মোহ, মূঢ়তা! এর পর আর এই দুই বৎসর ধরে দিনে দিনে গড়ে-ওঠা শ্রদ্ধা-ভক্তি থাকে কি?

কিন্তু এ কথাও স্বীকার করা যায় না যে, গত দু বৎসর পরে ক্রমান্বয়ে অমরেশের যে পরিচয় পাওয়া গেছে তার সঙ্গে এ দোষারোপের সামঞ্জস্য করা কঠিন। স্ত্রীলোকের কাছে সে যে দুর্বল নয়,—সে যে দৃঢ়, শক্তিমান, চরিত্রবান,—তার প্রমাণ সে তো একাধিক বার দিয়েছে। সে ছিল অমরেশের অব্যবহিত আগেকার প্রাইভেট টিউটার। একটু সুযোগ সুবিধে হয়েছে কি, অমনি প্রসঙ্গ গেল বদলে, কণ্ঠস্বর হল গাঢ়, চোখ হয়ে উঠল ছলছলে, অবশেষে প্রেম-নিবেদন বর্ষিত হয় আর কি। উঃ, কি বিশ্রী লাগে এই মেয়ে-আঁকড়া মেরুদণ্ডহীন পুরুষগুলোকে! আর অমরেশ? হ্যাঁ, একটা পুরুষের মত পুরুষ বটে, স্ত্রীলোকের যা-কিছু জারিজুরি, জাদু-মন্ত্র সমস্ত জব্দ তার কাছে। তা সে সজনেই বল আর নির্জনেই বল, দিনমানেই বল আর গভীর রাত্রেই বল, সব সময়ে সর্বত্র এক কথা, এক কণ্ঠস্বর, এক চাহনি। সেবারকার সেই ট্রেন ফেল করে একসঙ্গে রাত্রি-যাপনের ব্যাপারটা যদি অমরেশের সঙ্গে না হয়ে আগেকার প্রোফেসার বৃন্দাবনের সঙ্গে হত তা হলেই হয়েছিল আর কি! সারা রাত ধরে চলত একটা প্যানপেনে ঘ্যানঘেনে নাকি সুরের গা বমি বমি করা কাঁদুনির পালা! আর অমরেশের সঙ্গে হল কি চমৎকারই না ব্যাপার! প্ল্যাটফর্মের উপর দুখানা ঈজি-চেয়ার পাশাপাশি রেখে সমস্ত রাত্রি তার উপর নিরুপদ্রবে নিদ্রা দেওয়া, তারপর সকালে উঠে মুখ-হাত

ধুয়ে রিফ্রেশমেণ্ট-রুমে এক কাপ করে গরম চা খেয়ে তাজা মন নিয়ে সওয়া ছটার ট্রেনে বাড়ি ফিরে আসা। সেই জন্যই তো বৃন্দাবনকে ছাড়িয়ে অমরেশকে রাখা হল। যদি বল, অমরেশের একটু বয়স হয়েছে, সুতরাং তার পক্ষে—কিন্তু পুরুষমানুষের পক্ষে ও-বয়স আর এমনই কি বয়স? এই তো কয়েকদিন আগে একটা বইয়ে দেখা গেল, বৈদ্যশাস্ত্রের মতে পঞ্চাশ বৎসর পর্যন্ত যৌবন কাল আর স্মৃতিশাস্ত্র-মতে সত্তর বৎসর পর্যন্ত। সুতরাং বয়সের কৈফিয়ৎ দিয়ে অমরেশের সংযমের মূল্যকে তো ঠিক কমানো যায় না। অতএব পারুলকাহিনীর সব কথা না জেনে অমরেশের প্রতি দোষারোপ সমীচীন নয়।

হঠাৎ মনে পড়ল পূরবীর কথা। সে আজ কমলা-ক্লাবের অধিবেশনে নিশ্চয় আসবে। পূরবী অমরেশের সহোদরা ভগ্নী, বাসনার সহিত এক কলেজে ফার্স্ট ইয়ার ক্লাসের ছাত্রী। অমরেশ নিশ্চয় বাড়িতেও চিঠি লিখেছে, এবং সম্ভবত সেই চিঠিতে পারুলের কথা একটু বিস্তারিত ভাবেই পাওয়া যেতে পারে।

কিন্তু নাই যদি পাওয়া যায় তাতেই বা এমন কি আসে যায়? নয়-হয় অমরেশ পারুলকে বিয়ে করতে বাধ্য হয়েছে,—না-হয় বিয়ে-টিয়ে কিছু নয়, সম্পূর্ণ অন্য কোন ব্যাপার। দুদিন পরে তো সবই জানতে পারা যাবে তবে এর রহস্য ভেদ করবার জন্য এত মাথা ব্যথা কেন?

কিন্তু মাথা ব্যথার কোন কারণই যদি না থাকবে তবে মাথা ব্যথা করবেই বা কেন? ব্যাপারটা তো আর যে-সে লোককে নিয়ে নয়, দস্তুরমত অমরেশের মত একজন সংসার-সন্ন্যাসী নিরীশ্বরবাদী দার্শনিককে নিয়ে। সুতরাং এ বিষয়ে সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে কিছুকাল নিরুদ্বেগে দিন যাপন করা সহজ কথা না হতেও পারে।

তাড়াতাড়ি সাজ-সজ্জা করে গাড়ি নিয়ে বাসনা যখন কমলা-ক্লাবে উপস্থিত হল তখন অধিবেশন আরম্ভ হয়ে গিয়েছে। সুতরাং অধিবেশন শেষ হওয়

পর্যন্ত ঔৎসুক্যকে দমন করতেই হল। অধিবেশনান্তে পূরবীর নিকট সে উপস্থিত হয়ে বলল, 'পূরবী, তোমাদের বাড়ির খবর কি? মাসিমা কেমন আছেন?'

হাসিমুখে পূরবী বলল, 'মা ভাল আছেন বাসনাদি। তোমাদের বাড়ির খবর কি? মেসোমশাই মাসিমা ভাল আছেন তো?'

বাসনা বলল, 'হ্যাঁ, ভাল আছেন। মা বলছিলেন, তুমি অনেক দিন আমাদের বাড়ি যাও নি।'

পূরবী বলল, 'সত্যিই অনেক দিন যাই নি। দাদা এলে শীগগিরই একদিন যাব।' তারপর আসল প্রসঙ্গটা সেই উত্থাপন করল, বলল, 'আজ দাদার একটা চিঠি এসেছে বাসনাদি। শীগগিরই দাদা আসছেন।'

বাসনা বলল, 'হ্যাঁ, আমিও আজ একটা চিঠি পেয়েছি। সুসংবাদ আছে।'

সকৌতূহলে পূরবী জিজ্ঞাসা করল, 'সুসংবাদ? কি সুসংবাদ?'

বাসনা বলল, 'আসছেন,—কিন্তু একা নয়। পারুল নামে তোমার একটি বউদিদিকে সঙ্গে করে আসছেন।'

বাসনার কথা শুনে পূরবী হেসে ফেলল, বলল, 'তবেই হয়েছে! তুমি বুঝি তাই বুঝেছ? কত সাধ-সাধনা করে দাদাকে বিয়ে করতে রাজি করা যায় নি, আর দাদা নিজে থেকে বিয়ে করে আসবেন?'

বাসনা বলল, 'তাই তো হয় পূরবী। একটা কথা আছে জান তো? 'সাধলে বউ খায় না, তারপর বউ পায় না।' কিন্তু যে সব বউ খুব বেশি বোকা নয়, তারা যখন দেখে যে সাধাসাধি একেবারে বন্ধ হয়ে গেছে, তখন গভীর রাত্রে খাবার ঘরের তালা খুলে নিজে থেকে চুরি করে খায়।'

স্মিতমুখে পূরবী বলল, 'আমার দাদা কিন্তু সে জাতের 'বউ' নয়। তা ছাড়া এ মেয়েটির সঙ্গে বিয়ে কেমন করে হবে? এ তো ঠিক ভদ্রঘরের মেয়ে নয়।'

সবিস্ময়ে বাসনা বলল, 'ভদ্রঘরের মেয়ে নয়? তবে কি রকম ঘরের মেয়ে?'

সব কথাটা বলে ফেলা হয়তো সমীচীন হচ্ছে না মনে করে পূরবী নিজেকে সামলে নিল; বলল, 'সে সব কথা দাদা এলে তাঁকে জিজ্ঞাসা করো বাসনাদি, তিনি তোমাকে নিশ্চয় সমস্ত কথা বলবেন।'

বাসনা বলল, 'আচ্ছা, তাই জিজ্ঞাসা করব, কিন্তু এ মেয়েটি কলকাতায় এসে কোথায় থাকবে? তোমাদের বাড়ি?'

পূরবী বলল, 'সেই তো হয়েছে বিপদের কথা। মা অবিশ্যি যথেষ্ট উদার মতের লোক, কিন্তু সমাজের নিয়মকানুনও তো মেনে চলতে হবে। অথচ দাদা যখন ভেবেচিন্তে একটা কাজ করেন তখন এমন একটা দৃঢ় সঙ্কল্প নিয়ে করেন যে, তা থেকে তাঁকে টলানো ভারি কঠিন হয়ে ওঠে।'

সহাস্য কিন্তু আরক্ত মুখে বাসনা বলল, 'তোমার দাদা পৈতে পুড়িয়ে ভগবান হয়েছেন, তাই মাসিমাকেও তিনি এগিয়ে দিতে চান।'

এ কথার পূরবী কোনো উত্তর দিল না; তা ছাড়া তার মুখ-চোখের ভাব থেকে মনে হল, এইখানেই সে এ প্রসঙ্গের শেষ করতে চায়।

সেটা উপলব্ধি করে বাসনা বলল, 'তোমাকে নামিয়ে দিয়ে যাব পূরবী?'

পূরবী বলল, 'আমি রাণুদির গাড়িতে এসেছিলাম। তা চল, তোমার সঙ্গেই না-হয় যাই। রাণুদি আবার পথে কোথায় দু-চার মিনিট দেরি করবে বলছিল। তুমি একটু দাঁড়াও, আমি রাণুদিকে বলে আসছি। বলে সে প্রস্থান করল।

অনতিবিলম্বে ফিরে এসে পূরবী বাসনার সঙ্গে তার মোটরে গিয়ে উঠল।

৯

বৈশাখ মাসের মাঝামাঝি। অপরাহ্ণে আশ্রমের সম্মুখে আমলকীগাছের তলায় উপবেশন করে স্বামী অসীমানন্দ শিষ্যগণের সহিত শাস্ত্রপ্রসঙ্গ করছিলেন, এমন সময়ে অমরেশ এবং পারুল তথায় উপস্থিত হল। অসীমানন্দ সাদরে উভয়কে আহ্বান করলেন, 'এস মা, এস,—এস অমরেশ এস।' তারপর পারুল ও অমরেশ তাঁর পদধূলি গ্রহণ করে ভূমিতলে বসে পড়লে বললেন, 'কি সংবাদ বল তো অমরেশ? মনে মনে কোন দুরভিসন্ধি নিয়ে আস নি তো?'

সহাস্যমুখে অমরেশ বলল, 'হরিদ্বার থেকে হাওড়া যখন হাজার মাইলেরও বেশি দূর, তখন দুরভিসন্ধি না আনলেও দূরের অভিসন্ধি নিয়ে এসেছি সে বিষয়ে সন্দেহ নেই। আজ আমরা কলকাতা যাচ্ছি, তাই বিদায় নিতে এসেছি মহারাজ।'

মনে মনে অসীমানন্দ এই কথাটাই আশঙ্কা করছিলেন। তথাপি স্পষ্ট ভাবে শুনে তার মুখমণ্ডলে বিষাদের ক্ষীণ ছায়া দেখা দিল, বললেন, 'কিন্তু ভিড়টা আর একটু কমলে ভাল হত না অমরেশ?'

করজোড়ে অমরেশ বলল, 'না প্রভু, এ ভিড় তো সহজে কমবার নয়,—এ আপনাদের হরিদ্বারের সনাতন ভিড়। আর অপেক্ষা করতে গেলে অত্যন্ত বিলম্ব হয়ে যাবে। তা ছাড়া অবিলম্বে ফিরে যাবার জন্য বাসনা যে-রকম তাড়া দিয়ে চিঠি লিখেছে, শীগগির না ফিরলে সে বিষম রেগে থাকবে। আমিও তাকে উত্তর দিয়ে দিয়েছি যে, দু তিন দিনের মধ্যে আমরা রওনা হচ্ছি।'

অসীমানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, 'বাসনা কে ?—তোমার বোন ?'

'আজ্ঞে না, আমার বোন পূরবী। বাসনা হচ্ছে সেই থার্ড ইয়ার ক্লাসের মেয়েটি, যার একখানা চিঠি মাসখানেক আগে আপনাকে দেখিয়েছিলুম।'

এ কথায় অসীমানন্দর স্মরণ হল, বললেন, মনে পড়েছে, যে মেয়েটিকে তুমি পড়াও। মেয়েটি যে প্রখর বুদ্ধিশালিনী, তা তার একখানি চিঠি পড়েই বুঝতে পেরেছিলাম।

মনোমত ছাত্রীর প্রশংসায় অমরেশের মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠল, বলল, সে কথা সত্যি। বাসনা যে প্রখর বুদ্ধিশালিনী তা বুঝতে পারি, মাঝে মাঝে যখন আমার বিদ্যের সঙ্গে তার বুদ্ধির গজকচ্ছপের যুদ্ধ হয়। কতবার যে যে তার বুদ্ধির কাছে আমার বিদ্যাকে বিপন্ন পড়তে হয়েছে, তা বলতে পারি নে মহারাজ।'

অমরেশের কথা শুনে অসীমানন্দর শিষ্যগণ হাসতে লাগলেন। অসীমানন্দ কিন্তু এ কথার প্রতিবাদ করে বললেন, 'এ আমি স্বীকার করি নে অমরেশ—এ তুমি তোমার ছাত্রীর প্রতি স্নেহাধিক্যবশত বলছ। বুদ্ধির সাহায্যে তোমার বিদ্যাকে বিপন্ন করতে পারে এত বড় বুদ্ধিমতী মেয়ে সমস্ত বাংলা দেশে একটিও বর্তমান নেই—এ কথা তোমার বাসনাকে না দেখে বলতে পারি।

স্মিতমুখে অমরেশ বলল, 'এ কথা বললে কিন্তু বাসনার প্রতি অবিচার করা হবে মহারাজ।'

মৃদু হাস্য করে অসীমানন্দ বললেন, 'প্রমাণের রাজ্যে হয়তো হবে, অনুমানের রাজ্যে হবে না।

অসীমানন্দর কথা শুনে অমরেশ হো হো করে হেসে উঠল, বলল, 'আবার সেই প্রত্যক্ষ ও অনুমানের তর্ক এসে পড়ছে মহারাজ। তিন মাস আগে প্রথম যখন হরিদ্বারে আসি তখন সে তর্কের আরম্ভ, আজ বিদায়ের দিনেও সে মাথা চাড়া দিয়ে উঠেছে।

অসীমানন্দ বললেন, 'এ থেকে এই প্রমাণ হল যে, প্রত্যক্ষ এবং অনুমান দুইটি অবিনশ্বর গুণ্ডা যারা মানুষের চিন্তাক্ষেত্রে চিরকাল মল্লযুদ্ধ চালাবে।'

একটা সমবেত হাস্যধ্বনি উত্থিত হল।

অমরেশ বলল, 'আমরা কিন্তু আশা করে রইলাম সেই শুভদিনের জন্য, যেদিন এই দুটি গুণ্ডা তাদের যথার্থ পরিচয় পাওয়ার পর গুণ্ডাবৃত্তি পরিত্যাগ করে কুলিবৃত্তি অবলম্বন করবে আর মানুষের চিন্তাক্ষেত্রের সমস্ত সত্যকে দুজনে মিলে নির্বিবাদে বহন করে বেড়াবে।'

অসীমানন্দ বললেন, 'তোমার চিন্তাক্ষেত্রে কিন্তু সে দুটি গুণ্ডা ইতিমধ্যেই কুলিবৃত্তি অবলম্বন করেছে। তোমার বুদ্ধির যে দিকটা তীক্ষ্ণ অনুমানশক্তি, সে দিকটা এখনো তুমি চিনতে পার নি অমরেশ।'

অসীমানন্দের কথা শুনে প্রসন্নমুখে অমরেশ বলল, 'তাহলে দেখা যাচ্ছে মহারাজ, স্নেহাধিক্যবশত আমিই শুধু বাসনার বিষয়ে অযথা কথা বলি নে, আপনিও আমার বিষয়ে বলেন।'

পুনরায় একটা হাস্যধ্বনি উত্থিত হল।

আরও কিছুক্ষণ কথোপকথনের পর সকলের নিকট বিদায় গ্রহণ করে অমরেশ উঠে পড়ল, বলল, 'পারুলের আর আমার এই কয়দিনের পাতানো সংসারটি ছোট হলেও তার জটিলতা কম নয়—অনেকগুলি জট খুলে বেরোতে হবে। অতএব ফেরা যাক।

পারুল ও অমরেশ স্বামী অসীমানন্দের পদধূলি গ্রহণ করল। অসীমানন্দ দাঁড়িয়ে উঠে গভীর আন্তরিকতার সহিত উভয়কে আশীর্বাদ করে বললেন, চল, তোমাদের খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আসি।'

অমরেশের বারবার আপত্তি সত্ত্বেও প্রায় অর্ধেক পথ গল্প করতে করতে অসীমানন্দ উভয়ের সহিত গমন করলেন। অবশেষে অমরেশ দাঁড়িয়ে পড়ে সনির্বন্ধে বলল, 'আর না মহারাজ, অনেক দূর এসেছেন, এবার ফিরে যান; —আপনার অপেক্ষায় সন্ন্যাসীরা বসে রয়েছেন।'

অসীমানন্দ বললেন, 'লোকে বলে—দুঃখে কষ্টে সন্ন্যাসীদের বিচলিত হতে নেই। কিন্তু তোমাকে বিদায় দিতে আমি যে মনে মনে বিচলিত হচ্ছি, আমার সে দুর্বলতা অকপটে স্বীকার করছি অমরেশ। তোমার প্রবল অধ্যাত্ম শক্তির বলে তুমি আমাকে বশীভূত করেছ।'

অসীমানন্দর কথা শুনে অমরেশের চক্ষু সজল হয়ে এল; স্মিতমুখে বলল, 'কিন্তু কেমন করে করেছি তা তো জানেন না প্রভু।'

সকৌতূহলে অসীমানন্দ জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন করে করেছ?'

'বশীভূত হয়ে বশীভূত করেছি।'

উচ্চৈঃস্বরে অসীমানন্দ হেসে উঠলেন, বললেন, 'বশীভূত তুমি হয়েছ কি-না জানিনে অমরেশ, কিন্তু এ কথাতেও তোমাকে পরাভূত করতে পারলাম না।' তারপর হঠাৎ কণ্ঠের স্বর একটু গম্ভীর ক'রে নিয়ে বললেন, 'আচ্ছা, এবার তা হলে চললাম, কিন্তু আবার কবে দেখা সাক্ষাৎ হবে কে জানে।'

অমরেশ বলল, 'আশীর্বাদ করুন মহারাজ, শীঘ্রই যেন হয়।'

সহাস্যমুখে অসীমানন্দ বললেন, 'সে কথা মন্দ নয়, সে আশীর্বাদে তোমার চেয়ে আমার লাভ কম নেই।' তারপর আর কোনো কথা না ব'লে আশ্রমের দিকে প্রত্যাবর্তন করলেন।

রাজপথ দিয়ে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে এক জায়গায় অমরেশ ও পারুল মাঠের উপর নেমে পড়ল। সেখান থেকে মাঠ বিদীর্ণ ক'রে একটা পায়ে-হাঁটা পথ সোজা তাদের বাসার দিকে চ'লে গিয়েছে। সেই পথ ধ'রে গেলে পথের দৈর্ঘ্য মোটের উপর একটু সংক্ষিপ্ত হয়।

গ্রীষ্মকালের প্রদোষ। বায়ু তখনো সম্পূর্ণ শীতল হয় নি, ঈষৎ তপ্ত, কিন্তু সেটুকু তপ্ততায় দাহ নেই, বরং একটু যেন বিচিত্র রকমের আরাম আছে,—সামান্য একটু উষ্ণতার ভিতর দিয়ে উত্তেজনা-বোধের আরাম। উভয়েরই মন বোধ হয় নিজ নিজ চিন্তায় মগ্ন ছিল, তাই কারো মুখে কোন কথা ছিল না। নীরবে তারা আগু-পিছু হ'য়ে পথ অতিক্রম ক'রে চলেছিল।

কিছুক্ষণ পরে মৌন ভঙ্গ করল অমরেশ ; ডাকল, 'পারুল।'

পিছন থেকে পারুল উত্তর দিল, 'আজ্ঞে ?'

'অত কি ভাবছ ?'

দ্রুতপদে সামনের দিকে খানিকটা এগিয়ে গিয়ে প্রায় অমরেশের পাশে এসে পারুল বলল, 'এমন কিছু না, এমনি যা-তা এলোমেলো ভাবনা।'

মৃদু হেসে অমরেশ বলল, 'এলোমেলো ভাবনা তো তেমন সুবিধের জিনিস নয়। কিসের এলোমেলো ভাবনা ভাবছ? গরানহাটার, না, গাছতলার।

ঔৎসুক্যের নিরসনে আবার একটু পিছিয়ে গিয়ে পারুল বলল, 'সে ভাবনা তো শেষ হয়ে গেছে দাদা। মনের মধ্যে সে ভাবনার কোন চিহ্নই আর নেই।'

পারুলের কথা শুনে অমরেশ হাসতে লাগল ; বলল, 'অত সহজে সব জিনিস শেষ হয় না পারুল। মনে হয়, শেষ হয়েই গেছে, তারপর হঠাৎ যখন একদিন নূতন ক'রে দেখা দেয় তখন অবাক হ'য়ে যেতে হয়।'

পারুল এ কথার কোন উত্তর দেওয়ার প্রয়োজন বোধ করল না, চুপ ক'রে রইল।

'পারুল।'

'আজ্ঞে ?'

'কলকাতায় উপস্থিত হবার আগে কথাটা আর একবার ভাল ক'রে ভেবে দেখলে ক্ষতি নেই।'

এক মুহূর্ত নীরব থেকে পারুল বলল, 'পরীক্ষা করছেন দাদা।'

অমরেশ বলল, 'পরীক্ষাই যদি করি তা হ'লেও নিতান্ত অন্যায় করা হয় না,—পাস যদি হও, মনে মনে কতকটা নিশ্চিন্ত হ'তে পারি। এত দিনের অভ্যাসের জীবন, দিনে দিনে গড়ে তোলা আশ্রয়, হঠাৎ ত্যাগ ক'রে নতুন জীবনে প্রবেশ করা, মুখে যাই বলি না কেন, খুব সহজ কাজও নয়।'

অমরেশের কথা শুনে পারুলের মুখে মৃদু হাসি ফুটে উঠল, বলল, 'চুলের মুঠি ধ'রে যে রকম জোরে টান দিয়েছেন, খুব শক্ত কাজও নয়।'

অমরেশ হাসতে লাগল, বলল, 'দেখো, শেষকালে যেন অপবাদ দিয়ো না, যে, ঘর থেকে চুলের মুঠি ধ'রে টেনে বার ক'রে পথে বসালে।'

পারুল বলল, 'পথে বসাতে আর বাকি কি রেখেছেন দাদা! তবে কুপথ থেকে টেনে এনে সুপথে বসিয়েছেন তা নিশ্চয়।' তারপর এক মুহূর্ত নীরব থেকে বলল, 'আচ্ছা দাদা, বাসনা মেয়েটি কে? স্বামীজীর কাছে যার কথা এখনি আপনি বলছিলেন?'

অমরেশ বলল, 'বাসনা আমার ছাত্রী, আমার কাছে সে পড়ে।'

'পড়ে?—কি পড়ে?'

'বি. এ. পড়ে। আমি তাকে বি. এ. ক্লাসের বই পড়াই।'

'সে কি খুব বেশি পড়া?'

মৃদু হেসে অমরেশ বলল, '—, কিছু বেশি বইকি।'

'আচ্ছা দাদা, পড়াবার জন্যে আপনি বাসনার কাছ থেকে টাকা নেন?'

স্মিতমুখে অমরেশ বলল 'তা নিই। না নিলে পেট চলবে কেন পারুল?'

'কত নেন?'

একটু অসঙ্গত প্রশ্ন, কিন্তু প্রশ্নোত্তরের একটানা স্রোতের মধ্যে এমন অবলীলাক্রমে এসে পড়ল যে, সহসা এ প্রশ্নকে উপেক্ষা করাও গেল না। অমরেশকে বলতে হ'ল, 'মাসে দুশো টাকা।'

সবিস্ময়ে পারুল বলল, 'মাত্র দুশো টাকা? বেশি নয় তো!—দাদা, আপনার কি স্কুল আছে?'

অমরেশ বলল, 'কেন, থাকলে তুমি ভর্তি হও না-কি?'

অপ্রতিভ কণ্ঠে পারুল বলল, 'আমি মুখ্খু মানুষ, আমি ভর্তি হব কি ক'রে?'

অমরেশ বলল, 'তুমি মুখ্‌খু কি-না তা ঠিক জানি নে পারুল, কিন্তু ইস্কুল তো মুখ্‌খুদের জন্য, পণ্ডিতদের জন্য নয়।'

'সে অন্যরকম মুখ্‌খুদের জন্য,—আমার মত আকাঠ মুখ্‌খুদের জন্য নয়।' বলে পারুল হাসতে লাগল।

অদূরে রাজপথে এক দল সঙ্গীতরতা পশ্চিমা রমণী বাদ্যাদি সহ সমারোহপূর্বক ভাগীরথী অভিমুখে চলেছিল। সঙ্গে তাদের বহুবিধ পাত্রে পূজার উপচার। তাহার পশ্চাতে সুদৃশ্য শিবিকা মধ্যে অবগুণ্ঠনবতী কিশোরী মূর্তি। সম্ভবত কোনো সম্পন্ন গৃহস্থ-ঘরের নব পরিণীতা বধূ আনুষ্ঠানিক মঙ্গলস্নানে চলেছে।

এই বিচিত্র শোভাযাত্রা দেখার তন্ময়তায় অমরেশ ও পারুলের মধ্যে ক্ষণকালের জন্য কথোপকথন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল, রাজপথ পরিত্যাগ করে শোভাযাত্রা গঙ্গাভিমুখে গলির পথে প্রবেশ করলে তারা পরস্পরের প্রতি মনোযোগশীল হল।

সমীপবর্তী রাজপথে উপনীত হওয়ার পর মাত্র তিন-চারখানা বাড়ির পরেই অমরেশের বাসা। অবচেতন মনের যে নিগূঢ় চিন্তা কথোপকথনের রাসায়নিক ক্রিয়ায় চেতন মনের সুস্পষ্ট ঔৎসুক্যে পরিণত হয়েছিল, বাকি পথটুকু শেষ হবার পূর্বে তার নিরসনের অভিপ্রায়ে পারুল পুনরায় কথোপকথন আরম্ভ করল; বলল, 'দাদা, বাসনার বিয়ে হয়েছে?'

অমরেশ বলল, 'না, এখনও হয় নি।'

'এখনও হয় নি? আচ্ছা, তার বয়স কত দাদা?'

'তা ঠিক বলতে পারি নে, জন্মতারিখ তো আর মুখস্থ নেই। তবে আন্দাজি মনে হয়, কুড়ি-একুশ বৎসর হবে।'

অল্পক্ষণ মনে মনে কি চিন্তা করে পারুল জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা দাদা, বাসনারা কি জাত? বামুন না কায়েত?'

বাসনা সম্বন্ধে এই প্রশ্নাবলীর ধারায় সহসা অবহিত হয়ে অমরেশ বলল,

'ব্যাপার কি বল দেখি পারুল? হঠাৎ বাসনার কুষ্টি-ঠিকুজীর বিষয়ে ব্যস্ত হয়ে উঠলে কেন? কলকাতায় গিয়ে ঘটকালি আরম্ভ করবে নাকি?'

ঈষৎ অপ্রতিভ হয়ে পারুল বলল, 'এমনি জিজ্ঞেস করছি দাদা। বলুন না,—বামুন, না, কায়েত?'

অমরেশ বলল, 'কি আশ্চর্য! বামুন কায়েত ছাড়া অন্য জাত আর বাংলা দেশে নেই নাকি?'

আগ্রহভরে পারুল জিজ্ঞাসা করল. 'কেন, বামুন-কায়েত নয়?'

'না, না, বাসনারা বামুনই বটে.—কিন্তু তোমার প্রশ্ন থেকে মনে হচ্ছিল যে, বামুন আর কায়েত ছাড়া যেন অন্য কোন জাতই নেই।'

মাঠের পথ শেষ করে তারা এতক্ষণে রাজপথের উপর এসে পড়েছিল। সম্মুখে একটা দোকানে শীতল চৌবে বোতল হাতে করে কেরোসিন তেল ক্রয় করতে এসেছিল, অমরেশ ও পারুলকে দেখতে পেয়ে নিকটে এসে বলল, 'বাবুজী কি আজই কলকত্তা যাচ্ছেন?'

অমরেশ বলল, 'হ্যাঁ চৌবেজী, আজই।'

দুঃখার্ত স্বরে শীতল চৌবে বলল, 'আফসোসের বাত আছে বাবুজী। মহল্লাটা অন্ধার হোয়ে যাবে। আপনার মত ভদ্দর লোগ সাধু লোগ হামি তো সারা জীন্দগীমে দু-চারঠো ভি না দেখছি।'

হাত জোড় করে স্মিতমুখে অমরেশ বলল, 'আপনাদের এই সাধুস্থান হরিদ্বারে আমার মত লোককে সাধু বলে অপরাধ করবেন না চৌবেজী।'

সহাস্য মুখে মাথা নেড়ে শীতল চৌবে বলল, 'হরিদ্বারমে সাধুকো সাধু না বললেই অপরাধ হোয় মহারাজ।'

শীতল চৌবের কথা শুনে আনন্দে পারুলের চক্ষু সজল হয়ে উঠল; মনে মনে বলল, ঠিক তাও নয় চৌবেজী, হরিদ্বারের দেবতাকে দেবতা না বললে অপরাধ হয়।

গৃহে পৌঁছে তারা দেখল সমস্ত কাজ-কর্ম সেরে লখিয়ামাঈ বসে রয়েছে।

পারুল বলল, 'আজ আর উনুনে আগুন দিয়ো না লখিয়ামাঈ। কিছু পুরি-তরকারি আর মিঠা এনে দাও, তাই খেয়েই আমরা রওনা হব।'

আহারাদি হয়ে গেলে লখিয়ামাঈকে পারুল একখানা নূতন শাড়ি ও দু টাকা নগদ বকসিস দিয়ে বিদায় দিল। যাবার সময় লখিয়ামাঈ কাঁদতে লাগল; বলল, 'মা-জী আবার যখন হরিদ্বারে আসবে আমাদের মহল্লাতেই এসো। চৌবেজীকে খৎ দিলে বাসা ঠিক করে দেবে।'

রাত্রি সাড়ে দশটায় দেরাদুন-হাওড়া এক্সপ্রেস, তখন মাত্র রাত্রি আটটা। কিন্তু সমস্ত কাজ-কর্ম বাঁধাবাঁধি সেরে শুধু শুধু বাসায় বসে থাকতেও ইচ্ছা হল না, গাড়ি ডাকিয়ে শীতল চৌবের হাতে চাবি দিয়ে উভয়ে স্টেশনের অভিমুখে রওনা হল। হঠাৎ এক সময় অমরেশ দেখল, গাড়ির কোণে মাথা হেলান দিয়ে পারুল উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদছে। এ যে তার হরিদ্বারে হারিয়ে-যাওয়া জননীর জন্য শোকের ক্রন্দন তা বুঝতে বিলম্ব হল না।

সমবেদনার আর্দ্রস্বরে অমরেশ বলল, 'মার জন্যে দুঃখ হচ্ছে পারুল?'

পারুল কোনো উত্তর দিল না, শুধু তার ক্রন্দনের উচ্ছ্বাস আর একটু বর্ধিত হল।

অমরেশ বলল, 'এত দুঃখ কেন পারুল? কাঁদছ কেন এত? ভগবানে তুমি যখন বিশ্বাস কর, ভগবানকে যখন মঙ্গলময় মনে কর, তখন এ কথাও তো মনে করতে পার যে, হরিদ্বারে তোমার মাকে হারিয়ে যাওয়ার মধ্যেও হয়তো এমন কোনো মঙ্গল লুকিয়ে আছে, যা তুমি আজ দেখতে পাচ্ছ না, —দুদিন পরে হয়তো পাবে।'

এ কথারও পারুল কোনো উত্তর দিল না। তেমনি গাড়ির কোণে মাথা হেলান দিয়ে অশ্রুপাত করতে লাগল।

স্টেশনে যখন তারা পৌঁছল, তখন ট্রেনের অনেক বিলম্ব। প্ল্যাটফর্মের এক প্রান্তে অপেক্ষাকৃত নির্জন স্থানে একটা বেঞ্চ অধিকার করে তারা

পাশাপাশি উপবেশন করল। নিজ নিজ মনের চিন্তায় মগ্ন হয়ে উভয়ে ক্ষণকাল নীরবে বসে রইল।

মৌন ভঙ্গ করল পারুল; বলল, 'যাকে হরিদ্বারে রেখে যাচ্ছি, এ যে আমার কত বড় দুঃখ তা বলতে পারি না; কিন্তু কপালের দোষে এর বাড়া দুঃখও যাতে আমাকে ভোগ করতে না হয়—সেই আশীর্বাদ আজ আমাকে করুন দাদা। যাবার সময়ে মা আমাকে যে জিনিস দিয়ে গেছে, তা যেন আবার কোনদিন না হারাই—সেই আশীর্বাদ আমাকে করুন।'

পারুলের কথা শুনে অমরেশ হাসতে লাগল; 'এত বড় আশীর্বাদ তোমাকে করি, সে শক্তি আমার কোথায় পারুল?'

মিনতি-মিশ্রিত করুণ স্বরে পারুল বলল, 'আজ আমাকে ঠাট্টা করেও ভয় দেখাবেন না দাদা। হরিদ্বারের বাসা ভেঙে দিয়ে আজ আমার মনের কি অবস্থা হয়েছে, তা আপনি একটুও জানেন না।'

এবার পারুলের কথা শুনে সুগভীর সমবেদনায় অমরেশের দুই চক্ষু সজল হয়ে এল। মনে হল, পারুল যেন পারুল নয়; যেন সে ঝড়-খাওয়া নীড়হারা এক অসহায় পক্ষীশাবক, আশ্রয়ের জন্য প্রাণপণে দুই দুর্বল পক্ষ তার দিকে প্রসারিত করে ধরেছে। আর একবারের জন্য অমরেশের মনে লুপ্ত হল পারুল, লুপ্ত হল প্রভাবতী, লুপ্ত হল অস্থি-রক্ত-মাংসের অকৌলীন্যের ইতিহাস; শুধু জেগে রইল এক দেহ-নিরপেক্ষ মানবাত্মার মর্মন্তুদ যাতনা।

'দাদা!'

পরিপূর্ণ আশ্বাসের সুগভীর স্বরে অমরেশ বলল, 'নিশ্চিন্ত হও পারুল। ভবিষ্যতের কথা জোর করে বলা চলে না, তবুও ভবিষ্যতে কোন ভয় রইল না তোমার,—এ কথা হরিদ্বার ছাড়বার আগে জোর করেই আর একবার তোমায় দিয়ে গেলাম।'

পারু কোন কথা কইল না, শুধু বিষণ্ণ আনন্দের স্তিমিত বেদনায় বেঞ্চের

পিঠে মাথা স্থাপিত করে নিঃশব্দে অশ্রুপাত করতে লাগল। মানুষের জীবনে কদাচিৎ কখনো যে পরমাশ্চর্যের মুহূর্ত উপস্থিত হয়, পারুল ও অমরেশের জীবনে এ সেই মুহূর্ত।

মাথার উপরে আকাশভরা তারকারাজি এই মুহূর্তের নীরব সাক্ষী হয়ে রইল।

১০

তৃতীয় দিন প্রত্যুষে হাওড়া স্টেশনে উপনীত হয়ে ট্যাক্সি করে পারুলকে নিয়ে অমরেশ কালীঘাটের দক্ষিণ অঞ্চলে একটা ক্ষুদ্র দ্বিতল গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হল। গাড়ি থেকে অবতরণ করে সে বলল, 'এই বাড়ি পারুল।' পিছনে পিছনে পারুলও দরজার সম্মুখে এসে দাঁড়াল।

ভিতর থেকে দরজা বন্ধ ছিল। অমরেশ দরজায় মৃদু করাঘাত করে ডাকল, 'মাসিমা! মাসিমা!'

এ ডাকের প্রয়োজন ছিল না, আহুতা গৃহবাসিনীর কানে মোটর থামার শব্দ পৌঁছেছিল, এবং আগমনের সময় উপস্থিত হয়েছে অনুমান করে কিছুক্ষণ থেকে তিনি প্রত্যাশিত অতিথিগণের জন্য প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। দরজা খুলে সম্মুখে অমরেশ ও পারুলকে দেখে সাদরে আহ্বান করলেন, 'আয় অমর আয়।' পারুলের দিকে দৃষ্টিপাত করে তার সুন্দর কমনীয় মূর্তি দেখে মনে মনে প্রসন্ন হয়ে বললেন, 'এস মা, এস।' তারপর অন্দরের দিকে

মুখ ফিরিয়ে উচ্চৈঃস্বরে বললেন, 'ও চাঁপাব মা! গাড়ি থেকে জিনিসপত্তর-গুলো নামিয়ে নিয়ে যা বাছা।'

গৃহস্বামিনী মাসিমার নাম অনুমতি। ইনি সন্তানহীনা বিধবা। স্বামী অসিতনাথ ছিলেন মস্ত দার্শনিক পণ্ডিত এবং কলিকাতার কোনো খ্যাতনামা কলেজের দর্শনশাস্ত্রের বিশিষ্ট অধ্যাপক। হঠাৎ একদিন অনপনেয ব্যাধি পঠনক্ষীণ অধ্যাপকের দুর্বল ফুসফুসের ভিতব বাসা বাঁধল। বুদ্ধিমান অসিত নাথ যখন বুঝলেন যে, আশু অথবা অনতিবিলম্বে মৃত্যু অনিবার্য, তখন তাঁর সমস্ত স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তির অকুণ্ঠিত স্বত্ব স্ত্রী অনুমতিব নামে লিখে দিলেন। একজন বিচক্ষণ দূবদর্শী আত্মীয সে সময়ে উপদেশ দিয়েছিলেন যে, স্ত্রী হলেও অনুমতি যখন স্ত্রীলোক তখন তাকে পূর্ণ স্বত্ব লিখে না দিয়ে জীবন-স্বত্ব লিখে দিলে অনেক দিক থেকে সেটা বিবেচনার কাজ হবে। অসিতনাথ কিন্তু তাতে প্রবলভাবে মাথা নেড়ে বলেছিলেন, 'ইচ্ছে হলে আমার সম্পত্তির অপব্যয় করতে পারবে না, সে রকম ব্যবস্থা করে আমি অনুমতিকে অপমানিত করে যেতে চাই না।' অনুমতির প্রতি অসিতনাথেব এই প্রগাঢ় বিশ্বাস যে অমূলক ছিল না, বৈধব্যকালের অনুমতির সরল এবং সুস্থ জীবনযাপন তার প্রমাণ।

অমরেশ ছিল অসিতনাথের প্রিয় ছাত্র। মেধাবী এবং চরিত্রবান বলে তিনি অমরেশকে যত না ভালবাসতেন, শ্রদ্ধা করতেন তত। শুধু তাই নয়, নৈতিক জীবন সংগঠন ব্যাপারেও তিনি তাঁর গুরু ছিলেন। যুক্তি-পূজার প্রথম মন্ত্র অমরেশ তার পঠদ্দশায় অসিতনাথেরই নিকট লাভ করে। তখন হতে অনুমতির সহিত তার পরিচয়।

তারপর, অসিতনাথের মৃত্যুর পর গত সতের-আঠার বৎসরে এই পরিচয় ক্রমশ আত্মীয়তায় পরিণত হয়েছে। অনুমতি যে যথার্থই তার আপন মাসি নয়, এ কথা অমরেশের সব সময়ে মনে থাকে না। মৃত্যুর কয়েকদিন পূর্বে অসিতনাথ অমরেশকে বলেছিলেন, 'আমার অবর্তমানে তুমি অনুমতির অভি-

ভাবক হয়ে অমরেশ, ঠিক যেমন ছেলে তার বিধবা মার হয়। অন্তত রক্ষণাবেক্ষণের দিক দিয়ে অমরেশ অসিতনাথের এ অনুরোধ আজ পর্যন্ত পালন করে এসেছে।

কলিকাতায় পারুলকে নিয়ে কোথায় রাখবে—এ চিন্তা মনে উদয় হতে অমরেশের প্রথমেই অনুমতির কথা মনে হয়েছিল। কলিকাতা রওনা হবার কিছুদিন আগে সে এ বিষয়ে অনুমতিকে পত্র দেয়। পারুলের বিষয়ে সমস্ত কথা সম্পূর্ণভাবে প্রকাশ করে সে লেখে, 'অবিবাহিতা মেয়েকে নিয়ে সমাজের পিঞ্জরের মধ্যে মা বাস করছেন। মন তার উড়তে চাইলেও দেহ খাঁচার মধ্যে বন্দী। তোমার বাস বিশ্ব মাসিমা, মনুষ্যত্বের উন্মুক্ত আকাশতলে। তুমি যদি দয়া করে আশ্রয় দাও তা হলে এই হতভাগিনী অসহায়া মেয়েটার একটা গতি হয়। রোগের চিকিৎসা আছে, চিকিৎসক আছে; পাপের কি কিছুই নেই মাসিমা? তাও যাকে পাপ বলছি তা এর স্বোপার্জিত বস্তু নয়। আমি অবশ্য শেষ পর্যন্ত আছি, কিন্তু তুমি যদি একে আশ্রয় দাও তা হলে স্ত্রীলোকের কাছে স্ত্রীলোকের বাস করার যে স্বচ্ছন্দতা তা থেকে এ বঞ্চিত হয় না। তা ছাড়া, যে নূতন পথে চলা তার পক্ষে সহজ হবে, এ আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি।'

অমরেশের চিঠির উত্তরে অনুমতি লিখেছিলেন, 'মেয়েটির সপক্ষে এত ভূমিকা অকারণ করেছ অমরেশ—তুমি তাকে আমার কাছে রাখতে ইচ্ছে করেছ, এইটেই আমার কাছে তার সবচেয়ে বড় সার্টিফিকেট। আমার বয়স হয়েছে, শক্তি সামর্থ্য কমে এসেছে, এ অবস্থায় আমাকে দেখবার শোনবার জন্য একটি সমর্থ মেয়ে পেলে আমারও কম উপকার হবে না। তুমি অসঙ্কোচে তাকে আমার কাছে নিয়ে এস।'

হরিদ্বার থাকতে এই চিঠিখানা পড়ে অনুমতি সম্বন্ধে পারুলের অনেকখানি সঙ্কোচ কেটে গিয়েছিল, যেটুকু বাকি ছিল স্বচক্ষে তাঁর প্রসন্নমধুর মূর্তি নিরীক্ষণ করে অন্তর্হিত হল।

গৃহাঙ্গণে প্রবেশের পর অমরেশ আভূমি নত হয়ে অনুমতিকে প্রণাম করল। আশ্রয়দাত্রীকে প্রথম দর্শনের তন্ময়তায় পারুল হয়তো এ কথাটা ভুলেই গিয়েছিল, অমরেশকে প্রণাম করতে দেখে সে দ্রুতপদে এগিয়ে গিয়ে দুই হাতে অনুমতির পদধূলি গ্রহণ করতে উদ্যত হল। 'থাক থাক' বলে দুই-তিন পা পিছিয়ে গিয়ে অনুমতি পারুলকে নিবারণ করতে বহুবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারুলের ভক্তি প্রাবল্যের কাছে শেষ পর্যন্ত তাকে হার মানতে হল। অগত্যা পারুলের মাথায় হস্তার্পণ করে তিনি আশীর্বাদ করলেন, 'তোমার কল্যাণ হোক মা।'

পদধূলি গ্রহণে পারুলকে নিরস্ত করবার চেষ্টাটা যে অনুমতির পক্ষ থেকে শুধু সৌজন্য অথবা সহৃদয়তাই নয়, তা উপলব্ধি করে মনে মনে পুলকিত হয়ে সহাস্যমুখে অমরেশ বলল, 'কি করলে পারুল? স্নানের পর মাসিমাকে গাড়ির বাসি কাপড়ে ছুঁয়ে দিলে? পূজোয় বসবার আগে আবার তাঁকে না-নাইয়ে ছাড়লে না দেখছি!'

অমরেশের কথা শুনে পারুলের মুখখানা একেবারে পাংশুবর্ণ ধারণ করল। অনুমতির প্রতি দৃষ্টিপাত করে দুঃখার্ত অপ্রতিভ স্বরে সে বলল, আমায় ক্ষমা করুন মাসিমা! আমি বুঝতে পারি নি।'

সুমিষ্ট হাসির রূপে ক্ষমা মাসিমার মুখের উপর ভেসে বেড়াচ্ছিল। সস্নেহ কণ্ঠে তিনি বললেন, 'না, না, বেশ করেছ। প্রথম দেখার দিনে তুমি যদি আমার পায়ের ধুলো না নাও, আর আমি যদি তোমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ না করি তা হলে মাসি বোনঝির সম্পর্কের ভিত মজবুত হয় কি করে?'

অনুমতির কথা শুনে অমরেশ হাসতে লাগল, বলল, 'নিশ্চিন্ত হলাম মাসিমা। ভিত্তি প্রতিষ্ঠার অনুষ্ঠান যখন মজবুত করেই হয়ে গেল, তখন আমি এবার নির্ভয়ে যেতে পারি।'

অনুমতি বললেন, 'ওমা, সে কি কথা! মুখ-হাত-পা ধোও, চা-টা খাও, তারপর যাবে। না-হয় এ বেলাটা এখানে কাটিয়ে ও-বেলা যেয়ো।'

স্মিতমুখে অমরেশ বলল, 'আমার তাতে খুব আপত্তি নেই মাসিমা, কিন্তু এতদিন পরে এসে মার সঙ্গে দেখা করবার আগে তোমার এখানে সমস্ত দিন কাটিয়ে গেলে মা বলবেন, মার চেয়ে মায়া যার তারে বলি—'বলে কথাটা শেষ না করে হেসে উঠল।

অনুমতিও হেসে ফেলে অসমাপ্ত বাক্যটা পূরণ করে বললেন, 'তাবে বলবেন ডান তো? কিন্তু তিনদিন ধরে যে গাড়িতে আসছে, তার মুখে একটু জল না দিয়ে ছেড়ে দিলে মা তাকে কি বলবেন তা বল? সে হবে না অমর, চা না খেয়ে যেতে পাবি নে।'

অমরেশ হাত জোড় করে মিনতিপূর্ণ কণ্ঠে বলল, 'না মাসিমা, অনুগ্রহ করে সে আদেশ করো না। বাইরে ট্যাক্সি অপেক্ষা করছে; পাঞ্জাবীকে বলেছি, এখানে মিনিট দশেক দেরি হবে। তোমার চা খেয়ে যেটুকু আমার লাভ হবে তাতে ওয়েটিং চার্জ পোষাবে না।'

অনুমতি কিন্তু লাভ-লোকসানের হিসাবকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে বললেন, 'না পোষায় না পোষাবে, চা তোকে খেয়ে যেতেই হবে বাবা। বাসিমুখে ছেড়ে দিলে বাড়ির অকল্যাণ হয়। আমি দু মিনিটে চা করে নিয়ে আসছি, তুই ততক্ষণ কলের ঘরে গিয়ে মুখটা ধুয়ে আয়।'

'ও কাজটা গাড়িতেই সেরেছি মাসিমা।'

সহাস্যমুখে অনুমতি বললেন, 'তবে তো চা খাবার জন্যে তৈরি হয়েই এসেছিস। বসবার ঘরে পারুলকে নিয়ে গিয়ে একটু বোস্, আমি এলাম বলে।' বলে দ্রুতপদে প্রস্থান করলেন।

গৃহের পূর্বদিকের একটা ঘর বৈঠকখানা রূপে ব্যবহৃত হয়। অমরেশ ও পারুল সেই ঘরে গিয়ে দুখানা চেয়ার অধিকার ক'রে উপবেশন করল।

ঘরটা অপ্রশস্ত, কিন্তু সুরুচিজ্ঞাপক অল্প-কিছু আসবাবপত্র ও চিত্র দিয়ে

সুচারুরূপে সজ্জিত। কক্ষের মধ্যস্থলে একটি মর্মরমণ্ডিত গোল টেবিল, তার মাঝখানে সুদৃশ্য ফুলদানিতে গৃহসংলগ্ন পুষ্পোদ্যান হ'তে আহৃত ফুলের গুচ্ছ। সেই সতেজ তাজা পুষ্পনিচয়ের সুষমায় নবাগত অতিথির প্রতি অবৈরাগ্যের পরিচয়।

অমরেশ বলল, 'মাসিমাকে কেমন লাগল পারুল ?'

'ভাল লাগল।'

'এখানে তোমার মন টিকবে তা বুঝতে পারছ তো ?'

একটু চুপ ক'রে থেকে অমরেশের প্রতি একবার চকিত দৃষ্টিপাত ক'রে ঈষৎ-অবরুদ্ধ কণ্ঠে পারুল বলল; 'তা পারছি, কিন্তু মাঝে মাঝে আপনার দর্শন পাব তো দাদা ?'

সহাস্যমুখে অমরেশ বলল, 'দর্শন পাবে না, দেখা পাবে! দর্শন পায় দেবতার, আমার মত মানুষের নয়।' তারপর হঠাৎ পারুলের মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করে সবিস্ময়ে বলল, 'ও কি ? তোমার চোখে জল কেন পারুল ? মুছে ফেল, মুছে ফেল! মাসিমা এটা দেখে ফেললে ভাববেন, কোথাকার একটা ছিঁচকাঁদুনে মেয়ে অমর গছিয়ে দিয়ে গেল!'

অমরেশের কথা শুনে পারুলের মুখে মৃদু হাসি দেখা দিল; অঞ্চলে দুই চক্ষু মার্জিত করে বলল, 'রোজ দেখা পাব—এত বড় আশা করি না, কিন্তু দু তিন দিন অন্তর পাব তো ?'

অমরেশ বলল, 'আশা ছোট করে করাই ভাল, কিন্তু দাবি বড় করে করতে হয় পারুল। আমি যখন তোমার ভার নিয়েছি, তখন তো আমার ওপর তোমার দাবি নিশ্চয়ই আছে। দাব কর যে, প্রতিদিন তো বটেই, এবেলা ওবেলা দু-বেলাই দেখা দিতে হবে। কিন্তু আশা করো দু-তিন দিন অন্তরেরই।'

পারুলের মুখে আবার ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠল; বলল, 'কোনো দিক দিয়েই কি ধরা দেবেন না দাদা ?'

এ কথার উত্তর দেওয়ার সময় হল না, এক থালা খাবার হাতে নিয়ে অনুমতি প্রবেশ করলেন, পিছনে জলের গ্লাস নিয়ে চাঁপার মা।

খাবারের বৈচিত্র্য এবং পরিমাণ দেখে অমরেশ চমকে উঠল; বলল, এই কি তোমার চা মাসিমা?

অনুমতি বললেন চা এখনি আসছে।' তারপর পারুলের প্রতি ইঙ্গিত করায় পারল তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে একটা কাঠের ছোট টিপয় এনে অমরেশের সম্মুখে স্থাপন করল।

অমরেশ বলল, 'চা আসছে আমি তা জানি' আমি জিজ্ঞাসা করছি, এগুলো কেন এল; আর এলই যদি তা হলে এই বিপুল আকারে কেন এল?'

টিপয়ের উপর খাবারের থালা রেখে অনুমতি বললেন, 'কিচ্ছু বিপুল নয়,—সব তোকে খেতে হবে।'

বিরক্তি এবং হতাশার কপট সুরে অমরেশ বলল, 'এতদিন পরে বাড়ি ফিরে এসে মার কাছে বসে একটু পেট ভরে খাব, সে খিদেও মেরে দিতে চাও। মার সঙ্গে মাসির এই অস্বাস্থ্যকর প্রতিযোগিতা ভাল নয় কিন্তু বলছি।'

অমরেশের কথা শুনে অনুমতি হেসে ফেললেন, বললেন, 'আচ্ছা, আচ্ছা, ভারি মাতৃভক্ত হয়েছিস। সে আমি দিদির সঙ্গে বোঝাপড়া করব, তুই এখন খেতে আরম্ভ কর।' বলে প্রস্থান করলেন।

টিপয়ের উপর জলের গ্লাস রেখে ফিক করে একটু হেসে ফেলে পারুলের দিকে চেয়ে চাঁপার মা বলল, 'মার সঙ্গে দাদাবাবুর এই রকম মস্করা বারো মাস তিরিশ দিন। বুঝলে দিদিমণি? পাছে এই কপট কলহকে আসল বলে এই নবাগত মেয়েটি ভুল করে বসে, সেই আশঙ্কায় বোধকরি চাঁপার মার এই কৈফিয়ৎ প্রদান।

চা খাওয়া শেষ হলে তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে অমরেশ বলল, 'এবার চললাম মাসিমা।'

'ও-বেলা আসছিস তো ?'

'ও বেলা আসতে পারব না। ও বেলা বাসনার সঙ্গে দেখা করতে যেতে হবে, সে আবার হয়তো রেগে রয়েছে।'

'কেন, রাগ কিসের জন্য ?'

মৃদু হেসে অমরেশ বলল, 'মেয়েরা তো অকারণে রাগ করে, তার ওপর য কথা ছিল তার চেয়ে অনেক দেরি করে ফিরেছি। সুতরাং কারণও একটু আছে।'

অনুমতি বললেন, 'আইবুড়ো মানুষ, মেয়েদের সঙ্গে কারবার তো এক পয়সারও নেই, তবে তাদের বিষয়ে এ সব কথা বলিস কি করে ?'

'স্রোতে ভাসে না বলে নদীর পারের অশথগাছ কি স্রোতের খবর কিছুই রাখে না মাসিমা ?' বলে হাসতে হাসতে অমরেশ সাইকেলে গিয়ে উঠল।

সমস্ত দিন জননী সুরবালা এবং ভগ্নী পূরবীর সঙ্গে নানা গল্পগুজবে কাটিয়ে সন্ধ্যার পর অমরেশ বাসনাদের গৃহে উপস্থিত হল। ভৃত্য চরণের সঙ্গে দেখা হতে জিজ্ঞাসা করল, 'দিদিমণি বাড়ি আছেন চরণ ?'

একমুখ হাসির সহিত অমরেশকে প্রণাম করে চরণ বলল, 'আজ্ঞে, আছেন।'

'তাকে বল আমি এসেছি।'

দক্ষিণ দিকের একটা ঈজি-চেয়ারে শয়ন করে ছিল, অমরেশের আগমন সংবাদ শুনে মুখখানা প্রথমে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, পর-মুহূর্তেই কিন্তু বিরসর্প ধারণ করল। চরণকে বলল, 'মাষ্টার মশাইকে বল্ কাল আসতে, আমার শরীর ভাল নেই।' তারপর গমনোদ্যত চরণকে ডেকে বলল, 'আচ্ছা, বাইরের ঘরে বসা, আমি আসছি। একটু পরে চা দিয়ে আসিস।'

'যে আজ্ঞে দিদিমণি।' বলে চরণ প্রস্থান করল।

১১

বাইবের ঘরে টেবিলের উপর একটা নামজাদা আমেরিকান মাসিকপত্র প'ড়ে ছিল। সেইটে টেনে নিয়ে পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে একটা প্রবন্ধের শিরোনামা লক্ষ্য ক'রে অমরেশ কৌতূহল অনুভব করল। প্রথম কয়েক ছত্র পাঠ ক'রে বুঝল—আন্তর্জাতিক ব্যবসা-বাণিজ্য, দাবি-দাওয়া, চুক্তি-নিষ্পত্তির নিরাকরণের অজুহাতে চীন এবং জাপানের মধ্যে খাদ্য-খাদকতার যে সম্পর্ক ক্রমশ সুস্পষ্ট হ'য়ে উঠেছে, প্রবন্ধটি তদ্বিষয়ে আলোচনা। কৌতূহল বাড়ল। ছত্রের পর ছত্র পড়তে পড়তে সহসা এক সময়ে সে প্রবন্ধের আকর্ষিকতার ভিতর তলিয়ে গেল। তারপর কিছুক্ষণ পরে যখন অন্দরের দিকের পর্দা ঠেলে বাসনা ঘরের ভিতর প্রবেশ করল তখন পঠিত অংশের পরিমাণ দেখে তার খেয়াল হল, সময় অনেকখানি অতিবাহিত হয়ে গেছে।—অর্থাৎ, বাসনার জন্য তাকে দীর্ঘ-কাল অপেক্ষা করতে হয়েছে।

মাসিকপত্রখানা বন্ধ করে টেবিলের উপর রেখে অমরেশ বলল, 'এত দেরি হল যে বাসু ? তোমার কোন কাজকর্মের মধ্যে এসে পড়ে অসুবিধে করলাম না তো ?'

এ প্রশ্নের বাচনিক উত্তর না দিয়ে নীরবে মাথা নেড়ে বাসনা জানাল অসুবিধে হয় নি। তারপর যুক্ত করের দ্বারা অমরেশের প্রতি অতি সংক্ষিপ্ত একটা নমস্কার জানিয়ে অদূরবর্তী চেয়ারে বসে পড়ল। দীর্ঘকালের ব্যবধানের পর প্রথম দর্শনের সময়ে ইদানিং বরাবার সে অমরেশকে প্রণাম করে এসেছে।

আজ কিন্তু বহুকাল পরে পুনরায় প্রথম পরিচয়ের নমস্কার দেখা দিল। তারপর কণ্ঠস্বর থেকে আগ্রহ এবং কৌতূহলের সমস্ত উদ্দীপনাটুকু বাদ দিয়ে বলল 'আজ এলেন ?'

এই একান্ত অনাবশ্যক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার কোনো প্রয়োজন আছে বলে অমরেশের মনে হ'ল না। তথাপি এ প্রশ্নের নিগূঢ় তাৎপর্য এর সাধারণ শব্দার্থের মধ্যে নেই, পরন্তু সন্ধান করলে পূর্বোক্ত নমস্কারের মধ্যে কিছু পাওয়া যেতে পারে উপলব্ধি ক'রে মনে মনে সে একটু কৌতুক বোধ করল ; মৃদু হেসে বলল, 'হ্যাঁ, আজ এলাম। কিন্তু তোমাদের খবর কি বল ? বাবা কেমন আছেন ?'

'ভাল আছেন।'

'মা ?'

'ভাল।'

'তুমি কেমন ছিলে বাসু ?'

'আমি ?—বলছি।' ব'লে বাসনা চেয়ার ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে পর্দা সরিয়ে ভিতর দিকে মুখ ক'রে ঈষৎ উচ্চ কণ্ঠে অনাবশ্যক আদেশ করল, 'চরণ ! মাস্টার মশায়কে শীগ্‌গির চা দে।' তারপর চরণ সে কথা শুনল কি শুনল না সে বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়ে ফিরে এসে চেয়ারে বসে বলল, 'মেয়েদের সেতার-প্রতিযোগিতায় পূরবী প্রথম হয়েছে, শুনেছেন ?'

হঠাৎ একটা সম্পূর্ণ নূতন প্রসঙ্গের অবতারণার দ্বারা পূর্ব প্রসঙ্গের সূত্রকে একেবারে এক কোপে এরূপ নির্মমভাবে ছিন্ন করা দেখে অমরেশের মনে কৌতুকটা আর একটু বর্ধিত হ'ল ; মৃদু হেসে বলল, 'হ্যাঁ, শুনেছি। কিন্তু তুমি আমার ওপর রাগ করেছ বাসু ?'

অমরেশের কথা শুনে বাসনা একেবারে আকাশ থেকে পড়ল ; বিস্ময়ের বিলম্বিত সুরে বলল, 'রাগ ? রাগ করতে যাব কি কারণে ?'

অমরেশ বলল, 'কি কারণে, সেটা হবে আমার দ্বিতীয় প্রশ্ন, যদি আমার প্রথম প্রশ্নের উত্তরে বল রাগ করেছ। রাগ করেছ ?'

'না।'

'অভিমান?'

সবেগে মাথা নেড়ে বাসনা বলল, 'না, অভিমানও নয়। আপনার সঙ্গে যে আমার এমন কোনো আত্মীয়তা নেই, যাতে অভিমান করতে পারি।'

অমরেশ বলল, 'তা আমি জানি নে। কিন্তু এ কথা নিশ্চয় জানি যে, মনের মধ্যে বেশ মজবুত রকমের একটা আত্মীয়তার বোধ না থাকলে মানুষ এত জোরের সঙ্গে আত্মীয়তা অস্বীকার করতে সাহস পায় না। আর অভিমানের কথা যদি বল, তা হলে মনস্তত্ত্ববিদ্ মাত্রেই বলবে যে, বহুকাল পরে প্রণাম করে এসে হঠাৎ একদিন নমস্কার করা, অভিমানের লক্ষণ ছাড়া আর কিছুই নয়।'

এবার বাসনা হেসে ফেলল। তারপর চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে অমরেশের পদধূলি গ্রহণ ক'রে ফিরে এসে বলল, 'কোনো দিনই তো তর্কে আপনার সঙ্গে পেরে উঠি নি, আজও হারলাম।'

বাসনার কথা শুনে অমরেশ হাসতে লাগল; বলল, 'হার যখন স্বীকার করছ, তখন আমার কথাগুলোর ঠিক ঠিক উত্তর দাও। কেমন ছিলে? পড়াশুনা কেমন হ'ল? শরীর একটু রোগা দেখছি কেন?'

নিমেষের জন্য বাসনা একবার অমরেশের প্রতি চকিত দৃষ্টিপাত করল, তারপর তার মুখমণ্ডলের রেখাগুলো ঈষৎ কঠিন হয়ে উঠল। এক মুহূর্ত মনে মনে কি ভেবে নিয়ে বলল, 'আচ্ছা, আপনার সব কথার উত্তর দিচ্ছি, কিন্তু তার আগে আপনি আমার কয়েকটা কথার উত্তর দিন।'

বাসনার কথা শুনে এবং কথা কওয়ার মধ্যে একটা অবৈধ উচ্ছ্বাসের ভঙ্গী দেখে একটু বিস্মিত হ'য়ে অমরেশ বলল, 'কি তোমার কথা?

'পারুলকে কলকাতায় এনেছেন?

'হ্যাঁ এনেছি।'

'কোথায় রেখেছেন তাকে?'

'অনুমতি-মাসিকে তো জান, অনুমতি মাসির বাড়িতে রেখেছি।'

'আপনার নিজের বাড়িতে রাখলেন না কেন?'

'এ কথার উত্তর দেওয়ার আগে পারুলের ইতিহাস তোমাকে একটু শোনানো দরকার।'

'না, তার ইতিহাস শোনবার আমার একটুও দরকার নেই। তবে তার বিষয়ে একটা কথা জানবার আছে। সে কি রকম ঘরের মেয়ে? ভদ্রঘরের?'

এবার অমরেশ একটু কঠিন ভঙ্গী ধারণ করল, বলল, 'তার ইতিহাস শোনবার যদি তোমার একটুও দরকার না থাকে, তা হলে সে ভদ্রঘরের মেয়ে কি না তা জানবারই বা তোমার কি দরকার থাকতে পারে, সেটা কিন্তু আমার আগে জানা দরকার।'

চরণ এসে চা দিয়ে গেল, আর তার সঙ্গে কিছু খাবার।

চায়ের পেয়ালা আর খাবারের রেকাবটা অমরেশের দিকে একটু ঠেলে দিয়ে বাসনা বলল, 'আগে চা টা খেয়ে নিন, তারপর বলছি।'

অমরেশ মাথা নেড়ে বলল, 'না, না, তোমার কথাটাই আগে বল শুনি। বাড়ি থেকে আসবার সময়ে পূরবী চা আর খাবার এত প্রচুর পরিমাণে খাইয়ে দিয়েছে যে, তোমার এখানে খাওয়াটা শুধু আতিথ্যধর্ম পালনের জন্যই হবে, দরকারের জন্য নয়।'

চায়ের রেকাবটা অমরেশের দিকে ধরে বাসনা বলল, 'তা হলে আতিথ্য-ধর্মটাই আগে পালন করুন কারণ এর পর ঝগড়া বাধলে হয়তো সে ধর্ম পালন করবার শক্তি পাবেন না।'

রেকাবটা হাতে নিয়ে অমরেশ বলল, 'তুমি কি মনে কর, সে ঝগড়া বাধাতে তুমি এখনো বাকি রেখেছ?'

বাসনা বলল, 'যদি বাধিয়ে থাকি তো এ সূচনা মাত্র। ভাল করে বাধলে, ঝগড়াটা গুরুতর রকমেরই হয়তো হবে।

নোটিশ দিচ্ছ?'

'তা দিচ্ছি। কিন্তু আপনি আগে খেয়ে নিন, তারপর অন্য কথা।'

চায়ের পেয়ালায় একটা চুমুক দিয়ে অমরেশ বলল, বলি দেবার আগে পুরুত যেমন পাঁটাকে নৈবিদ্যি খাইয়ে নেয়, এও কতকটা সেই রকম না-কি?'

এ কথার কোনও উত্তর না দিয়ে বাসনা খাবারের রেকাব থেকে একটা নিমকি নিয়ে অমরেশের হাতে তুলে দিল।

খাওয়ার পালাটা সংক্ষেপে এবং সত্বর শেষ হল।

অমরেশ বলল, 'আর গৌরচন্দ্রিকা করে বিশেষ কোনো লাভ নেই। সমাজের আদালতে আমার বিরুদ্ধে তোমার কি নালিশ তা আমি বুঝতে পেরেছি। পারুল ভদ্রঘরের মেয়ে নয়, সে বেশ্যার মেয়ে।'

হঠাৎ বজ্রপাত হলেও বোধ করি বাসনা এতটা চমকিত হত না। ঘৃণা-সঙ্কুচিত মুখে তীক্ষ্ণস্বরে বলল, 'বেশ্যার মেয়ে? আমি শুনেছিলাম ভদ্রঘরের মেয়ে নয় কিন্তু তাই বলে এতটা যে নীচ তা জানতাম না।'

অবিচলিত সহজ কণ্ঠে অমরেশ বলল, 'নীচ কি-না বলতে পারি না, কিন্তু সে যে বেশ্যার মেয়ে তাতে সন্দেহ নেই।'

অমরেশের এই পরিপূর্ণ নিশ্চাঞ্চল্যের ঔদ্ধত্যে বাসনার আপাদমস্তক একেবারে জ্বলে উঠল; তীব্র কণ্ঠে বলল, 'না, নীচ নয়, একেবারে মহৎ! সেই বেশ্যার মেয়েটাকে আপনি হারিদ্বার থেকে কাঁধে করে কলকাতায় নিয়ে এসেছেন।'

'নিয়ে এসেছি, কিন্তু কাঁধে করে নয়, সঙ্গে করে।

অমরেশের বিদ্রূপগর্ভ মন্তব্য শুনে বাসনার চক্ষুর মধ্যে অগ্নিকণা দেখা দিল। বলল, 'আর সেই বেশ্যা মেয়েটাকে নিয়ে আপনি সমস্ত জীবন কাটাবেন স্থির করেছেন!'

অমরেশ বলল, 'তেমন কিছু সঙ্কল্প করি নি, কিন্তু যদি প্রয়োজন হয়, কাটাতে হবে। আশ্রয় যখন দিতে হয়েছে, তখন অন্য আশ্রয় যতক্ষণ না হবে ফেলতে পারব না তো।'

"শরণাগত!"

অমরেশের মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিল; বলল, 'শরণে যখন এসেছে তখন শরণাগত বলতে পার বইকি। কিন্তু তুমি এত রাগ করছ কেন বলত? পারুলকে আশ্রয় দেওয়াতে তোমার কি ক্ষতি হয়েছে তা তো বুঝতে পারছি না। তা ছাড়া আমার ওপর তোমার যখন কোন আত্মীয়তা নেই বলছ, তখন আমার আচরণ নিয়ে আমাকে তিরস্কার করছ কোন্ অধিকারে? আমি তোমাকে পড়াই, আর তার জন্যে তোমার বাবা আমাকে একটা মোটা টাকা পারিশ্রমিক দেন, ব্যাপার তো এই। এর মধ্যে তোমার মনের মতন হয়ে চলবার বাধ্যতা আমার কেমন করে আসে, তা তো বুঝতে পারি না!'

এই নিরস নিষ্ঠুর, কিন্তু অকাট্য যৌক্তিকতার বিরুদ্ধে কি বলবে তা সহসা ভেবে না পেয়ে একটা উৎকট লজ্জার দীনতায় বাসনার মুখমণ্ডল রক্তহীন হয়ে গেল। কিন্তু পর-মুহূর্তেই একটা কথা মনে হওয়ায় তীব্রভাবে সে অমরেশকে আক্রমণ করল; বলল, 'যেমন বললেন ব্যাপারটা সেই রকমই বটে, কিন্তু আমাকে পড়াবার জন্যে বাবা যাঁকে মাসে মাসে মোটা টাকা পারিশ্রমিক দেন, সমাজে তাঁর আচরণটা ভদ্রলোকের মত হবে—এ আশা বাবা করতে পারেন না কি?'

ঈষৎ অপ্রতিভভাবে অমরেশ বলল, 'আমাকে ক্ষমা করো বাসনা, এ কথাটা আগে আমার খেয়াল হয় নি। এই যদি তোমার দুশ্চিন্তা, তা হলে আগে আমাকে এ কথাটা খুলে বলতে ইতস্তত করছিলে কেন? তোমার কোনো চিন্তা নাই, এখনি আমি তোমাকে এ বিপদ থেকে উদ্ধার করছি।' বলে টেবিলের উপরে রাখা একটা চিঠির কাগজের প্যাড টেনে নিয়ে বাসনার বাবার নামে একটা ক্ষুদ্র চিঠি লিখল: শ্রদ্ধাস্পদেষু, অতঃপর আমার আর আপনার কন্যা বাসনাকে পড়ানোর সুবিধা হবে না। অনুগ্রহ করে আমাকে ক্ষমা করবেন। হরিদ্বার যাবার আগে যেদিন পর্যন্ত আমি তাঁকে পড়িয়েছি তারপর থেকে আর কোন পারিশ্রমিকই আপনার কাছে আমার পাওনা রইল না। ইতি, অনুগত শ্রীঅমরেশ মুখোপাধ্যায়। তারপর চিঠিখানা বাসনার হাতে দিয়ে বলল, 'কেমন, এই হলেই হবে তো?'

চিঠিখানার উপর দ্রুতবেগে চোখ বুলিয়ে বাসনার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল; অমরেশের মুখের উপর একবার ত্বরিত দৃষ্টিপাত করে অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে মৃদুস্বরে বলল, 'হবে।'

অমরেশ বলল, 'আচ্ছা, তা হলে আমি এখন চললাম। কিন্তু যাবার আগে একটা কথা তোমাকে বলে যেতে চাই। তোমার আজকের আচরণে যত না আমি ব্যথিত হয়েছি, তার চেয়ে অনেক বেশি বিস্মিত হয়েছি। পারুলের ব্যাপারটা কোন্ দিক দিয়ে যে তোমাকে এত গুরুতর ভাবে আঘাত দিল, আমাকে বিশ্বাস কর বাসনা, আমি তা বুঝতে পারছি না। তোমার যতদূর পরিচয় আমি—'

অমরেশকে তার কথার মধ্যে সহসা থামিয়ে দিয়ে বাসনা বলল, 'আমার পরিচয়ের কথা পরে হবে, আগে আপনাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। আপনি তো মস্ত জ্ঞানী পুরুষ, চার্বাকের আপনি শিষ্য, ঈশ্বর মানেন না। আচ্ছা, ঈশ্বরকে না হয় চোখে দেখা যায় না, ঈশ্বর না-ই মানলেন,—কিন্তু সমাজও কি আপনি মানেন না? পাপ-পুণ্য ভাল-মন্দর বিচার কি আপনার কাছে নেই?'

বাসনার কথা শুনে অমরেশ মৃদু হাস্য করল; তারপর এক মুহূর্ত মনে মনে চিন্তা করে বলল, 'তোমার এই বিচলিত অবস্থায় এ-সব বিষয় নিয়ে তর্ক করে লাভ কিছু হবে বলে মনে করি না।'

উষ্মাসহকারে বাসনা বলে উঠল, 'না না, 'বিচলিত অবস্থা' বলে কথাটাকে এড়িয়ে গিয়েও কোনো লাভ নেই। বলুন না, আপনি কি সমাজও মানেন না?'

সহসা অমরেশ যেন উচ্ছ্বলিত হয়ে উঠল; গাঢ়নিবদ্ধ স্বরে সে বলল, 'কিন্তু তুমিই কি সমাজ মান বাসনা? জান না কি কত হাঙ্গর-কুমীর, কত সাপ-বিছে, কত বাঘ-ভালুক বাস করছে সমাজের ভিতরে? দিচ্ছ কি তুমি তাদের সমাজ থেকে বার করে? তাদের নিয়ে তুমি পংক্তি-ভোজন করছ,

আর বলছ, পারুলের মত একজন নিরপরাধ হতভাগিনী মেয়ের সমাজের একটা কোণেও স্থান নেই! অথচ তার অপরাধের মাত্রা বিচার করবার জন্য তার জীবনের যে ইতিহাসটুকু শোনা একান্ত কর্তব্য, তা শুনতে তুমি একেবারেই প্রস্তুত নও।'

সমস্ত ঘরটা অমরেশের গভীর উদাত্ত কণ্ঠের শব্দে এবং অর্থে চকিত হয়ে উঠল। স্তব্ধ হয়ে বাসনা নতমুখে বসে রইল; তার মুখ দিয়ে কোন কথা নির্গত হল না।

এক মুহূর্ত নীরব থেকে অমরেশ বলতে লাগল, 'জান কি বাসনা, কত বড় জগতে তুমি বাস কর? জান কি নতুন-আবিষ্কৃত শক্তিশালী দূরবীনের সাহায্যে আট হাজার বিলিয়ন মাইলের দূরের জগতেরও সন্ধান পাওয়া গেছে? আট হাজার বিলিয়ন মাইল কি ব্যাপার তার ঠিকমত ধারণা করতে পার কি? এই বিরাট বিশাল জগতের অধিবাসিনী হয়ে তোমার মনের জগৎও যথেষ্ট বিস্তীর্ণ হবে না কেন, তা আমাকে বলতে পার?'

এবার বাসনা উত্তর দিল; বলল, 'বলতে পারি। আমি আপনার আট হাজার বিলিয়ন মাইল জগতের অধিবাসিনী নই। আমি এই আট হাজার মাইল সামান্য পৃথিবীর বাংলা দেশের সঙ্কীর্ণহৃদয় প্রাণী।'

প্রবলভাবে মাথা নাড়া দিয়ে গভীর কণ্ঠে অমরেশ বলল, 'তুমি তা নও, তা নও। আমি জানি, তুমি তা নও। সমাজের কথা তুমি যা তুলেছ, সে তোমার ছলনার কথা—সে তোমার মনের কথা নয়। সমাজ তো শুধু তোমারই নয় বাসনা। মা, পূরবী, অনুমতি মাসি—সমাজ তো তাদেরও! তাদের তেমন বাধল না; তোমারই বা এত বাধে কেন? তুমি অসঙ্কোচে আমাকে খুলে বল, কি তোমার দুঃখ, কোথায় তোমার আপত্তি?'

অমরেশের কথা শুনে বাসনার দুই চক্ষু বিদীর্ণ করে জল ভরে এল। হায়, অমরেশের প্রশ্নের কি উত্তর সে দেবে, সে যখন নিজেই ঠিক জানে না, কি তার

দুঃখ, কোথায় তার আপত্তি! মনের কুজ্ঝটিকার মধ্যে সমস্তই অস্পষ্ট! অনুভূতি আছে, উপলব্ধি নেই! আপত্তি আছে, যুক্তি নেই!

গাড়ি-বারান্দায় একটা মোটর থামার শব্দ হল এবং একটু পরেই ঘরে প্রবেশ করলেন গগনবিহারী।

তাড়াতাড়ি চেয়ার ছেড়ে উঠে অমরেশ নিজেকে যথাসম্ভব সম্বৃত করে নিয়ে বলল, 'এই যে মেজদাদা! ভাল আছেন তো? তারপর এগিয়ে গিয়ে গগন-বিহারীর পদধূলি গ্রহণ করল!

অমরেশ এবং গগনবিহারীর একই গ্রামে আদি বাড়ী এবং বাল্যকাল থেকে অমরেশ গগনবিহারীকে পল্লীসম্পর্কে 'মেজদাদা' বলে সম্বোধন করে। বড়দাদা ছিলেন গগনবিহারীর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাসবিহারী।

অমরেশের মাথায় হাত রেখে আশীর্বাদ করে গগনবিহারী বললেন, 'কি রে অমর, হরিদ্বার থেকে কবে ফিরলি? আজই না কি?'

অমরেশ বলল, 'হ্যাঁ মেজদা, আজ সকালেই ফিরলাম। তোমার ওখানে সন্ধ্যার পর যাব মনে করেছিলাম—'

'এমন সময়ে আমিই এসে পড়লাম। একেই বলে—যোগাযোগ।' বলে গগনবিহারী উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন। তারপর বললেন, 'তা বেশ তো, চল্ না আমার সঙ্গে। আমি দশ-পনের মিনিট পরেই ফিরছি। রাত এগারটা পর্যন্ত দস্তুরমত আড্ডা দেওয়া যাবে, তারপর একেবারে খাওয়া-দাওয়ার পর বাড়ি পর্যন্ত পৌঁছে দিয়ে যাব। কি বলিস্?'

অমরেশ বলল, আমার কিছুমাত্র আপত্তি নেই মেজদা।'

প্রসন্নমুখে গগনবিহারী বললেন, 'সাধু!' তারপর বাসনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'তুমিও নিশ্চয় যাচ্ছ বাসু?'

একটু ইতস্ততসহকারে বাসনা বলল, 'আমি আজ যেতে পারব না দাদামশায়, আমার আজ একটু কাজ আছে।'

ভ্রূকুঞ্চিত করে বিস্ময়বিমূঢ়কণ্ঠে গগনবিহারী বললেন, 'কি তোমার এমন গুরুতর কাজ আছে শুনি, যা আড্ডা দেওয়ার মত অকাজের চেয়ে বড় হল। তারপর হঠাৎ একটা কথা মনে উদয় হওয়ায় প্রথমে বাসনার, পরে অমরেশের মুখের ভঙ্গী নিবিড়ভাবে লক্ষ্য করে বললেন, 'ব্যাপার কি বল দেখি? আজকের গুরু-শিষ্যা সংবাদটা যেন কেমন কেমন ঠেকছে। যুদ্ধ বিগ্রহের মত কিছু নয় তো? অমরেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'তা এমন কিছু আশ্চর্যের কথা নয়। যে রকম প্রোভোকেশন তুমি দিয়ে রেখেছ, তাতে ও রকম একটা ব্যাপার খুবই সম্ভব।'

অমরেশ বলল 'আমি কিন্তু কোনো রকম প্রোভোকেশন স্বীকার করি নে মেজদা।'

গগনবিহারী বললেন, 'তুই তো অস্বীকার করবিই; সেটা কিন্তু সাব্যস্ত হবে বিচারের দ্বারা। তারপর বাসনার হাতে অমরেশের চিঠিখানায় দৃষ্টি পড়ায় বললেন, 'ও বস্তুটা কি? ঘোষণাপত্র না-কি? যদি গুরুতর আপত্তি না থাকে তাহলে দেখতে পারি কি ওটা? বলে চিঠিখানার দিকে ধীরে ধীরে হাত বাড়ালেন।

আপত্তি তো বাসনার কিছুমাত্র দেখা গেল না, বরং তার হাতটা যেন গগন-বিহারীর হাতের দিকে আধ ইঞ্চিটাক এগিয়ে গেল বলেই মনে হল। এই সহসাগত অপ্রীতিকর সমস্যাটাকে অপরের হাতে তুলে দিতে পারলেই যেন সে বাঁচে।

পকেট থেকে চশমাটা বার করে চিঠিখানা পড়ে গগনবিহারী বললেন, 'সর্বনাশ! ব্যাপারটা যে একেবারে সঙিন অবস্থায় উপস্থিত হয়েছে দেখছি। নাঃ, আর কথা নেই। উভয় পক্ষই আমার সঙ্গে চল। আজই এর চূড়ান্ত নিষ্পত্তি হবে। যদিও অভিযোগটা 'প্রপার জুরিস্‌ডিক্‌শনে'ই দায়ের করা হয়েছে, কিন্তু ব্যাপারটা অত্যন্ত গুরুতর বলে এর বিচার হবে 'হাইকোর্ট অফ

গ্রাণ্ডপেটার্নাল জুডিকেচার'-এ। নাও উভয়পক্ষ নিজ নিজ দলিল দস্তাবেজ নিয়ে প্রস্তুত হয়ে নাও—আমি অপর্ণার সঙ্গে একটা কথা সেরে এখনি আসছি।' বলে পর্দা ঠেলে অন্দরে প্রবেশ করলেন।

১২

অমরেশ এবং বাসনার সহিত গগনবিহারী যখন তাঁর শ্যামপুকুরের গৃহে উপনীত হলেন, তখন রাত্রি প্রায় সাড়ে আটটা। গাড়ি-বারান্দায় মোটর দাঁড়াতেই সম্মুখের বারান্দায় আলোগুলো জলে উঠল। বারান্দায় উঠে গগনবিহারী লক্ষ্য করলেন, পশ্চিম দিকের বসবার ঘরে আলো জলছে। নিকটেই একজন ভৃত্য অপেক্ষা করছিল, তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও-ঘরে আলো জলছে কেন রে? কেউ আছে না কি ঘরে?'

ভৃত্য বলল, 'আজ্ঞে হাঁ, একটি সাহেব লোক আপনার সাথে দেখা করবার লেগে অপিক্ষে করছে।'

বিস্ময়োৎফুল্ল কণ্ঠে গগনবিহারী বললেন, 'এত রাত্রে সাহেব লোক আবার কে এল!' তারপর ঈষৎ কৌতুহলের সহিত সেই দিকে অগ্রসর হলেন।

শেষ পর্যন্ত যাবার কিন্তু প্রয়োজন হ'ল না। 'সাহেব লোক নয় দাদামশায়, কালা আদমি'—বলে একটি ইয়োরোপীয়-বেশধারী উগ্র গৌরবর্ণ যুবক সহাস্যমুখে ঘর থেকে বেরিয়ে এল, তারপর গগনবিহারীর পশ্চাতে অমরেশ এবং বাসনাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'এই যে আপনারাও এসেছেন! নমস্কার।'

অমরেশ এবং বাসনা উভয়েই যুক্তকরে প্রতি-নমস্কার জ্ঞাপন করল।

গগনবিহারী বলল, 'কালা আদমির জাত বটে, কিন্তু কালা আদমি নয় নরেন। বিধাতাপুরুষ তোমাকে ইয়োরোপে না পাঠিয়ে ভারতবর্ষে পাঠিয়ে কালা আদমির মুখ খানিকটা উজ্জ্বল করেছেন। কিন্তু সে কথা যাক, কতক্ষণ এসেছ বল?'

এই নরেন যে নরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, যার সহিত বাসনার বিয়ের কথা প্রায় স্থির হয়ে আছে, সে কথা বোধ করি না বললেও চলে। নরেন বলল, 'বেশিক্ষণ আসি নি দাদামশায়, মিনিট পনের-কুড়ি এসেছি। কিন্তু এখন আমি চললাম।'

বিস্ময়চকিত কণ্ঠে গগনবিহারী বলল, 'এসেছিলেই বা কি জন্য, আর চললেই বা কেন, এ তো আমি কিছুই বুঝতে পারছি নে নরেন।'

গগনবিহারীর কথা শুনে নরেন এক মুহূর্ত কি চিন্তা করল, তারপর মৃদুস্মিত মুখে বলল, 'এসেছিলাম আপনাকে একটা কথা বলব ব'লে আর চললাম আজ সেই কথাটা বলার সুবিধা হবে না বলে।'

'কেন, সুবিধা হবে না কেন?

'আজ আপনারা ব্যস্ত আছেন, আজ থাক্, আর একদিন আসব।'

গগনবিহারী কোনো উত্তর দেবার আগে বাসনা বলল, 'আমি বাড়ির ভিতর চললাম দাদামশায়, আপনারা বসে কথাবার্তা কন।'

বাসনাকে বাধা দিয়ে গগনবিহারী বললেন, 'ব্যাপারটা যে-রকম জটিল মনে হচ্ছে তাতে তুমি বাড়ির ভিতর গেলেই যে সরল হবে, তা বোধ হয় না বাসু। বরং—' কথাটা শেষ না করে তিনি অমরেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে কি ভাবে কথাটা শেষ করবেন বোধ হয় চিন্তাই করতে লাগলেন।

অমরেশ কিন্তু সন্ত্রস্ত হয়ে উঠল; বলল, 'সর্বনাশ মেজদা। 'বরং' ব'লে আমার দিকে তাকিয়ে অত কী ভাবছেন?—তা হলে যত-কিছু জটিলতা আমিই

সৃষ্টি করেছি না-কি ? তা যদি করে থাকি তো আমিই না-হয় আজ বিদায় নিই।'

অমরেশের কথার ভঙ্গিতে একটা উচ্চ হাস্যধ্বনি উত্থিত হল, এমন কি দেখা গেল বাসনারও মুখ হাস্যস্ফুরিত হয়ে উঠেছে।

গগনবিহারী বললেন, 'জটিলতার সৃষ্টি যদি হয়ে থাকে তো চিরকাল যিনি সৃষ্টি করেন তিনিই করেছেন, তার জন্য তোমাদের লজ্জিত হবার কারণ নেই। আমি বলছিলাম, বরং তোমরা দুজনে গুরু-শিষ্যায় ওপরের বারান্দায় গিয়ে একটু বস, আমি ততক্ষণ নরেনের সঙ্গে কথাটা সেরে নিই।'

নরেন কিন্তু এ প্রস্তাবে একেবারেই স্বীকৃত হল না ; বলল, 'না দাদামশায়, তাড়ার মুখে শেষ করবার মত আমার কথাটা সামান্য নয়। আপনার যদি অসুবিধা না হয়, পরশু ঠিক এই সময়ে আসব,—কিন্তু আজ থাক।'

গগনবিহারী বলল, 'আচ্ছা, তাই তা হলে এসো। কিন্তু খানিকটা বসে চা-টা খেয়ে যেয়ো।'

নরেন বলল, 'তা ও না দাদামশায়, চা-টা যা-কিছু সবই পরশু ; আজ কিছুই নয়। আজ আমি চললাম।'

গগনবিহারী দেখলেন, জোর করে নরেন্দ্রকে ধরে রেখে কোনো লাভ নেই। অমরেশ এবং বাসনার মধ্যে সুরের বিরোধ আজ যদি একান্তই ঘটে থাকে তো সে বিরোধ একই সপ্তকের অন্তর্গত, সুতরাং তার মধ্যে এমন একটা শ্রেণীগত যোগ আছে যার জন্য উভয়ের মধ্যে বিবাদ সম্ভব হ'লেও মীমাংসাও অসম্ভব নয়। কিন্তু নরেনের বেসুরা মনে হয় একেবারে ভিন্ন জাতীয়। তাকে নিয়ে আজ দল বাঁধলে দলটা ব্যর্থই হবে ; পরস্পরের মধ্যে যোগস্থাপনার কোন সূত্রই, তা সে বিরোধীরই হোক অথবা ঐক্যেরই হোক, আবিষ্কার করা সহজ হবে না। সুতরাং আর অধিক পীড়াপীড়ি না করে গগনবিহারী বলল, 'তা হলে তথাস্তু। পরশু তোমার আশায় অপেক্ষা করব।'

নরেন্দ্র চলে গেল, কিন্তু যাবার আগে এমন একটু আলোড়নের সৃষ্টি করে গেল যার তরঙ্গ-ভঙ্গ সহজে মিলিয়ে গেল না। বাসনা এবং অমরেশের উপস্থিতির জন্য গগনবিহারীর সহিত তার দেখা করতে আসা যে ব্যর্থ হয়ে গেল, তার সুস্পষ্ট অভিব্যক্তি তিনজনেরই মনের মধ্যে একটা গ্লানির সঞ্চার করল। সমস্ত ব্যাপারটা, যা একটা সুষ্ঠু পরিণতির প্রত্যাশায় গতিশীল হয়ে উঠেছিল, অনতিক্রমণীয় মন্থরতায় খানিকটা যেন পেছিয়ে গেল।

গগনবিহারী বলল, 'চল, ওপরের বারান্দায় গিয়ে আমাদের বিচার-বৈঠকের অধিবেশন আরম্ভ করা যাক্।'

বাসনার কণ্ঠে একটা অনৌৎসুক্যের সুর ধ্বনিত হল; বলল, 'আমি কিন্তু এখন কিছুক্ষণের জন্য বাড়ির ভিতর চললাম দাদামশায়।'

'কেন? আবার বাড়ির ভিতর কেন?'

মামিমাদের সঙ্গে দেখা করতে!'

মামিমাদের সঙ্গে দেখা করতে দশ মিনিটের বেশি লাগা উচিত নয়,—তবে 'কিছুক্ষণ' বলছ কেন?'

গগনবিহারীর কথা শুনে বাসনা হেসে ফেলল; বলল, 'তা দশ মিনিট কি কিছুক্ষণ সময় নয়?'

গগনবিহারী বললেন, 'কিন্তু মেয়েদের 'কিছুক্ষণ' পুরুষদের 'অনেকক্ষণ' যে বাসু! পুরুষমানুষের আড়াই মিনিটে স্ত্রীলোকের এক মিনিট; এ কি তুমি জান না?'

অন্য সময় হলে এ কথা নিয়ে বাসনা হয়তো অনেক বচসা-বিবাদ করত, এখন শুধু তার মুখমণ্ডলে একটা অবরুদ্ধ হাস্যের ক্ষীণ আভা দেখা দিল; বলল, 'এতদিন জানতাম না—আজ জানলাম।' তারপর অন্দরের পথে গমনোদ্যত হয়ে বলল, 'আচ্ছা, পুরুষমানুষের দশ মিনিটেই হাজির হতে চেষ্টা করব

কার্যত কিন্তু তা হয়ে উঠল না। বাসনা যখন দ্বিতলের বারান্দায় উপস্থিত

হল, তখন বিশ মিনিটেরও অধিক সময় অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। অবশ্য ইতিমধ্যে বাহিরে অমরেশ এবং গগনবিহারীর, এবং ভিতরে তার নিজের, চা-পানাদি কার্য সমাধা হয়েছে।

অন্দর থেকে বাসনা ফিরে এল খানিকটা স্বাচ্ছন্দ্যের লঘুতা বহন করে। এ লঘুতা তার অকপট অথবা যত্ন-প্রসূত সে কথা নির্ণয় করা অবশ্য কঠিন। গগনবিহারীর পাশে একটা চেয়ার টেনে নিয়ে উপবেশন করে বলল, 'হুজুরে হাজির হলাম দাদামশায়।'

গগনবিহারী বললেন, 'তা অবশ্য হলে, কিন্তু বিলম্ব করে হলে। শুধু তুমি স্ত্রীলোক বলে তোমার অনুপস্থিতিতে মামলা নিষ্পত্তি না করে তোমার প্রতি বিশেষ অনুগ্রহ দেখানো হয়েছে।'

বাসনা বলল, 'আমার তো মনে হয় দাদামশায়, আমার অনুপস্থিতিতে মামলা নিষ্পত্তি করলে আমার প্রতি আরও বেশি অনুগ্রহ দেখানো হত।'

ভ্রুকুঞ্চিত করে গগনবিহারী বললেন, 'তা হলে কি তুমি এই চাও যে, বিবাদিনীকে তলব না করেই বাদীর প্রার্থনা নামঞ্জুর করা উচিত ছিল?'

বাসনা বলল, 'আমি কি চাই বা না চাই তা কিছুই বলতে চাই নে।'

'অর্থাৎ তুমি এ বিষয়ে সম্পূর্ণ মৌনতা অবলম্বন করতে চাও। কেমন তাই না?'

বাসনা বলল, 'হ্যাঁ, তাই।'

গগনবিহারী বললেন, 'শাস্ত্রে বলে—মৌনং সম্মতিলক্ষণং। তা হলে শেষ পর্যন্ত তো সেই কথাই দাঁড়াচ্ছে বাসু।'

ঔৎসুক্যব্যগ্র মুখে বাসনা জিজ্ঞাসা করল, 'কি কথা?'

'তুমি চাও যে, বিবাদিনীকে তলব না করেই বাদীর প্রার্থনা নামঞ্জুর করা উচিত ছিল। কেমন, তাই দাঁড়াচ্ছে না?'

গগনবিহারীর যুক্তি-পদ্ধতি দেখে অমরেশ হো-হো করে হেসে উঠল; বলল, 'জয় হোক মৌনং সম্মতিলক্ষণের!'

বাসনার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল ঈষৎ স্খলিত কণ্ঠে সে বলল, 'যখন হাকিম ছিলেন, তখন কি আপনি এই রকম করে বিচার করতেন দাদামশায় ?'

গগনবিহারী বললেন, 'সব সময়েই কি করতাম ভাই ? তোমার মত বিবাদিনী পেলে করতাম। তোমার মত বিবাদিনীর জন্য যে-কোনো বাদীর সর্বনাশ করতে ইতস্তত করতাম না, এ আমি শপথ করে বলতে পারি।'

গগনবিহারীর উক্তি শুনে অমরেশের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল, উৎকণ্ঠিত স্বরে বলল, 'বলেন কি মেজদা! তা হলে তো আপনার হাতে সুবিচারের কোনো প্রত্যাশা নেই আমার।'

গগনবিহারী বললেন, 'কে বলল নেই ? বিবাদিনীর প্রতি পক্ষপাতিত্ব করলে সব সময়েই বাদীর প্রতি অবিচার করা হয় না। দীর্ঘকাল হাকিমি করে এ শিক্ষা হয়েছে যে আইনের বিচারই সব সময়ে আসল বিচার নয়, কাজির বিচার বলে যে একটা বিচার-পদ্ধতির কথা শোনা আছে, তার দ্বারা অনেক সময়ে আসল বিচার করা যায়।'

অমরেশ বলল, 'সেই বিচার পদ্ধতি আমাদের উপর চালাবেন নাকি ?'

'প্রয়োজন বোধ করলে চালাব। এখন বর্তমান বিবাদে বাদীর কি বক্তব্য আছে শোনা যাক।'

অমরেশ বলল, 'বাদীর বিনীত নিবেদন এই যে, মহামান্য আদালত কর্তৃক বাদীর প্রার্থনা অবিলম্বে মঞ্জুর করা হোক।'

'কোন্ ওজুহাতে ?'

'বাদীর অযোগ্যতার ওজুহাতে।'

'অর্থাৎ ?'

'অর্থাৎ, বাদীর প্রতি বিবাদিনীর শ্রদ্ধার অভাব ঘটেছে, সুতরাং বিবাদিনীর গুরুর পদে বাদী অধিষ্ঠিত থাকবার অযোগ্য।'

'এ কথা বিবাদিনীর উক্তি অথবা আচরণ থেকে প্রকাশ পায় না সুতরাং অগ্রাহ্য। তোমার আর কিছু বলবার থাকে তো বল।'

'আর কিছু বলবার থাকলেও বলে কোনো ফল নেই, কারণ কাজির বিচার আরম্ভ হয়েছে তা বুঝতে.পারছি।'

'তুমি বুদ্ধিমান, অনুমান যথার্থ করেছ। তোমার আবেদন মায়খরচা নামঞ্জুর হল। বাদী এবং বিবাদিনীর মধ্যে যথাপূর্ব গুরু-শিষ্যার সম্পর্ক বলবৎ রইল।'

অমরেশ বলল, 'মায-খরচাটা কি বুঝলাম না হুজুর। খরচা কি আর কোন্ উপায়ে তার পরিশোধ হবে সেটা বুঝিয়ে দিতে আজ্ঞা হোক।'

গগনবিহারী বললেন, 'হরিদ্বার থেকে বিলম্ব করে ফেরার জন্য বিবাদিনীর পঠন-পাঠনে যে ক্ষতি হয়েছে তার পূরণ হল খরচা,—আর, কিছুকাল অধিকতর পরিশ্রম ও গভীরতর মনোযোগের সহিত বিবাদিনীকে পড়ালে সেই খরচা হবে পরিশোধ।'

অমরেশ বলল, 'এ সুবিচার হল না মেজদা। আমি কিন্তু শীগ্‌গির আপনার কাছে পুনর্বিচারের দরখাস্ত করব।'

গগনবিহারী বললেন, 'কাজির বিচারের বিরুদ্ধে ছানির দরখাস্ত অচল। যা নিষ্পত্তি হল তা একেবারে চূড়ান্ত। তারপর অমরেশের চিঠিখানা জামার পকেটে স্থাপন করে বললেন, 'আরজি-পত্র আদালতের রেকর্ড-রুমে স্থান পেল। অথ বিচার-পর্ব শেষ। এখন হরিদ্বার থেকে কি রকম পুণ্য নিয়ে ফিরলি তা বল্।'

গগনবিহারীর কথা শুনে অমরেশ এক মুহূর্ত চুপ করে রইল, তারপব মৃদুস্মিত মুখে বলল, 'সে কথা আর বলবেন না মেজদা। যে পুণ্য নিয়ে ফিরেছি, তার গুরুভারে মারা পড়বার দাখিল হয়েছি।'

'কেন, মারা পড়বার দাখিল কেন?'

'বোধ হয় আপনাদের ভগবান যে-ভার আমার স্কন্ধে দিয়েছেন তা বহন করবার শক্তি আমার নেই, তাই।'

ভ্রূকুঞ্চিত করে গগনবিহারী বললেন, 'আমাদের ভগবানের ভারি অন্যায় তো ! কতখানি ভার তোমার স্কন্ধে তিনি দিয়েছেন শুনি ?'

অমরেশ বলল, 'হরিদ্বারে রেলে ওঠবার সময়ে তো ওজন করবার দরকার হয় নি, 'কিন্তু দু-দশ সের নয় মেজদা, মণ দেড়েকের কম হবে না।'

সমস্ত কথাবার্তাই রূপকের ভাষায় হচ্ছে সেই ধারণার বশবর্তী হয়ে গগনবিহারী বললেন, 'তা সবটা যদি বহন করতে না পারিস তো কিছু বন্ধু-বান্ধবদের বিলিয়ে দে না।'

অমরেশের মুখে পুনরায় মৃদুহাস্য ফুটে উঠল, বলল, আমি তো দিতে চাই মেজদা, কিন্তু নিতে যে কেউ চায় না।'

গগনবিহারী বললেন, 'সে কথা সত্যি। আজকালকার লোহার বাজারে পুণ্যের বাজার-দর নেই বললেই চলে। পুণ্য আজকাল 'সেলিং অ্যাট এ ডিস্‌কাউণ্ট'।

অমরেশ বলল, 'শুধু বাজারের অপরাধই নয় মেজদা দোকানদারের ব্যক্তিগত 'ক্রেডিট ডিসক্রেডিট'-এর কথাও এর মধ্যে আছে। আমার মত নাস্তিক লোকের কাঁধে বোঝা দেখলেই লোকে মনে করে তা পাপের বোঝা। বোঝা খুলে একবার ভাল করে পরীক্ষা করবার ধৈর্যও থাকে না।'

বাসনা সঙ্কল্প করেছিল, এ আলোচনায় সে যোগ দেবে না নির্লিপ্ত শ্রোত্রী রূপে মৌনাবলম্বন করেই থাকবে। কিন্তু যখন দেখল যে, অমরেশ নিজের ব্যক্তিগত দুঃখ-কষ্টের অনুযোগ অতিক্রম করে রূপকের গূঢ় ভাষার অন্তরাল দিয়ে তার প্রতি আক্রমণ আরম্ভ করল তখন আর সে নীরব থাকতে পারল না। বলল 'কিন্তু এমনি যদি বোঝা থেকে দুর্গন্ধ বেরোতে থাকে তা হলেও কি বোঝা খুলে বাসি-টাটকা পরীক্ষা করবার ধৈর্য থাকা উচিত ?'

আলোচনাটা হঠাৎ জটিল আকার ধারণ করল। অমরেশের উপমায় যা ছিল পাপ-পুণ্য, বাসনার উপমায় তা হল বাসি-টাটকা। এই রূপক-দ্বৈতের সামঞ্জস্য বজায় রেখে তর্ক করা অসম্ভব হল, উপমা পরিত্যাগ করে বস্তুকে-

টেনে বার না করলে আর এক পদও অগ্রসর হওয়া যায় না। এ কথ স্বীকার না করে উপায় নেই যে, পাপ-পুণ্য নির্ণয়ের জন্য যদিই বা বোঝা খুলে দেখবার প্রয়োজন থাকে, যে বোঝা থেকে দুর্গন্ধ নির্গত হয় বাসি-টাটকা নির্ণয়ের জন্য সে বোঝা খোলবার প্রয়োজন সত্যই নেই। বাসনার কথার উত্তরে রূপকের প্রচ্ছন্নতা থেকে বেরিয়ে এসে সরল কথায় কি বলবে সহসা স্থির করতে না পেরে অমরেশ বিমূঢ় ভাবে তাকিয়ে রইল।

এই 'বোঝা' কথাটি সম্পর্কে বাসনার তীব্র প্রতিবাদ শুনে এবং তার ফলে অমরেশের সুস্পষ্ট বিহ্বলতা লক্ষ্য করে গগনবিহারীর মনে একটা গভীর খটকার উদয় হল। বাসনার প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'বোঝা বোঝা' করে তোমরা দুজনে হঠাৎ যুদ্ধ বাধিয়ে দিলে, এই 'বোঝা' জিনিসটা সত্যি করে কি বল্ তো বাসু ?'

বাসনা বলল, 'আমি জানি নে, যাঁর বোঝা তাঁকে জিজ্ঞাসা করুন।'

অমরেশের প্রতি গগনবিহারী দৃষ্টি সঞ্চালিত করবামাত্র প্রশ্নের জন্য অপেক্ষা না করে অমরেশ বলল, 'বোঝা হচ্ছে—পারুল নামে একটি বেশ্যার মেয়ে।'

শুনে গগনবিহারীর চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল, বললেন, 'বলিস কি অমর! তোর বোঝা থেকে শেষকালে এই জিনিস বেরুল নাকি? তা দেড় মণ যে বলছিলি, সে কি তারই ওজন ?'

স্মিতমুখে অমরেশ বলল, 'ওজন করে দেখি নি মেজদা, আন্দাজে বলেছি।'

বাসনার দিকে দৃষ্টিপাত করে গগনবিহারী বলল, 'যাই হোক, বেশ একটু সবল সুস্থ বলেই তো মনে হচ্ছে।'

রুষ্টমুখে বাসনা বলল, 'তাঁকে দেখবার সৌভাগ্য আমার হয় নি।'

অদূরে দেখা গেল দীর্ঘপদে দীনবন্ধু অগ্রসর হচ্ছে। নিকটে এলে গগনবিহারী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি দীনবন্ধু? কি সংবাদ ?'

'আজ্ঞে, একটু গা তুলতে হবে—খাবার দেওয়া হয়েছে।'

গগনবিহাবী বললেন, 'সেই কথাই ভাল—খাওয়াটা সেবে আসা যাক। কিন্তু অমব, তোব পুনর্বিচাবেব আবেদন মঞ্জুব, আজই খাওয়া-দাওয়াব পব বিচাব হবে। বিবাদেব বাকি বেখে কোনো লাভ নেই।'

অমবেশ বলল, 'যো হুকুম অধীন বাজি আছে।

১৩

আহাবেব পব গগনবিহাবী এব অমবেশ ব বান্দায এসে। বসল দীনবন্ধু সুবৃহৎ আলবোলায তাওয়া চড়িযে নলেব প্রান্তটি প্রভুব দক্ষিণ হস্তে ধবিযে দিল। দিনেব মধ্যে মাত্র দুবা ব প্রধান আহাবেব পব গগনবিহাবী আলবোলায তাম্রকুট সেবন কবেন, অন্য সমযে প্রধানত সিগাব এবং কখন কখন সিগাবেটেব দ্বাবা কার্য সম্পন্ন হয।

দু-চাব বাব আলবোলায টান দিযে প্রতীক্ষাবত দীনবন্ধুকে সম্বোধন কবে গগনবিহাবী বললেন, 'কি বে, দাঁড়িযে বইলি যে?'

দীনবন্ধু বলল, 'আজ্ঞে, ধবেছে কি না তাই দেখছি।'

গগনবিহাবী ধমক দিযে উঠলেন, 'পুড়ে শেষ হযে এল, আব বলে কি-না, ধবেছে কি-না তাই দেখছি! আবও গোটাকতক টান দিযে আনবাব মতলব বুঝি?'

বিস্মযচকিত স্ববে দীনবন্ধু বলল, 'কি যে বলেন কর্তা। ফুঁ দিয়ে দিযে হাযবান হযে গেলাম, আব বলেন কি-না—টান। উচ্ছিষ্ট কবে ব্রাহ্মণকে খেতে দিলে ধর্মে সইবে কি?'

গগনবিহারী বললেন, 'উঃ, ধর্মপুত্র যুধিষ্ঠির !—এদিকে শুনে যা।'

প্রস্থানোদ্যত দীনবন্ধু ফিরে দাঁড়িয়ে প্রশান্ত কণ্ঠে বলল, বলুন।'

প্রভুর সহিত এবম্বিধ সদালাপে সে এতই অভ্যস্ত যে, কিছুপূর্বে কতকটা অভিনয়েরই ছলে তার কণ্ঠস্বরে যে বিস্ময়ের সুর জেগে উঠেছিল মুহূর্তের মধ্যে এক পাক ঘুরেই তা একেবারে নিঃশেষে অন্তর্হিত হয়েছে।

গগনবিহারী বললেন, 'মা-মণি কি করছে?'

'মা-মণিরা এখনও খাচ্ছে।'

'এখনও খাচ্ছে? কি এত খাবার তারা পেল?'

বিস্ময়বিস্ফারিত চক্ষে দীনবন্ধু বলল, 'শোন কথা! এ সংসারে আবার খাবার অভাব! তা ছাড়া, পুরুষমানুষ তো নয় যে, পেলে আর খেলে। পাঁচটা মেয়েলোক একোত্তোর হলে দু-চারটে গল্পগুজোব হয়েই থাকে।'

গগনবিহারী বললেন, 'ঢের হয়েছে, যাও। তোমাকে আর তত্ত্বকথা প্রচার করতে হবে না।'

'ডেকে দোব না-কি?'

'না, ডাকতে হবে না,—সে আপনিই আসবে অখন।'

দীনবন্ধু প্রস্থান করলে গগনবিহারী ক্ষণকাল ধীরে ধীরে আলবোলার নল টানতে টানতে নীরবে কি চিন্তা করতে লাগলেন; তারপর সহসা এক সময় চিন্তাস্বপ্ন থেকে জাগ্রত হয়ে ডাক দিলেন, 'অমরেশ।'

অমরেশেরও মন নানাবিধ অসম্বদ্ধ চিন্তাজালে আবদ্ধ ছিল; চকিত হয়ে উত্তর দিল, 'মেজদা!'

'নরেনের সঙ্গে বাসনার বিয়ের কথা প্রায় স্থির হয়ে আছে তা তুই জানিস?'

'হ্যাঁ, জানি বইকি!'

মনে মনে একটু কি চিন্তা করে গগনবিহারী জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ বিয়েতে বাসনার বেশ আগ্রহ আছে কি-না সে খবর কিছু বলতে পারিস?'

মাথা নেড়ে অসংশয়ের কুণ্ঠাহীন কণ্ঠে অমরেশ বলল, 'না, তা বলতে পারি নে, কোনোদিনই তার সঙ্গে এ প্রসঙ্গ হবার কারণ ঘটে নি। কিন্তু মেজদা, এ বিয়েতে তো বাসনার অনাগ্রহের কোনো কারণ থাকবার কথা নয়। রূপে গুণে অর্থে নরেনবাবুর মত আর একটি পাত্র হঠাৎ খুঁজে বার করা কঠিন।'

এক মুহূর্ত নীরব থেকে আলবোলায় গোটা কতক দীর্ঘ এবং দ্রুত টান দিয়ে গগনবিহারী বললেন, 'মানুষের মন, বিশেষত মেয়েমানুষের মন, এমন গোলমেলে জিনিস যে, কিসে যে তার আগ্রহ জাগে আর কিসে জাগে না সময়ে সময়ে তা নির্ণয় করা ভারি শক্ত ব্যাপার। মেয়েদের মধ্যে অনেকের এমন চুম্বকধর্মী মন আছে যা লোহার প্রতিই আকৃষ্ট হয়, সোনা রূপোর প্রতি হয় না।'

গগনবিহারীর মন্তব্যে মনে মনে কৌতূহলী হয়ে অমরেশ বলল, 'কিন্তু এ ক্ষেত্রে তেমন কোনো লোহার অস্তিত্ব নেই বলেই তো মনে হয় মেজদা।'

'কোন্ ক্ষেত্রে?'

'বাসনা আর নরেনবাবুর ক্ষেত্রে।'

আলবোলায় গোটা দুই মৃদুমন্দ টান দিয়ে গগনবিহারী বললেন, 'শ্রীমান সোনারামের প্রতি যখন আগ্রহের এত অভাব দেখা যাচ্ছে তখন এ ক্ষেত্রে শ্রীমান লোহারাম যে কেউ নেই, তা হলপ করে বলতে পারব নে। কিন্তু—'

'কিন্তু' বলেই গগনবিহারী আরব্ধ বাক্যটি শেষ না করে সহসা একেবারে নিঃশব্দতার পাবপূর্ণ ব্রেক কষে দিলেন।

সকৌতূহলে অমরেশ জিজ্ঞাসা করল, 'কিন্তু' কি মেজদা?'

অমরেশের পশ্চাৎ দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে ঈষৎ নিম্নকণ্ঠে গগনবিহারী বললেন, 'কিন্তু শ্রীমতী চুম্বক অদূরে দেখা দিয়েছেন, সুতরাং এ প্রসঙ্গ উপস্থিত একেবারে বন্ধ।'

অমরেশ পিছন ফিরে দেখল, সত্যই বাসনা নিকটে এসে পড়েছে।

গগনবিহারী এবং অমরেশের মধ্যে একটা কোনো বিষয়ে আলোচনা চলছিল যা তার আবির্ভাবের সহিত অসমাপ্ত অবস্থাতেই বন্ধ হয়ে গেল বুঝতে পেরে বাসনা বলল, 'দাদামশায়, আপনাদের যদি তাতে সুবিধা হয় তা হলে আরও কিছুক্ষণ না হয় আমি বাড়ির ভিতর কাটিয়ে আসতে পারি।'

গগনবিহারী বললেন, 'তোমার সৌজন্যের জন্য ধন্যবাদ, কিন্তু তার প্রয়োজন নেই, তুমি বসো। আমরা তোমার জন্যই অপেক্ষা করছিলাম।'

আর কোনও কথা না বলে বাসনা তার পূর্বাধিকৃত আসনে উপবেশন করল। প্রসঙ্গটা যে তাকে নিয়েই চলছিল তদ্বিষয়ে তার কোনো সন্দেহ ছিল না, কিন্তু কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে সে-বিষয়ে কোনো প্রকার আগ্রহ দেখাবে তেমন পাত্রী সে নয়। চেয়ারের পৃষ্ঠভাগে মাথাটা একটু হেলিয়ে দিয়ে নিঃশব্দে বসে রইল।

গগনবিহারী বললেন, 'এইবার অমর, তোর পারুলের কাহিনী আরম্ভ কর্,—আগাগোড়া, সবিস্তারে।'

গগনবিহারীর আদেশ শুনে অমরেশ একবার বাসনার প্রতি ত্বরিত দৃষ্টিপাত করল, তারপর এক মুহূর্ত একটু ইতস্তত করে বলল, 'পারুলের কথা আপনাকে সমস্তই বলব মেজদা,—এভাবে আজ কথাটা না উঠলেও এমনিই আপনাকে বলতাম। কিন্তু এখন বললে হয়তো বাসনাকে অকারণ কষ্ট দেওয়া হবে।'

বিস্মিতকণ্ঠে গগনবিহারী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন?—বাসনাকে কষ্ট দেওয়া হবে কেন?'

এক মুহূর্ত কি চিন্তা করে অমরেশ বলল, 'বাসনা মনে করেন, পারুলের কাহিনী শোনবার তাঁর কোনো প্রয়োজন নেই,—সুতরাং এ বিষয়ে তাঁর আগ্রহও কিছুমাত্র নেই।' তারপর বাসনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলল, 'তুমি যদি ইচ্ছে কর বাসনা, তা হলে এই সময় বাড়ির ভিতর কাটিয়ে আসতেও পার, পারুলের কথা শেষ হলেই আমরা তোমাকে সংবাদ দেব।'

কিছুপূর্বে অমরেশের সহিত বিশ্রব্ধ কথোপকথনের মধ্যে যে উক্তি সে করেছিল, গগনবিহারীর নিকট অমরেশ সহসা তা এমন অবলীলার সহিত ব্যক্ত করায় বাসনার মুখ কালো হয়ে উঠল ; মনের মধ্যে যে বৃত্তি উত্তেজিত হল তা ক্রোধও নয় অভিমানও নয় ; ক্রোধ এবং অভিমানের মাঝামাঝি একটা কিছু। মনে হল, তখনি সে-স্থান পরিত্যাগ করে যায়, কিন্তু পর-মুহূর্তেই নিজেকে সংযত করে নিয়ে সোজা হয়ে উঠে বসে বলল, 'আমার শোনবার প্রয়োজন নেই মনে করি, কিন্তু আপনি যদি দাদামশায়কে শোনান তা হলে এখান থেকে আমাকে উঠিয়ে না দিলে আমাকে কষ্ট দেওয়া হবে, এমন বড় করে আপনার গল্পকে আপনি কেন দেখছেন ? এ কথা আপনাকে কে বলল ?' কণ্ঠস্বরে তিক্ততার সুর অনুপেক্ষণীয়।

বাসনার তিরস্কার-বচনে অমরেশের মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিল ; শান্ত কণ্ঠে বলল, 'কেউ বলে নি, আমি নিজেই অনুমান করেছিলাম। কিন্তু সে যাই হোক, আমি আমার মন্তব্য প্রত্যাহার করছি, তুমি আমাকে ক্ষমা কর।'

তারপর এ প্রসঙ্গ একেবারে পরিত্যাগ করে আরম্ভ করল পারুলের কাহিনী। হরিদ্বারে অসীমানন্দ স্বামীর সহিত ব্রহ্মকুণ্ড ঘাটে স্নান করতে যাওয়ার পথে পারুলের সহিত প্রথম সাক্ষাৎ; কলেরা-পীড়িতা জননীর চিকিৎসার জন্য পারুল কর্তৃক সাহায্য প্রার্থনা; অসীমানন্দ স্বামীর সহিত পরামর্শের পর পারুলের সহিত অমরেশের তাদের কুটির-গৃহে সাহায্যার্থে গমন ; পারুলের জননীর মৃত্যু ; অন্ত্যেষ্টি ক্রিয়া ; পারুলের সহায়হীন আশ্রয়হীন অবস্থা; পারুলকে কলিকাতা পাঠাবার বিষয়ে একটা সুবিধামত ব্যবস্থা করতে পারার পূর্বে তাকে সাময়িক আশ্রয় প্রদান; ইত্যবসরে পারুলের মনের মধ্যে প্রবল নৈতিক বিপ্লবের সূত্রপাত এবং তার ফলে বিগত কলুষিত জীবনের প্রতি তার সুতীব্র ঘৃণার উদ্রেক ; সে জীবনে পুনঃপ্রবেশের বিরুদ্ধে পারুলের দৃঢ় সঙ্কল্প এবং সে সঙ্কল্প যাতে কার্যে পরিণত করা সম্ভবপর হয় তজ্জন্য অমরেশের নিকট কাতর আশ্রয়-ভিক্ষা ; অমরেশ কর্তৃক পারুলকে প্রতিশ্রুতি দান ; অবশেষে অনুমতি-মাসির সহিত পত্র ব্যবহার করে তাঁর

সম্মতিক্রমে পারুলকে কলিকাতায় নিয়ে এসে তাঁর আশ্রয়ে অর্পণ করা—আদ্যন্ত সমস্ত কাহিনী একান্ত আন্তরিকতার সহিত বলে গেল। সে কাহিনীর ঘটনা-পারম্পর্যের মধ্যে' এমন একটা অখণ্ডনীয়তার বেগ যে, তার বিরুদ্ধে নিজ অভিযোগের সমীচীনতা প্রতিপন্ন করা সহজ হবে না বলে বাসনার নিজেরই মনের মধ্যে আশঙ্কা দেখা দিল। উপরন্তু মনে হল, অমরেশ যদি পারুলের প্রতি তার আচরণ সম্পর্কে গগনবিহারীর নিকট বিচার প্রার্থনা করে তা হলে নিষ্পত্তি যে হবে অমরেশের আনুকূল্যে তা যেন গগনবিহারীর প্রশান্ত জুগুপ্সাবিহীন মুখ দেখলে বোঝা যায়।

অমরেশ কিন্তু পারুল কাহিনীর একান্ত সরল বিবৃতি ভিন্ন আর কিছুই বলল না, নিজের সাফাইও গাইল না, অপরের বিচারও চাইল না;—শুধু অবিচলিত সহজ স্বরে বলল, 'মেজদা, বাসনাকে পড়াবার চাকরি আপনিই জুটিয়ে দিয়েছিলেন, এখন সে চাকরিতে ইস্তফা আপনিই মঞ্জুর করিয়ে দিন।

মনে মনে এক মুহূর্ত কি চিন্তা করে গগনবিহারী বললেন, 'বাসু!'

চকিত হয়ে বাসনা উত্তর দিল, 'দাদামশায়?'

'পারুলের কথা শুনলে?

'শুনলাম।'

'সমস্ত?'

'হ্যাঁ, সমস্ত।'

'অবস্থার অনুরোধে অমরেশ যা করতে বাধ্য হয়েছে তা কি তুমি নিন্দনীয় মনে কর?'

প্রশ্ন শুনে বাসনার মুখ লাল হয়ে উঠল। সর্বনাশ! এই প্রশ্নই তো সেই চরম প্রশ্ন, যার উত্তরকে কেন্দ্র করে সমস্ত বিবাদটা আলোড়িত হচ্ছে।

বাসনার বিমূঢ়তা লক্ষ্য করে এই অসুবিধাজনক প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার গ্লানি থেকে অমরেশ তাকে রক্ষা করল, বলল, 'আমার বাধা দেওয়া ক্ষমা করবে

মেজদা,—কিন্তু এ বিষয়ে আমার যথার্থ মনোভাবটা সুস্পষ্ট করে দিলে আপনার বিচার করার ব্যাপারটা হয়তো একটু সহজ হবে। অবস্থার অনুরোধে অপকর্ম করতে বাধ্য হয়েছি, সুতরাং নিন্দনীয় নই—এ আমার দাবী নয়। ঐ অবস্থায় সাধারণ লোকের যা সাধারণ কর্তব্য তাই আমি করেছি, সুতরাং নিন্দা অথবা প্রশংসা কিছুই আমার প্রাপ্য নয়,—এই আমার মনোভাব।'

গগনবিহারী বললেন, 'তোমার মনোভাব আমার কাছে অস্পষ্ট নয়, সেইজন্য প্রশ্নটা তোমাকে না করে বাসুকে করেছিলাম। আমি জানতে চাই, বাসুর মতে এ ব্যাপারটা নিন্দনীয় কি না?'

এবারও অমরেশ বাসনাকে রক্ষা করল, বলল, 'আমার মনে হয় মেজদা বাসনাকে এ প্রশ্ন করবার দরকার নেই। মানবতার দিক দিয়ে আমার এই কাজকে সমর্থন করা গেলেও সামাজিক নীতিভঙ্গ অপরাধে আমি এখন অস্পৃশ্য। সমাজের দুরাত্মাদের খাতায় আমার নাম চড়েছে। এই অবস্থায় আমি যদি বাসনাকে পড়ানো ছেড়ে না দিই, তা হলে শৈলনাথবাবুর প্রতি অন্যায় করা হয়।'

বাসনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে গগনবিহারী বললেন, 'তোমারও কি এই মত বাসু?'

প্রশ্নটার উত্তর সোজাসুজি না দিয়ে বাসনা নিজের দিক থেকে একটা প্রতিপ্রশ্ন করল, বলল, 'একজন নীচ স্ত্রীলোকের সংসর্গ ছেড়ে না দিয়ে আমার পড়ানো ছেড়ে দিলেই কি বাবার প্রতি অন্যায় করা হবে না?'

অমরেশ বলল, 'না, তা হবে না এই জন্য যে, আমি তোমার পড়ানো ছেড়ে দিলে আমার মত বা আমার চেয়ে ভাল মাস্টার পাওয়া তোমার পক্ষে কঠিন হবে না, কিন্তু পারুলকে আমি পরিত্যাগ করলে পারুলের পক্ষে আমার মত আশ্রয় পাওয়া কঠিন হবে। তা ছাড়া, সে যে আমার শরণাগত সে কথা তো তোমাকে বলবার দরকারই নেই।' বলে অমরেশ হো-হো করে হেসে উঠল।

অমরেশের এই প্রাণখোলা উচ্চ হাসি শুনে, মনোমালিন্যের রুদ্ধ নির্বাততার মধ্যে এক নিশ্বাস বায়ু-সঞ্চরণ হল মনে করে গগনবিহারী একটু নিশ্চিন্ত হলেন। বাসনার মুখ কিন্তু আরক্ত হয়ে উঠল। কিছু পূর্বে তারই ব্যবহৃত 'শরণাগত' শব্দটি এরূপভাবে ফিরিয়ে দেওয়ার মধ্যে একটা দংশনের যন্ত্রণা অনুভব করে তিক্তকণ্ঠে সে বলল, 'তবে শরণাগতকেই রক্ষা করুন।'

বাসনার এই উচ্ছ্বসিত ক্রোধোক্তি শুনে গগনবিহারী হাঁ-হাঁ করে উঠলেন; বললেন, 'মহামান্য আদালতের সামনে এ রকম রণাস্ফালন রীতিবিরুদ্ধ! রাত এগারোটা হল, আজ সভাভঙ্গ করা যাক।' তারপর বাসনাকে লক্ষ্য করে বললেন, 'তোমাকে শুধু একটি কথা আমার জিজ্ঞাসা করবার আছে বাসু। এ বিষয়ে শৈলনাথের সঙ্গে তোমার কোনো কথা হয়েছে কি?'

বাসনা বলল, 'না, বাবা এখনো এ-সব কোনো কথাই জানেন না।'

'পারুলের কথাও জানেন না?'

'না।'

গগনবিহারী মুখে শুধু বললেন, 'ও', মনে মনে কিন্তু বললেন, তবেই তো!

আসন ত্যাগ করে দাঁড়িয়ে উঠে অমরেশ বলল, 'আমি তা হলে চললাম মেজদা, মসজিদবাড়ি স্ট্রীটে একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে বাসে বাড়ি ফিরব।'

অমরেশের জামা ধরে টেনে বসিয়ে দিয়ে গগনবিহারী বললেন, 'বস,—এত রাত্রে এক শ্বশুরবাড়ির স্ট্রীট ভিন্ন অন্য কোনো বাড়ির স্ট্রীটে ভদ্রলোকে যায় না।—তা সে মসজিদবাড়িই হোক, আর মন্দিরবাড়িই হোক।'

অমরেশ হাসতে হাসতে বলল, 'শুধু একটি বাড়ির স্ট্রীট ছেড়ে যাচ্ছে মেজদা।'

'কোন্ বাড়ির?'

'যমের বাড়ির। সেখানে আর অল্প-রাত্রি বেশি-রাত্রির কথা নেই, ডাক পড়লে যেতেই হবে।'

গগনবিহারীর সম্মুখে এক টুকরো কাগজ পড়ে ছিল, সেটাকে পাকিয়ে অমরেশের গায়ে সজোরে নিক্ষেপ করে হাঁক দিলেন, 'দীনবন্ধু!'

দীনবন্ধু কাছেই ছিল, নিকটে এসে বলল, 'বলুন।'

'বিপনকে বল গাড়ি বার করতে, অমরেশকে আর মা-মণিকে পৌঁছে দিয়ে আসবে।'

'যে আজ্ঞে।'

একটু পরেই গাড়ি বার হওয়ার শব্দ হতে বাসনা এবং অমরেশের সহিত গগনবিহারী নীচে নেমে এলেন।'

অমরেশকে গগনবিহারী বললেন, 'অমর, তুই গাড়িতে গিয়ে একটু বস, আমি চট্ করে বাসুর সঙ্গে একটা কথা সেরে নিই।'

অমরেশ গাড়ি বারান্দার সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলে বাসনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে গগনবিহারী বললেন, 'নরেন তো পরশু এসে হাজির হবে, ওকে কি বলি বল দেখি? ওর দরখাস্ত মঞ্জুর তো?'

'কিসের দরখাস্ত?'

'তোমার খিদ্‌মৎগারির। ইচ্ছে করে ন্যাকা সেজো না বাসু।'

বাসনার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল, অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে বলল, 'আমি কিন্তু বিয়ে করব না দাদামশায়।'

'এ সঙ্কল্পটা কি শুধু নরেনেরই প্রতি প্রযোজ্য?'

'অর্থাৎ?'

'অর্থাৎ লতা কি অন্য কোনো পাদপকে বেষ্টন করেছে?'

গগনবিহারীর পরিহাসে প্রথমটা বাসনার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল, তারপর সামলে নিয়ে হেসে ফেলল, বলল, 'তোমরা কিন্তু ভারি সেকেলে দাদামশায়। একটা মেয়ে যে 'সিরিয়াস্‌লি' বিয়ে না করার সঙ্কল্প করতেও পারে—এ তোমরা কিছুতেই বিশ্বাস করতে পার না।'

গগনবিহারী বললেন, 'আচ্ছা, এ তর্ক আর এক সময়ে করা যাবে অখন; কিন্তু নরেনকে কি বলব তা বল? হ্যাঁ, না, না?'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বাসনা মৃদুস্বরে বলল, 'না।'

তথাস্তু। এখন চল, অমরেশ হয়তো মনে করছে, তার বিরুদ্ধেই তোমার সঙ্গে একটা চক্রান্ত চলেছে।'

মোটরের কাছে এসে উপস্থিত হয়ে গগনবিহারী দেখলেন, অমরেশ সামনের সীটে বিপিনের পাশে বসে রয়েছে।. বললেন 'পিছনের সীটে বসলি নে কেন অমর? জায়গার তো অভাব ছিল না।'

অমরেশ বলল, 'তা হোক মেজদা, সামনে বেশি হাওয়া পাব।'

অগত্যা বাসনা একাই পিছনের সীটে উঠে বসল। অল্পক্ষণের মধ্যে মোটর চিত্তরঞ্জন অ্যাভেনিউয়ে পড়ে দ্রুতবেগে ভবানীপুরের দিকে ধাবিত হল এবং দেখতে দেখতে ভবানীপুরে উপস্থিত হয়ে অমরেশের বাড়ির সম্মুখে স্থির হয়ে দাঁড়াল।

গাড়ি থেকে অবতরণ করে অমরেশ বলল, 'আচ্ছা, চললাম বাসনা।

বাসনা সে সময় একটা গভীর মোহের মধ্যে আচ্ছন্ন ছিল, সহসা জাগ্রত হয়ে উঠে বলল 'একটা কথা শুনুন।'

নিকটে এসে অমরেশ জিজ্ঞাসা করল, 'কি কথা?'

অমরেশের দিকে মুখটা যথা সম্ভব এগিয়ে নিয়ে গিয়ে মৃদু কিন্তু উত্তেজিত স্বরে বাসনা বলল, 'আমি যদি আপনার শরণাগত হই? তখন বলেছিলাম শরণাগতকে রক্ষা করুন। এখন যদি সে কথাটা আমার হয়েই ঘুরিয়ে বলি?— আমিও তো আপনার ছাত্রী।'

বাসনার কথা শুনে অমরেশের মুখে চিন্তার রেখা দেখা দিল, মনে মনে একটু কি ভেবে নিয়ে বলল, 'এর উত্তর তোমাকে পরে দোব।'

'আচ্ছা।'

গাড়ি চলতে আরম্ভ করলে উত্তেজনাবশে বাসনা প্রথমটা ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলতে লাগল, তারপর ধীরে ধীরে মাথাটা গাড়ির পিছন দিকে হেলিয়ে দিয়ে চক্ষু মুদ্রিত করে পড়ে রইল।

৪

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। ধূপ দীপ এবং শঙ্খধ্বনির দ্বারা গৃহবন্দনা সমাপন করে অনুমতি তাঁর পূজার ঘরে প্রবেশ করেছেন। ঘরের মধ্যে পূজার উপকরণাদির আড়ম্বর বিশেষ কিছু নেই; কিন্তু অল্প যেটুকু আছে, সদাজাগ্রত নিষ্ঠা এবং যত্নের পরিচয়ে তা সমুজ্জ্বল। মালিন্য অথবা অবহেলার লেশমাত্র চিহ্ন কোনোখানে দেখা যায় না।

পূজার ঘরে দেবদেবীর মূর্তির অভাব। প্রশস্ত রৌপ্য সিংহাসনের উপর সুবর্ণ ফ্রেমে বাঁধানো দুটি চিত্র এমন পাশাপাশি স্থাপিত যে, আরাধিকার কাছে কে বড়, কে ছোট, তার ইঙ্গিত পাবার উপায় নেই। একখানি ছবি পরলোকগত স্বামী অসিতনাথের, অপরটি ইহলোকের উপাস্য দেবতা প্রভু গোপীনাথের।

আহ্নিক এবং জপ শেষ হয়ে গেলে নিকটবর্তিনী চাঁপার মা'কে আহ্বান করে অনুমতি বললেন 'চাঁপার মা, পারুল কি করছে?'

'তাঁর নিজের ঘরে বসে আছেন।'

'আচ্ছা, এখানে তাকে ডেকে দে। বল্, মা ডাকছেন।'

একটি ক্ষুদ্র পরিচ্ছন্ন ঘর পারুলের ব্যবহারের জন্য অনুমতি স্থির করে দিয়েছিলেন। সেই ঘরে একটা চেয়ারের উপর উপবেশন করে নিবিষ্ট মনে পারুল তার অদৃষ্ট চিন্তা করছিল। আজ তিন দিন সে অনুমতির গৃহে

বাস করছে; এখানে সে পেয়েছে সমাদর, পেয়েছে স্নেহ; চাঁপার মার কাছ থেকে সে পেয়েছে সম্মান, পরিচর্যা; কিন্তু তবু মনে হয় এই তিন দিনের জীবন যেন একটা কুজ্ঝটিকার আবরণ, যা তার হরিদ্বারের মেঘ ও রৌদ্র খচিত বিচিত্র জীবনকে লুপ্ত করে দিচ্ছে। জীবনের নব পর্যায়ে এ যে উষার উদয় তাতে সন্দেহ নেই, কিন্তু এ উষার পূর্বাকাশ হিমবাষ্পের অশ্রুজালে ধূসর, তরলিত স্বর্ণের বক্তিম ছটার দ্বারা সমুজ্জ্বল নয়। সেই যে অমরেশ তাকে এ বাড়িতে নামিয়ে দিয়ে গেছে, তারপর তিন দিন আর তার দেখা নেই।

'দিদিমণি!'

চকিত হয়ে ফিরে দেখে পারুল বলল, 'কি চাঁপার মা?'

'মা তোমাকে ডাকছেন।'

'কোথায়?'

'ঠাকুর ঘরে।'

আসন পরিত্যাগ করে ঠাকুর ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হয়ে পারুল বলল, 'মা আমাকে আপনি ডাকছেন?'

অনুমতি তখন ফুল দিয়ে সিংহাসন সাজাচ্ছিলেন, পারুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সহাস্যমুখে বললেন, 'কাল তুমি আমার সেবা করবার জন্য ব্যস্ত হয়েছিলে, আজ আমি তোমার কাছ থেকে কিছু সেবা চাইছি পারুল।'

গতকল্য সন্ধ্যার পর অনুমতি যখন কর্মশেষে বিশ্রামের জন্য শয্যা গ্রহণ করেছিলেন, তখন পারুল তাঁর পদসেবা করবার জন্য বিশেষরূপে আগ্রহান্বিত হয়ে উঠেছিল। অনুমতি পারুলকে এই বলে নিরস্ত করেছিলেন যে, মানুষ যতক্ষণ অপরকে সেবা করবার মত সক্ষম থাকে, ততক্ষণ অপরের কাছ থেকে সেবা গ্রহণ করলে তার বিলাসপরতার অপরাধ হয়। আজ সহসা অনুমতিকে উপযাচিকা হয়ে সেবা চাইতে দেখে কৌতূহলে পারুলের চক্ষু উজ্জ্বল হয়ে উঠল; আগ্রহের সহিত সে বলল, 'কি করতে হবে মা, বলুন।'

নিঃশব্দ সুমিষ্ট হাস্যে অনুমতির মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠল. বললেন, 'আমার ঠাকুরদের গান শোনাতে হবে তোমাকে। দুজনেই গানের ভক্ত, গান শুনিয়ে আজ তাঁদের খুশি করতে হবে।'

পারুল যে একজন উচ্চশ্রেণীর গায়িকা, গতকল অপ্রত্যাশিত ঘটনাচক্রে তা আবিষ্কার করেন। পারুলের ঘরে বসে তিনি কথোপকথন করছিলেন এমন সময় পাশের বাড়িতে আরম্ভ হল সঙ্গীতবিদ্যার অনুশীলন। বোঝা গেল ওস্তাদ এসে শিক্ষার্থিনীর কাছ থেকে পূর্বদানের তালিমের পরীক্ষা গ্রহণ করছে। তরুণী সাকরেদ তখন গাইছিল বাগেশ্রী রাগিণীর একটা খেয়াল— 'কৌন করত তোরি বিনতি পিয়রবা মানো না মানো হমারি বাৎ'। সুমিষ্ট নারীকণ্ঠের সুললিত সঙ্গীতের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে ক্ষণকালের জন্য অনুমতি ও পারুলের কথাবার্তা গিয়েছিল বন্ধ হয়ে। হঠাৎ অনুমতির দৃষ্টি পড়ল পারুলের দক্ষিণ হস্তের অতি মৃদু দুর্নিরীক্ষ্য তর্জনী সঞ্চালনের উপর। তরুণ বয়সে এক সময় অনুমতি সঙ্গীতবিদ্যার বেশ একটু অনুশীলন করেছিলেন। সুতরাং পারুলের অঙ্গুলি-সঞ্চালন যে অশিক্ষিত হস্তের অযথা সঞ্চালন নয় সে কথা উপলব্ধি করতে তাঁর বিলম্ব হল না। অস্থায়ীর পুনরাবৃত্তি কালে একটা তানের মুখে পারুলের মুখ ঈষৎ কুঞ্চিত হল, অঙ্গুলি সঞ্চালনও গেল বন্ধ হয়ে, সঙ্গে সঙ্গে পাশের বাড়িতে গানটাও অকস্মাৎ থেমে গেল।

পারুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সহাস্যমুখে অনুমতি বললেন, 'তাল কেটে গেল পারুল?'

অতর্কিতে পারুল বলল, 'হ্যাঁ।' পর মুহূর্তেই কিন্তু ধরা পড়ে গেছে বুঝতে পেরে তার চোখ মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। অপ্রতিভ হয়ে জড়িত কণ্ঠে বলল, 'বোধ হয় কেটে গেল।'

অনুমতি হেসে ফেলে বললেন, এখন আর 'বোধ হয়' বললে চলবে না। আগে যে উত্তর দিয়েছ সেইটেই তোমার যথার্থ উত্তর।' তারপর তারে

পার বেশি কিছু ভাবনা চিন্তার অবসর না দিয়ে সোজাসুজি প্রশ্ন করলেন তুমি তা হলে নিশ্চয়ই গাইতে জান পারুল ?'

একটা দুর্বতিবর্তনীয় বৃহৎ সত্যকে একেবারে ষোল আনা অস্বীকার করতে পারুলের সাহস হল না। একটু ইতস্ততসহকারে বলল, 'সামান্য একটু জানি।'

পারুলের উত্তর শুনে অনুমতি মনে মনে মাথা নাড়লেন,—খুব সামান্য বলে তো মনে হয় না।

ঘণ্টা খানেক পরে পাশের বাড়ির গান থামলে অনুমতির নির্বন্ধে পারুলকে তার 'সামান্য একটু'র প্রমাণ দিতে গিয়ে 'যথেষ্ট অধিকেরই' পরিচয় দিতে হল। পারুলের গান শুনে অনুমতি বুঝলেন যে, পারুলের অঙ্গুলি সঞ্চালন দেখে তিনি যা অনুমান করেছিলেন, বস্তুত পারুল তার চেয়ে অনেক বড়। সে এমন একজন প্রথমশ্রেণীর শিল্পী, যার কাছে সুরলক্ষ্মী তার সমস্ত আনন্দ আবেগ বেদনা নিয়ে আত্মসমর্পণ করেছে। বহুদিন পরে জীবনের একমাত্র সম্পদের মধ্যে নিজেকে ফিরে পেয়ে পারুল মুগ্ধ হয়ে কয়েকটা গান গাইল, যা শ্রবণ করে অনুমতি মনে মনে মুগ্ধ হলেন।

আজ অনুমতির আদেশ শুনে পারুল চিন্তিত হল। গান শুনিয়ে ঠাকুরদের খুশি করতে হবে, সে যে বড় কঠিন কথা। কিন্তু যখন মনে পড়ল, এ ক্ষেত্রে ভক্তের কান দিয়েই ঠাকুররা গান শুনবেন, এবং ভক্তের পরিতৃপ্তির দ্বারাই তাঁদের পরিতৃপ্তির প্রমাণ পাওয়া যাবে, তখন কতকটা আশ্বস্ত হয়ে সে ঠাকুর ঘরের বাইরে দ্বারপ্রান্তে বসে পড়ল।

অনুমতি বললেন, 'গা ধুয়ে কাপড় ছেড়েছ তো পারুল ?'

'হ্যাঁ।'

'তা হলে ভেতরে এসে বস। ও-রকম করলে কি হয় ? খুশি যাঁকে করতে হবে, তাঁর থেকে দূরে থাকলে চলবে কেন ?

দ্বিধাজড়িত কুণ্ঠিত স্বরে পারুল বলল, 'কিন্তু মা—'

পারুলকে কথা শেষ করবার অবসর না দিয়ে স্নিগ্ধকণ্ঠে অনুমতি বললেন, ‘ও-সব কিন্তু-টিন্তু বাইরে ফেলে ঘরের ভিতরে এসে আমার পাশে বস।’

আর কোনও কথা না বলে ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে পারু গলবস্ত্র হয়ে ঠাকুর প্রণাম করল, তারপর নিমীলিত নেত্রে ক্ষণকাল অবস্থান করে মৃদুমন্দ সুরে আরম্ভ করল—

‘মনের মরম কথা তোমারে কহিয়ে এথা
শুন শুন পরাণের সই।
স্বপনে দেখিনু যে শ্যামল বরণ দে
তাহা বিনু আর কার নই।’

ক্রমে ক্রমে পরিপূর্ণ কণ্ঠের অলৌকিক সুর-বৈভবে চতুর্দিকের বায়ু-রাশি স্পন্দিত হয়ে উঠল, তরলিত সঙ্গীতের লীলা-কণিকায় গৃহাকাশের সমস্ত শূন্যতা গেল ভরে, ভাবে আর সুরে চলল সোনা-রূপার সুতায় নিরবকাশ বপন। আত্মবিকাশের বেদনায় পারুলের মুখমণ্ডলে ফুটে উঠল হর্ষচকিত উদ্বেগ, আত্মোপলব্ধির আনন্দে অনুমতির নিমীলিত নেত্রে দেখা দিল অশ্রুধারা।

গানের পর গান চলেছে যেন একটা অনতিক্রমণীয় গতিবেগে। কখন্ যে একটা গান শেষ হয়ে আর একটা আরম্ভ হয়, শ্রোত্রী এবং গায়িকা উভয়ের মধ্যে কেউ যেন তা বুঝতেই পারে না। অবশেষে পারুল যখন গাইছে,

‘ভাবিয়া দেখিনু এ তিন ভুবনে
আর কে আমার আছে।
রাধা বলে কেহ শুধাইতে নাই
দাঁড়াব কাহার কাছে।’

তখন অমরেশ গৃহে প্রবেশ করল। গানের শব্দ কানে যেতে প্রথমে মনে

করল গ্রামোফোন বাজছে, কিন্তু খানিকটা অগ্রসর হতেই চাঁপার মার সঙ্গে দেখা হল। তখন সন্দেহ হয়েছে গ্রামোফোনের রেকর্ড নয়, মানুষের কণ্ঠস্বর। সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করল, 'কে গাইছে চাঁপার মা ?'

সহাস্যমুখে চাঁপার মা বলল, 'দিদিমণি গো দাদাবাবু।'

'কোথায় ?'

'ঠাকুর-ঘরে।'

ত্বরিত পদে অমরেশ ঠাকুর ঘরের নিকট উপস্থিত হল, কিন্তু পাছে তাকে দেখে পারুল বিব্রত বোধ করে, সেই জন্য একটু অন্তরালে অবস্থান করল।

মিনিট পাঁচেকের মধ্যে গান শেষ হয়ে এল।

'আঁখির নিমেষ যদি নাহি দেখি
তবে যে পরাণে মরি।
চণ্ডীদাস কহে পরশ-রতন
গলায় গাঁথিয়া পরি।'

এবার অমরেশ ঠাকুর-ঘরের দরজার সম্মুখে এসে দাঁড়াল। প্রসন্নকণ্ঠে বলল, 'কি চমৎকার পারুল! তুমি যে এত ভাল গান গাইতে পার তা তো কোনদিন জানাও নি ?'

সহসা অমরেশকে দেখে এবং তার কথা শুনে হর্ষে এবং লজ্জায় পারুলের মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। তারপর তাড়াতাড়ি দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'দাদা এসেছেন! কখন্ এলেন দাদা ?'

স্মিতমুখে অমরেশ বলল, 'আগে আসি নি বলে অনুতাপ করছি।' তারপর অনুমতির প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলল, 'মাসিমা, কি করে তুমি তিন দিনেই এই গান-গাওয়া পারুলকে আবিষ্কার করলে তা বল। আমি তো এক মাসেও পারি নি।'

সহাস্যমুখে অনুমতি বললেন, 'গোপীনাথ দয়া করলে তিন দিনও লাগে

না অমর, তিন মিনিটেই হয়। গান শুনবেন বলে তিনিই তো পারুলকে নিজের কাছে টেনে নিয়ে এসেছেন।'

অমরেশের চক্ষু বিস্ফারিত হয়ে উঠল; বিস্ময়বিমূঢ় স্বরে বলল, 'বল কি মাসিমা! চোখে দেখা যায় না, কানে শোনা যায় না, নড়ন-চড়ন নেই, পারুলকে টেনে নিয়ে এলেন তিনি? আর আমি যে তাকে রেল-গাড়িতে চড়িয়ে হরিদ্বার থেকে কলকাতা হাজার মাইল পথ সঙ্গে করে নিয়ে এলাম, সেটা কিছুই নয়?'

অমরেশের দুঃখ দেখে অনুমতি হেসে ফেললেন; বললেন, 'সেটা কিছুই নয় কেন অমর? তুইও তো গোপীনাথ ছাড়া নোস। তিনি তোকে পেযাদা করে হরিদ্বারে পাঠিয়েছিলেন।'

'পারুলকে আনবার জন্য?'

'হ্যাঁ।'

যুক্তি শুনে অমরেশের মুখে হাস্য দেখা দিল; বলল, 'শুধু পেযাদা করেই পাঠান নি মাসিমা, খাজাঞ্চি করেও পাঠিয়েছিলেন। হরিদ্বার ষ্টেশনে পারুলের রেলের টিকিটটা তিনি তাঁর নিজের খাস মনিব্যাগ থেকে কিনে দেন নি, আমাকেই কিনতে হয়েছিল। কিন্তু সে কথা যাক, পারুলকে তোমার ঠাকুর-ঘরে অমন করে ঢুকতে দিয়েছ যে? এও গোপীনাথ ঠেলে ঢুকিয়েছেন না-কি?'

অনুমতি হাসিমুখে বললেন, 'তাতে কি আর সন্দেহ আছে অমর। কিন্তু পারুলকে ঢুকতে দোব না কেন? অপরাধটা কি তার শুনি?'

অমরেশ বলল, 'অপরাধ? অপরাধ—তার জাত নেই গোত্র নেই, বংশ নেই কুল নেই। এর চেয়ে বড় অপরাধ মানুষের আর কি থাকতে পারে?' বলে পারুলের দিকে চেয়ে হাসতে লাগল।

অনুমতি বললেন, 'জাত গোত্র নেই কি রে অমর? তুই নিজে তো তার জাত গোত্র দিয়ে তবে আমার কাছে এনেছিস। তুই তার হাতের

অন্ন গ্রহণ করে তাকে জাত দিয়েছিস, মায়ের নামে তার গোত্র দিয়েছিস; তুই কি সহজ ছেলে বাবা? তা ছাড়া, এই এক মাসের মধ্যে তাকে যা এগিয়ে দিয়েছিস, সে তো রীতিমত একটা কীর্তি! এই তিন দিনেও কি কিছু বলতে আমাকে বাকি রেখেছে?'

চক্ষু বিস্ফারিত করে অমরেশ বলল, 'এই দেখ মাসিমা, তুমি কত বড় একটা ভুল করে বসলে। তোমার গোপানাথের যত কীর্তি পেয়াদার কাঁধে চাপিয়ে দিলে। পেয়াদা শুধু পথ দেখিয়েই আনতে পারে, গোত্র দিতে পারে কি সে?'

অমরেশের কথা শুনে অনুমতি মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন, বললেন, 'শুধু কি তুই গোপীনাথের পেয়াদাই অমর? তুই তাঁর মস্ত বড় কর্মচারী।'

স্মিতমুখে অমরেশ বলল, 'ডেপুটি-গোপীনাথ নাকি?'

'তা ডেপুটি গোপীনাথ না তো কি?' বলে অনুমতি হাসতে লাগলেন, তারপর পারুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'অমরকে নিয়ে গিয়ে হল-ঘরে বস পারুল আমি মিনিট দশেক পরেই যাচ্ছি। তারপর হারমোনিয়মের সঙ্গে তোমার ওস্তাদি গান হবে।'

ঠাকুর-ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ফিরে দাঁড়িয়ে পারুল ডাকল, 'মা!'

পারুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে অনুমতি বললেন, 'বল।

'আমি দাদাকে চা করে দোব?'

অনুমতি বললেন, 'চাঁপার মাকে বল, সে করে দেবে এখন। তবে তোমার যদি ইচ্ছে হয় তুমি নিজেও করে দিতে পার।'

পারুলের দিকে চেয়ে বিস্মিত কণ্ঠে অমরেশ বলল, 'সে যেমন ইচ্ছে হয় করো, কিন্তু মাসিমাকে 'মা' বলে ডাকছ যে পারুল? আমাকে তা হলে শেষ পর্যন্ত মাসতুতো ভাই বানালে না-কি?'

অপ্রতিভ মুখে পারুল নিঃশব্দে হাসতে লাগল।

পারুলের বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করে অনুমতি বললেন, 'তোমার লজ্জিত হবার কোনো কারণ নেই পারুল। যা কিছু দুর্নাম মাসতুতো ভাইদেরই আছে, মাসতুতো বোনের কোনো দুর্নাম নেই।

'তা নেই বটে।' বলে হাসতে হাসতে অমরেশ হল ঘরের দিকে অগ্রসর হল

১৫

মনের মধ্যে একটা দুর্বিষহ যন্ত্রণা এবং অপমানের দাহ নিয়ে নরেন যখন গগনবিহারীর গৃহ থেকে নিজের গৃহে ফিরে এল, রাত্রি তখন দশটা। বঞ্চিত হওয়ার দুঃখকে তখন ছাপ মানিয়েছিল অবনমিত হওয়ার আক্রোশ। একটা হিংস্র জিঘাংসার নিঃশব্দ দাপটে তার সমস্ত অন্তরিন্দ্রিয় কালো হয়ে উঠেছিল। মনে হচ্ছিল, দংশন করি, বিদীর্ণ করি, গুঁড়িয়ে দিই, পুড়িয়ে দিই। কিন্তু উপস্থিত আততায়ীকে আক্রমণের সীমান্তরেখার মধ্যে না পেয়ে নিষ্ফল আক্রোশে সে নিজেকেই বারম্বার দংশন করতে লাগল।

গগনবিহারী নরেন্দ্রকে স্পষ্ট করে বিশেষ কিছু বলেন নি, কিন্তু সামান্য যেটুকু বলেছিলেন তার ইঙ্গিত অস্পষ্ট নয়। তিনি বলেছিলেন, যুদ্ধই বল, আর প্রেমই বল, উভয়েরই অভিযানে গতিবেগই সব সময়ে প্রধান বস্তু নয়, সময় বিশেষে গতিবোধও তার চেয়ে বড় হয়ে ওঠে। গতিবোধের দ্বারা অপর পক্ষকে আকৃষ্ট করে এমন সঙ্কটের স্থানে এনে ফেলা যায় যেখানে তার পরাভব সুনিশ্চিত। তোমার দিকে বাসনা যদি তার মন্দীভূত করেছে বলে সন্দেহ

কর, তা হলে তুমিও তোমার গতি একেবারে রোধ করে স্থির হয়ে দাঁড়াও, —হয়তো তাতে উপকার হবে। আর একান্তই যদি তাতে কোনো সুফল না দেখা যায়, তা হলে এ কথা নিশ্চয় মনে মনে অনুভব করো যে, বাসনাই সকলের পক্ষে কামনার বস্তু নয়।'

এ কথার উত্তরে নরেন বলেছিল, 'বাসনা যে সকলের পক্ষে কামনার বস্তু নয়, সে কথা তো এখনই কতকটা অনুভব করছি; কিন্তু বাসনার পক্ষে উপস্থিত এই মুহূর্তে কে কামনার বস্তু, তা বলতে পারেন দাদামশায়?'

তদুত্তরে গগনবিহারী বলেছিলেন, 'নিশ্চয় করে বলতে পারি নে, অনুমান হয়তো করতে পারি; কিন্তু অনুমানের কথা বলে কোনো লাভ নেই, কারণ সে-রকম অনুমান তুমিও হয়তো কিছু কিছু করছ।'

এর পর আর যে-সকল কথা হল তা থেকে একমাত্র অমরেশই যে উভয়েরই মনে অনুমানের বস্তু, সে অনুমানও উভয়েরই মনে মনে প্রবলতর হয়ে উঠল। নরেনের বিরুদ্ধে বাসনাকে কেউ যে আকৃষ্ট করেছে সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল না, আর প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে অমরেশ ভিন্ন অপর কোনো ব্যক্তির অস্তিত্ব দৃষ্টিগোচর হয় না।

নরেন্দ্র হচ্ছে একান্ত ভাবে বস্তুতন্ত্রবাদী। আপাদমস্তক, পায়ের নখ হতে মাথার চুল পর্যন্ত, সে একজন এঞ্জিনীয়ার মানুষ। ফুট-ইয়ার্ড আর কোয়ার্ট-হন্দরের সঙ্গে তার গভীর পরিচয়, তাই বস্তুর মূল্য নির্ণয় করবার তার অভ্যাস ওজন আর মাপের হিসাব দিয়ে। কতকটা সেই ভাবে সে তার নিজের এবং বাসনার যে আপেক্ষিক মূল্য নির্ণয় করে রেখেছিল তাতে বাসনা তার পক্ষে আকাঙ্ক্ষার বস্তু হলেও, দুরাকাঙ্ক্ষার নয়। তাই তাকে হারাবার আশঙ্কা যত না আঘাত দিল তার মনকে, ততোধিক দিল তার আত্মপরতাকে; বেদনাকে অতিক্রম করল আক্রোশ।

সুদৃঢ় আত্মপ্রত্যয়ের প্রভাবে বাসনার বিষয়ে নরেনের মন সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত ছিল, এমন সময়ে অকস্মাৎ একদিন অচিন্তিত ভাবে তার মধ্যে সংশয়ের

সূত্রপাত হল। তখন অমরেশ হরিদ্বারে অবস্থান করছে, কিন্তু তার প্রত্যাবর্তনের কাল আসন্ন হয়ে এসেছে। দক্ষিণ-ভারতে কিছুদিন হতে একটা সেতু নির্মিত হচ্ছিল, সেই বিষয়ে একটা জরুরী পরামর্শের জন্য নরেন এসেছিল এক রবিবারের প্রাতে শৈলনাথের সহিত আলোচনা করতে। কাজকর্মের অবসানে কাগজপত্র দেরাজে তুলে রাখতে গিয়ে শৈলনাথের দৃষ্টি পড়ল খামে-মোড়া একখানা চিঠির উপর। চিঠিখানা বার করে শৈলনাথ ব্যস্ত হয়ে বললেন, 'এই দেখ! বাস্তব চিঠিটা পোস্ট করতে ভুল হয়ে গিয়েছে। কাল অমরেশের চিঠি পেয়ে কালই তাড়াতাড়ি উত্তর লিখে অফিস যাবার সময় আমার হাতে দিয়েছিল, অফিসের কাগজপত্রের সঙ্গে ভুলে চলে এসেছে।' তারপর খামের উপর ডাক টিকিট মেরে বললেন, 'আমার কাছে রাখা আর নিরাপদ নয়, আবার হয়তো এমনি করে ভুল হয়ে অফিসে ফিরে যাবে। তার চেয়ে তুমি বাড়ি যাবার পথে কোনো জায়গায় এটা পোস্ট করে দিয়ো।' বলে নরেনের হাতে দিলেন।

মোটরে আরোহণ করে বাসনার চিঠির উপর নরেনের কৌতূহল জাগ্রত হল। চিঠিখানা অমরেশের চিঠির কেবল মাত্র অতিক্ষিপ্র উত্তরই নয়, চিঠিখানার ওজন বিবেচনা করলে উত্তরের দৌড়টাও খুব সংক্ষিপ্ত বলে অনুমান করা চলে না। শৈলনাথও সেই ওজনেরই কথা মনে করে চিঠির উপর দু' আনার টিকিট বসিয়ে দিয়েছিলেন। চিঠিখানা করতলে স্থাপিত করে ভার অনুভব করবার অভিপ্রায়ে উপর-নীচে একটু দুলিয়ে দেখে নরেনের মনটা খুঁতখুঁত করতে লাগল। চিঠি তো ছাত্রী লিখেছে তার শিক্ষককে,—তবে তাড়াই বা তার এত কেন, আর ভারিই বা হয় এত কিসে? এ চিঠি যে সহজ সাধারণ চিঠি, এ চিঠির নিবেদন যে শ্রদ্ধাভাজন গুরুর প্রতি ভক্তিমতী শিষ্যার শ্রদ্ধা-নিবেদনের অতিরিক্ত আর কিছু নয়, তা না জেনে নরেন নিশ্চিন্ত হতে পারল না। কৌতূহল হয়ে উঠল উদগ্র,—ডাক-বাক্সে চিঠি ফেলা হল না।

গৃহে উপনীত হয়ে সে ক্ষণকাল দ্বিধাজড়িত চিত্তে চিঠিখানা হাতে নিয়ে বসে রইল, তারপর দুরতিক্রমণীয় ঔৎসুক্যের হস্তে বিবেক ধীরে ধীরে আত্মসমর্পণ করল। চিঠির আঠার অংশে জলের পোঁছ বুলিয়ে ছুরির প্রান্তভাগ দিয়ে সন্তর্পণে সে খামখানা খুলে ফেলল, তারপর তাড়াতাড়ি চিঠিখানা বের করে তার আদ্যন্ত সমস্তটা আগ্রহসহকারে পাঠ করল।

চিঠিখানা অবশ্য দয়িতের প্রতি প্রণয়িনীর প্রেমলিপি নিশ্চয়ই নয়, কিন্তু শিক্ষকের প্রতি ছাত্রীর সাধারণ ভক্তি নিবেদনও তাকে বলা চলে না। মেঘের ধারে ধারে আলোকের রূপালী পাড়ের মত সাধারণ কথার পাশে পাশে অসাধারণের আভাস, যা ক্ষণে ক্ষণে গুরু-শিষ্যা পর্যায়ের শেষ প্রান্তরেখা উল্লঙ্ঘন করবার উপক্রম করে। ভক্তি যেন সব সময় ষোল আনা ভক্তিই নয়, দুঃখ যেন সব সময় ধারণ করে অভিমানের রূপ। এমন কি, পারুল নামে কোনো স্ত্রীলোকের প্রসঙ্গে কৌতূহল এবং ঔদাসীন্যের যে অপ্রাকৃত অসমঞ্জস যোগ তা যেন ঈর্ষার কাছ ঘেঁষে চলে।

বাসনার চিঠির মধ্যে দুর্লক্ষণের অশুভ ছায়া অবলোকন করল। অবশ্য অমরেশের প্রৌঢ়ত্ব কতকটা আশ্বাসের কথা বটে, কিন্তু প্রেম যখন বন্যারূপে মানুষের, বিশেষতঃ স্ত্রীলোকের চিত্ত প্লাবিত করে ধাবিত হয় তখন তার সম্মুখে প্রৌঢ়ত্বের বাঁধ এমন কিছু বাধা নয়। পার্শ্ববর্তী প্রাচীন বৃক্ষকে নববল্লরী পাকে পাকে জড়িয়ে ধরেছে, এমন দৃষ্টান্তও তো প্রকৃতির রাজ্যে সুপ্রচুর। স্ত্রীলোকের লতাধর্মী মনের পক্ষে সান্নিধ্য একটা প্রবল হেতু। নরেন্দ্র স্থির করল, বাসনাকে অমরেশের সান্নিধ্য হতে অবিলম্বে ছিন্ন করে নিজের পাশে রোপণ করতে হবে।

সে কাজের লোক,—তৎপর মানুষ, চেষ্টা করে সেই দিনই সন্ধ্যাকালে বাসনার সহিত সাক্ষাৎ করল। নির্জনে কিছুক্ষণ তার সঙ্গে কথোপকথন করবার সুযোগও ঘটে গেল, কিন্তু সুবিধা হল না। অমরেশের সান্নিধ্য হতে বাসনাকে ছিন্ন করা সহজ হবে কি-না তা ঠিক বোঝা না গেলেও নিজের পাশে

তাকে রোপণ করা যে অদূরভবিষ্যতে সম্ভব হবে না, তা নিশ্চয় করে বোঝা গেল। সংশয় হল বর্ধিত।

কথাটা আরও খানিকটা পরিষ্কার করে বোঝবার অভিপ্রায়ে কয়েক দিন পরে সন্ধ্যার পর পুনরায় সে শৈলনাথের গৃহে উপস্থিত হল। চাকরের মুখে শুনল, দিদিমণি আর মাস্টারবাবু বাহিরের ঘরেই অবস্থান করছেন। অমরেশ যে কলকাতায় ফিরে এসেছে তা সে জানত না। কৌতূহলী হয়ে ধীরে ধীরে বাইরের ঘরে মুখ বাড়িয়ে দেখল, বাসনা অমরেশকে খাবার খাওয়াতে ব্যস্ত। মনে পড়ল কয়েক দিন পূর্বে সাক্ষাৎকালে সে তাকে এক পেয়ালা চা পান করবার জন্যও অনুরোধ করে নি। পিত্ত উঠল জ্বলে। পিছিয়ে এসে বারান্দায় দাঁড়িয়ে ক্ষণকাল উপস্থিত কর্তব্য সম্বন্ধে চিন্তা করল। হঠাৎ মনে পড়ল গগনবিহারীর কথা। ভাবল, তাঁকে মধ্যস্থ করে কথাটার অবতারণা করলে হয়তো একটা সুরাহা হতে পারে। বাসনার উপর গগনবিহারীর আধিপত্য চলে, এ কথা তার জানা ছিল। তখনই মোটর নিয়ে গগনবিহারীর গৃহাভিমুখে ধাবিত হল। পৌঁছে শুনল, গগনবিহারী বেরিয়েছেন, কিন্তু শীঘ্রই প্রত্যাবর্তন করবেন। কথাটা ভুল নয়,—মিনিট পনের-কুড়ির মধ্যেই তিনি ফিরে এলেন; কিন্তু একা নয়, অমরেশ এবং বাসনাকে সঙ্গে নিয়ে।

বাসনা এবং অমরেশকে পুনর্বার একত্র দেখে এবং নিজের অভীষ্ট সাধনে দ্বিতীয় বার এইরূপে ব্যর্থ হয়ে নরেনের মনে ক্রোধ দুর্মদ হয়ে উঠল। কিন্তু কার্যসিদ্ধির পথে ক্রোধের ন্যায় মানুষের দ্বিতীয় রিপু নেই স্মরণ করে সেদিন সে ক্রোধকে দমিত করতে সমর্থ হয়েছিল।

আজ কিন্তু তা হল না। গগনবিহারীর সহিত কথাবার্তার পর আজ যখন সে অনুভব করল যে, আসন তার টলেছে, বাসনার উপর অধিকারের যে বাঁধনকে এতদিন অমোচ্য বলে কল্পনা করত তা শিথিল হয়েছে, তখন তার মন বিদ্রোহী হয়ে উঠল। প্রজ্জ্বলিত ক্রোধের দু-চারটা আতসবাজির দ্বারা গগনবিহারীকে সম্বর্ধিত করে সে প্রস্থান করল।

গৃহে প্রত্যাবর্তন ক'রে নরেন সোজাসুজি শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করল। আহারে প্রবৃত্তি একেবারেই ছিল না। কথোপকথনের পূর্বে চায়ের সহিত যেটুকু খাবার গগনবিহারী অনুরোধ ক'রে খাইয়েছিলেন, তাই আজকে রাত্রি যাপনের পক্ষে যথেষ্ট মনে হল। উত্তপ্ত মস্তিষ্ক গভীর চিন্তাজালে আচ্ছন্ন হয়ে বহুক্ষণ পর্যন্ত নিদ্রাকর্ষণে বাধা দিল।

পরদিন প্রত্যুষে যখন নিদ্রা ভাঙল, তখন কিন্তু মনটা অনেক চাঙ্গা হয়েছে। তাড়াতাড়ি প্রাতঃকৃত্য এবং চা পান শেষ করে বেরিয়ে পড়ল অপর্ণার সহিত দেখা করবার অভিপ্রায়ে। অপর্ণা তার সর্বাধিক নির্ভরের স্থল, তার প্রবলতম শক্তি-কেন্দ্র, এ সত্য তার অগোচর ছিল না। স্থির করল একবার শক্তি-সামর্থ্যের চূড়ান্ত পরীক্ষা না করে পরাজয় স্বীকার করবে না।

১৬

সাংসারিক বিপর্যয় হেতু স্ত্রীলোকের মনে ক্রোধ অথবা বিরক্তি উৎপন্ন হলে শেষ পর্যন্ত তার চোটটা যে বহু ক্ষেত্রেই কারণে এবং অকারণে স্বামী হতভাগ্যের উপর গিয়ে চড়াও হয়, এ সত্য স্বামী-সম্প্রদায়ভুক্ত প্রত্যেক ব্যক্তিরই জানা আছে। নারীচিত্তের এই বিশেষ ধর্মের ফলে নরেনের সহিত কথাবার্তার পর অপর্ণার মনের সমস্ত রাগটা গিয়ে পড়ল বেচারা শৈলনাথের উপর। মনে হল, কন্যার বিবাহ ব্যাপারে আজ যে সঙ্কট দেখা দিয়েছে তার জন্য প্রধানত শৈলনাথের ঔদাসীন্য এবং অবিবেচনাই দায়ী। বাসনার

আই. এ. পাশ করার পর একবার যখন পাত্রপক্ষ থেকে বিবাহটা সেরে ফেলবার প্রস্তাব উঠেছিল, তখন কন্যার অসঙ্গত আবদারের বশীভূত না হলে নরেনের মত আদর্শ জামাতা লাভের সম্ভাবনায় আজকের এই সংশয় উপনীত হত না। কন্যার বিবাহ দেবার পরম শুভমুহূর্ত যখন উপস্থিত, তখন সেটাকে বন্ধ রেখে দিলেন কন্যাকে বি. এ. ক্লাসে ভর্তি করে। এখন ভোগ কর সেই নিদারুণ অবিবেচনার কঠিন শাস্তি।

অফিস যাবার পূর্বে অপর্ণা স্বামীকে কোনো কথা বললেন না, কিন্তু সমস্ত দিন ধরে নিরবসর চিন্তার ফলে ক্রমশ যে ক্ষোভটা পুঞ্জিত এবং বর্ধিত হল, অফিস থেকে প্রত্যাগমনের পর চা-পান করবার সময় শৈলনাথ তার লক্ষণ দেখলেন পত্নীর স্তব্ধ মলিন মুখমণ্ডলে। বুঝলেন একটা ঝটিকা আসন্ন হয়ে আছে, জলযোগ হলেই যা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠবে।

সমস্ত বেগটা হঠাৎ এক সময় ভেঙে পড়বার পূর্বে খোঁচা মেরে খানিকটা হাওয়া বার-করে দিতে পারলে উত্তরকালে কিছু সুবিধা হতে পারে মনে করে শৈলনাথ ভয়ে ভয়ে বললেন, 'অপু, মুখচন্দ্রে ছায়া পড়েছে কিসের?'

উত্তম ব্যর্থ হল। মৌনভঙ্গ তো হলই না, উপরন্তু মুখচন্দ্রে ছায়া যেন আরও ঘনীভূতই হয়ে উঠল!

একটা মাছের কচুরি হাতে তুলে ধরে পুনরায় ডিশে স্থাপন করে শৈলনাথ বলল, 'শাস্ত্রের মতে গ্রহণকালে কিছু খেতে নেই; গ্রহণ না ছাড়লে আর খাওয়া-টাওয়া হচ্ছে না।' বলে হাত গুটিয়ে বসলেন।

এবারকার কৌশল কিন্তু নিষ্ফল হল না। স-তর্জনে অপর্ণা বললেন, 'রঙ্গ রেখে শীগগির খেয়ে নাও বলছি! এখনি শ্যামপুকুর যেতে হবে।'

'কোথায়? তোমার বাপের বাড়ি?'

'হ্যাঁ।'

'তা বেশ তো, বেড়িয়ে এস না।'

'তোমাকেও যেতে হবে।'

'আমাকেও! কিন্তু আজ যে আমার একটু কাজ আছে অপু।'

'কাজ থাক, যেতেই হবে।'

'বাপ রে! ওয়ারেন্ট আছে না-কি?'

'হ্যাঁ, ওয়ারেন্ট আছে।'

মাছের কচুরিখানা হাতে তুলে নিয়ে কামড় দিয়ে শৈলনাথ বললেন, 'তা হলে চল যাই। তোমার বাপের বাড়ি আমার পক্ষে এমন আকর্ষণের জায়গা যে, ওয়ারেন্ট তো ওয়ারেন্ট, কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেলেও ভাল লাগে।'

অপর্ণা মনে করেছিলেন, অধিক বাকবিস্তার করবেন না, কারণ কৌতুক-পরিহাসের পথ একবার ভাল করে গ্রহণ করলে স্বামীকে নিরস্ত করা কঠিন, এ কথা তিনি বিলক্ষণ অবগত ছিলেন। কিন্তু বিনা প্রতিবাদে এতটা অতিশয়োক্তি পরিপাক করতেও পারলেন না, ভ্রূকুটিপূর্ণ নেত্রে বললেন, 'মিছে কথা বলো না বলছি। বছরে দুবার যাও কি না তার ঠিক নেই, আর কোমরে দড়ি বেঁধে নিয়ে গেলেও ভাল লাগে বললেই আমি বিশ্বাস করব। সে ভাল লাগত বিয়ের পর—প্রথম প্রথম।'

মাথা নেড়ে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে শৈলনাথ বললেন, 'তার মানে ভাল লাগার গুরুতর কারণটি তখন সেখানে থাকতেন। এখন তিনি এখানে থাকেন।'

অপর্ণা বললেন, 'তা নয়। তখন তিনি নতুন ছিলেন, এখন তাঁর বয়স হয়েছে বেশি।'

অপর্ণার কথা শুনে শৈলনাথ হাসতে লাগলেন; বললেন, 'এ তোমার 'স্বামী' নয় অপু, যে, বয়স বেশি হলে ভাল লাগবে না। এ স্ত্রী,—দস্তুরমত স্ত্রী। আমার ফুলও ভাল লাগে, ফলও ভাল লাগে! তখনকার দিনে তিনি ছিলেন ফুল, এখনকার দিনে ফল। তখনকার তিনি ফুল হয়ে দিতেন সুগন্ধ। এখনকার ইনি ফল হয়ে দেন রস।'

'বেশি চালাকি করো না বলছি, তা হলে এখনকার ইনি বেশ করে খানিকটা

তেতো রস খাইয়ে দেবেন। তাড়াতাড়ি খেয়ে নিয়ে তৈরি হও আমি কাপড়টা চট্ করে বদলে আসি।' বলে অপর্ণা উঠে দাঁড়ালেন।

শৈলনাথ বললেন, 'কিন্তু কি জন্য যাওয়া, তা তো শুনলাম না এখনো।'

'সে একেবারে সেখানে গিয়ে শুনো।'

'অভিযোগটা আগে শুনলে আত্মরক্ষার জন্য একটু প্রস্তুত হয়ে যেতে পারতাম।'

'আমার কথার অবাধ্য হয়ো না, তা হলে আত্মরক্ষা তোমার আপনা-আপনিই হবে।' বলে অপর্ণা প্রস্থান করলেন।

কথাটা শৈলনাথ নিজে নিজেই অনেকটা অনুমান করেছিলেন, কিন্তু গাড়িতে অপর্ণার নিকট তার যথার্থ বিবরণ পেলেন। মনটা হল কিঞ্চিৎ উদ্বিগ্ন।

১৭

দক্ষিণ দিকের দোতলার বারান্দায় ঈজি-চেয়ারে শয়ন করে গগনবিহারী একটা পুস্তক পাঠ করছেন, এমন সময় তথায় শৈলনাথ এবং অপর্ণা উপস্থিত হলেন। বৈশাখান্তের বেলা,—অল্পক্ষণ হল সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে, কিন্তু সাতটা প্রায় বাজে।

কন্যা এবং জামাতাকে একত্রে আসতে দেখে গগনবিহারী উৎফুল্ল মুখে চেয়ারের উপর সোজা হয়ে উঠে বসলেন। সাগ্রহে উভয়কে আহ্বান করে নিকটে দুখানা চেয়ারে বসিয়ে উচ্চৈঃস্বরে হাঁক দিলেন, 'দীনবন্ধু!'

অপর্ণা সর্বদাই পিতৃগৃহে যাতায়াত করেন, কিন্তু বিশেষ কোনো কারণ

ব্যতীত শৈলনাথের আসা হয়ে ওঠে না। বৎসরের মধ্যে দুটি দিন অবশ্য নির্দিষ্ট আছে—বিজয়া দশমী আর জামাই ষষ্ঠী। বয়োবৃদ্ধির অজুহাতে জামাই ষষ্ঠীর নিমন্ত্রণে শৈলনাথ মৃদু আপত্তি তোলেন, কিন্তু গগনবিহারী সে আপত্তিতে কর্ণপাত করেন না। তিনি বলেন, বয়সটা শুধু জামাতারই বাড়ছে না, সেই অনুপাতে শ্বশুরেরও বাড়ছে; এবং দ্বিতীয়ত, পরলোকগতা পত্নীর এই অতি যত্নের করণীয়টি তাঁর জীবদ্দশায় বাদ পড়লে তাঁর স্বর্গীয়া পত্নীর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধার অভাব দেখানো হবে বলে তাঁর মনে হয়। এই শেষোক্ত যুক্তির নিকট শৈলনাথ পরাজয় স্বীকার করেন।

দীনবন্ধু নিকটেই ছিল, প্রভুর আহ্বানে উপস্থিত হয়ে শৈলনাথ এবং অপর্ণাকে দেখে উৎফুল্ল মুখে উভয়কে প্রণাম করল।

গগনবিহারী বললেন, 'বউদিদিমণিকে বলে দে যে, জামাইবাবু আর দিদিমণি এসেছেন, রাত্রে খেয়ে যাবেন।'

ব্যস্ত হয়ে শৈলনাথ বললেন, 'আজ্ঞে না, খাওয়া-দাওয়ার হাঙ্গামা করবেন না, —সকাল সকালই আমরা ফিরব।'

গগনবিহারী বললেন, 'সর্বদা যারা আসা-যাওয়া করে তাদের কথা স্বতন্ত্র; কিন্তু ন-মাসে ছ-মাসে যারা একবার আসে, রাত্রি এগারোটার সময় ফিরলেও তাদের সকাল সকালই ফেরা হয়।' বলে এ প্রসঙ্গের আর অবসর না দিয়ে একেবারে প্রসঙ্গান্তরে গিয়ে পড়লেন।

ক্ষণকাল সাধারণ কথাবার্তার পর অপর্ণা আসল কথার অবতারণা করলেন, বললেন, 'বাবা, বাসুকে তোমার শাসন করতে হবে।'

অপর্ণার কথা শুনে গগনবিহারীর মুখে বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল, বললেন, শাসন করতে হবে বাসুকে? কেন, কি অপরাধ বাসু করেছে?'

'কি অপরাধ বাসু করেছে তা তো সমস্তই তুমি জান বাবা,—সে অপরাধের কথা তুমিই তো নরেনকে জানিয়েছ।'

এক মুহূর্ত নীরব থেকে গগনবিহারী বললেন, 'অপরাধের কোনো কথা তো

নবেনকে জানাই নি. তাব বিষযে বাসুব মনেব খববটুকু শুধু দিযেছি। জানতে চাইলে, প্রকৃত অবস্থা না জানিযে ভুলিযেই বা বাখি কি জন্য, তা বল ?’

এ প্রশ্নেব কোনো উত্তব না দিযে অতিশয অপ্রসন্ন স্ববে অপর্ণা বললেন ‘এ :কিন্তু বাসনাব ভাবি অবিবেচনাব কথা বাবা। সত্যিই এ তাব ভাবি অবিবেচনাব কথা।’

কথাব ঝোঁকটা এমন যে, এই অবিবেচনাব মধ্যে যেন গগনবিহাবীবও একটু অ শ আছে।

স্মিতমুখে গগনবিহাবী বললেন, ‘এ .তা শুধু বিবেচনা অবিবেচনাব কথা নয অপু,—এব মধ্যে রুচি-অরুচিব কথাও আছে। এখন. আমেব তুলনায কেউ যদি কাঁঠাল অপছন্দ কবে তা হলে তো তাকে শুধু অবিবেচনাবই দোষ দেওয যায না।’

বিস্ফাবিত নেত্রে বিস্মিত কণ্ঠে অপর্ণা বললেন, ‘নবেনকে তুমি কাঁঠাল বল বাবা ?’

মুখমণ্ডল গম্ভীব কবে গগনবিহাবী বললেন, ‘বাসু যখন তাকে পছন্দ কবছে না তখন তো আব তাকে আম বলতে পাবি নে।’

‘আম তবে কে শুনি ?—অমবেশ ?’

তাই বা কি কবে বলি ! বাসু শুধ কাঁঠালেব কথাই বলেছে, আমেব কথ এখনো কিছু বলে নি।’

‘কিন্তু নবেন তো অমবেশেব কথাই বলে। শেষকালে কি বাসনাব একটা বুড়ো বব হবে বাবা ?’ অপর্ণাব কথাব মধ্যে একটা করুণ হতাশামিশ্রিত আবেদনেব স্বব।

গগনবিহাবী বললেন, ‘একান্তই যদি তাই হয, তা হলে তুই কি কববি তা বল্ ? লোকে কথায বলে—জন্ম মৃত্যু বিযে তিন বিধাতা নিযে।’

এ সান্ত্বনায কিন্তু অপর্ণাব মন একটুও প্রবোধ মানল না ; ক্ষুব্ধ-কণ্ঠে তিনি বললেন, ‘রুচিব কথা বলেছিলে বাবা, ঐ সোনাব চাঁদ ছেলে নরেনকে

ছেড়ে বুড়ো অমরেশকে যে পছন্দ করে তার রুচির আমি একটুও সুখ্যাতি করি নে।'

গগনবিহারী বললেন 'কিন্তু এ রকম রুচি-বিপর্যয় মাঝে মাঝে ঘটে থাকে অপু। শুধু আজকালকার যুগে নয়, পৌরাণিক যুগেও এর দৃষ্টান্ত আছে। বালিকা উমা কঠোর তপস্যা করে বৃদ্ধ মহাদেবকে পেয়েছিলেন,—এ কথা তো জানিস। তারপর শৈলনাথের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'বাবা শৈলনাথ তুমি চুপচাপ বসে রয়েছ, কোনো কথা বলছ না যে?'

শৈলনাথ বললেন, 'আজ্ঞে, আমি যে কথাটাই বলব বলব মনে করছি, আপনি সেটা বলে ফেলছেন। সেইজন্য কথা বলবার সুবিধে পাচ্ছি নে।

শৈলনাথের কথা শুনে গগনবিহারী হো-হো করে উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠলেন; বললেন, 'তা হলে আমার সঙ্গে তোমার মতের মিল আছে দেখছি।'

শৈলনাথ বললেন, 'তা আছে। তারপর ভ্রূকুটি-কুটিলনয়না পত্নীর মুখের প্রতি সহসা একবার চকিত দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'প্রায় আছে।'

শৈলনাথের এই অতি-সকরুণ 'প্রায়' শব্দটি যোগের গূঢ় তাৎপর্য উপলব্ধি করে গগনবিহারী মনে মনে পুলকিত হলেন। রুষ্টা পত্নীর আরক্ত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করে সময় সময় এরূপ যোগ-বিয়োগের প্রয়োজন হয়, পত্নীর জীবদ্দশায় সেরূপ অভিজ্ঞতার সহিত তাঁরও কিছু কিছু পরিচয় ছিল। সুতরাং সে বিষয়ে কোনো প্রকার মন্তব্য না করে বললেন, 'শুধু পৌরাণিক যুগের উমার কথাই বা কেন, আজকালকার দিনেও এ রকম ঘটনা একেবারে বিরল নয়; কিছুদিন আগে 'স্টেট্‌স্‌ম্যানে' পড়েছিলাম, বিপুল সম্পত্তির অধিকারিণী তেইশ বছরের একটি সুন্দরী ইংরেজ মেয়ে একজন সত্তর বছরের বৃদ্ধকে বিয়ে করেছে। মনে করিস নে, কোন আকস্মিক উত্তেজনার বশবর্তী হয়ে। দীর্ঘ এক বৎসরের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ের পরিণতি তাদের এই বিয়ে। তা হলে শুধু উমারই বা দোষ কি তা বল্?'

আধুনিক কালের দৃষ্টান্তটি অতিরিক্ত প্রবল দেখে অপর্ণা পৌরাণিক

দৃষ্টান্তের খণ্ডনে প্রবৃত্ত হলেন ; বললেন, 'কিন্তু বাবা, উমার কথা স্বতন্ত্র। পূর্বজন্মের সতীই যে পরজন্মে উমা হয়ে জন্মেছিলেন, এ কথা তো ভুললে চলবে না।

গগনবিহারী বললেন, 'না, তা ভুললে চলবে না। কিন্তু পূর্বজন্মের উমাই যে এ জন্মের বাসনা নয়, আর মেনকা যে তুই নোস্, তারই বা প্রমাণ কোথায় বল্ ?'

গম্ভীর মুখে শৈলনাথ বললেন, 'আর আমি যে হিমালয়, তার কিন্তু প্রমাণ আছে আমার শৈলনাথ নামে।

শৈলনাথের কথা শুনে গগনবিহারী অট্টহাস্য করে উঠলেন ; বললেন, 'ষোল আনা প্রমাণ আছে। তুমি বাবাজী হিমালয় হয়ে পাশে বসে আছ, এ আমার একেবারে খেয়াল হয় নি।'

শ্বশুর-জামাতার এই ক্রম-বর্ধমান কৌতুক-পরিহাসের বহর দেখে অপর্ণা হতাশ হলেন ; ক্ষুব্ধ কণ্ঠে বললেন, 'বাবা, বাড়িতে হাসি-ঠাট্টার জন্য একটা কাজের কথা হবার উপায় নেই ; তোমার কাছে ছুটে এলাম, কিন্তু তুমিও যদি এমন করে হাসি-ঠাট্টার প্রশ্রয় দাও তা হলে যাই কোথায় বল ? আচ্ছা, বাসুর বিষয়ে তোমরা কি সকলে মিলে একটা সুপরামর্শ করবে না ? সে কি এমনি করে বিনা বাধায় যা ইচ্ছে তাই করে বেড়াবে ?

স্নিগ্ধকণ্ঠে গগনবিহারী বললেন, 'পরামর্শের কথা পরে বলছি, কিন্তু বাধা দিয়ে কি পেরে উঠবি অপু ? পঁচিশ বছর আগে তোর মা তাঁর মেয়েকে বাধা দিতে গিয়ে হার মেনেছিলেন, আর তার দু যুগ পরে এই স্বাধীনতা-স্বতন্ত্রতার কঠিন দিনে তুই তোর মেয়েকে বাধা দিতে সাহস করিস ?

গগনবিহারীর কথা শুনে অপর্ণার মুখ আরক্ত হয়ে উঠল, এবং সকৌতুক পুলকে শৈলনাথ মৃদু মৃদু হাসতে লাগলেন।

গগনবিহারী বললেন, 'তোর মা রতনপুরের জমিদারের বড় বড় থামওয়ালা বাড়ি দেখে ভুলেছিলেন, কিন্তু তার চেয়ে অনেক-গুণে সারালো জিনিস তোকে ভুলিয়েছিল বলে আজ শৈলনাথের হাতে তোর এত সুখ, এত সৌভাগ্য। কে-

বলতে পারে তোর জীবনে যেমন ঘটেছিল তোর মেয়ের জীবনেও তেমনি ঘটবে না।?"

সুপর্ণা বললেন, "কিন্তু অমরেশের কথা ভেবে দেখ বাবা, পঁয়তাল্লিশ ছেচল্লিশ বছরের কম তার বয়স হবে না। বাঙালীর পক্ষে সে তো প্রায় একটা বুড়োমানুষ। তার সঙ্গে বাসুর বিয়ে হবে?"

গগন রহাবী বললেন, 'কিন্তু কি করবি তা বল? ছেলেবেলার ছড়া মনে আছে তো? 'তালগাছ কুটুম বোসের বাটুম গোরী গো ঝি, তোর কপালে বুড়ো বর তা আমি করব কি?' অদৃষ্টের এই সান্ত্বনা অনেক মাকেই মেনে নিতে হয়েছে অপু, তোকেও তা মেনে নিতে হবে। শিব, উমা মেনকা, হিমালয় শুধু সেকালেই ছিলেন না, চিরকালই তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন মূর্তিতে মানুষের মধ্যে আছেন। উমার বিবাগ-বুদ্ধির অভাব সেইজন্য মেনকার উদ্বেগ উৎকণ্ঠার শান্তি—এ চিরন্তনের জিনিস। উমাশ্রেণীর মেয়েরা চিরদিনই মহাদেবশ্রেণীর বেথাড়া বেঢঙ অসংসারী লোকদের জন্য তপস্যা করে মরবে। রবীন্দ্রনাথের সেই কবিতাটা মনে আছে তো—

শুনি শ্মশানবাসীর কলকল
　　ওগো মরণ, হে মোর মরণ,
সুখে গৌরীর আঁখি ছলছল,
　　তাঁর কাঁপিছে নিচোলাবরণ।
তাঁর বাম আঁখি ফুরে থরথর
　　তাঁর হিয়া দুরুদুরু দুলিছে,
তার পুলকিত তনু জরজর,
　　তাঁর মন আপনারে ভুলিছে।
তাঁর মাতা কাঁদে শিরে হানি কর
　　ক্ষ্যাপা বরেরে বরিতে বরণ,
তার পিতা মনে মানে পরমাদ—

সহসা কবিতা আবৃত্তি বন্ধ করে গগনবিহারী বললেন, 'তুই যে কাঁদছিস তা তো দেখতেই পাচ্ছি। কিন্তু তুমি তো মনে মনে প্রমাদ মানছ না বাবা শৈলনাথ ?' বলে শৈলনাথের প্রতি দৃষ্টিপাত করলেন।

শৈলনাথ বললেন, 'আজ্ঞে, মানছি বইকি একটু। আপনার কন্যা আর নাতনীর মধ্যে পড়ে বেশ একটু-আধটু মানতে হচ্ছে।'

শৈলনাথের কথা শুনে গগনবিহারী হাসতে লাগলেন।

অপর্ণা বললেন, 'একটুও নয় বাবা, এ বিষয়ে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। কিন্তু ও-সব বাজে কথা যাক,—তুমি বাসুর মাথায় একটু শুভবুদ্ধি দাও, আর যাতে আষাঢ়-শ্রাবণের মধ্যে নরেনের সঙ্গে তার বিয়েটা হয়ে যায় সেই চেষ্টা কর।'

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্তার পর স্থির হল যে, আপাতত কিছুদিন বিবাহের বিষয়ে বাসনাকে কোনো প্রকার উপরোধ অনুরোধ করা হবে না, এবং তদবসরে নরেনের সহিত তার পরিচয় যাতে ঘনিষ্ঠতর হয় তার ব্যবস্থা করতে হবে।

অপর্ণা বললেন, 'তা ছাড়া, অমরেশের সঙ্গে তার দেখাশুনো একেবারে বন্ধ করা চাই বাবা।'

গগনবিহারী বললেন, 'জোর করে হঠাৎ কিছুই করতে যাস নে—তাতে বিপরীত ফল ফলবে। অমরেশের তার সঙ্গে দেখাশুনোর সুযোগ এমনিই বন্ধ হয়ে যাবে, কারণ বাসনাকে পড়াবার সুবিধা তার হবে না—এ কথা সে আমাকে বলে গিয়েছে।'

এ সংবাদে অপর্ণা অত্যন্ত আনন্দিত হলেন, কিন্তু শৈলনাথ খুশি হতে পারলেন না; বললেন, 'পড়াশুনোতে তা হলে দেখছি বাসুর ভারি অসুবিধে হয়ে গেল। অমরেশের মত শিক্ষক হঠাৎ পাওয়া সম্ভব হবে না।'

উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে অপর্ণা বললেন, 'না হোক, তার দরকার নেই। যা লেখাপড়া হয়েছে, মেয়েমানুষের পক্ষে যথেষ্ট হয়েছে।' তারপর এ প্রসঙ্গ একেবারে বন্ধ করে অন্য প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন; 'পারুল কে বাবা? পারুল নামে কোনো মেয়ের কথা তুমি জান?'

গগনবিহারী বললেন, 'জানি। কিন্তু তার কথা কেমন করে জানলি ?'

'নরেনের মুখে শুনেছি।'

'সে কার কাছে শুনল ?'

'তা তো বলতে পারি নে। কিন্তু কে সে বাবা ? অমরেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক কি ?'

গগনবিহারী বললেন, 'সে একটি আশ্রয়হীনা মেয়ে। অমরেশের সঙ্গে তার সম্পর্ক আশ্রয়দাতা আর আশ্রিতার।'

কিন্তু অপর্ণা এইটুকুতেই নিরস্ত হলেন না, প্রশ্নের পর প্রশ্নের দ্বারা ক্রমশ পারুলের সব কথাই জেনে নিলেন, অবশেষে বললেন, 'এ রকম নীচ স্ত্রীলোকের সঙ্গে যার মেলামেশা চলছে তার সংস্রব ত্যাগ করাই উচিত। তার স্বভাব-চরিত্র কখনই ভাল থাকতে পারে না।'

এ কথায় শৈলনাথ মৃদু আপত্তি উত্থাপিত করলেন, বললেন, 'এর আর একটা দিক আছে সে কথা ভুললেও চলবে না। যার চরিত্রশক্তি দৃঢ় সে রকম স্ত্রীলোকের সঙ্গে মেলামেশা করেও ভাল থাকতে পারে। কণ্ঠে বিষ ধারণ করলে মহাদেবের কোনো ভয় নেই।'

অপর্ণা বলল, 'কিন্তু অমরেশ যে মহাদেবের মত শক্তিমান পুরুষ তার কোনো প্রমাণ নেই।'

শৈলনাথ এ কথার উত্তর দেওয়ার সুযোগ পেলেন না, পাশের ঘরে টেলি-ফোনের ঘণ্টা বাজছিল, দীনবন্ধু এসে বলল, 'দিদিমণি, তোমাকে মা মণি ডাকছেন।'

দ্রুতপদে টেলিফোনের নিকট উপস্থিত হয়ে রিসিভারটা কানের কাছে ধরে অপর্ণা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে রে ? — বাসু ?'

'হ্যাঁ।'

'কি বলছিস ?'

'তোমরা কখন ফিরবে ? আধ ঘণ্টার মধ্যে ফিরতে পারবে কি ?'

'আমরা এখানে খাওয়া দাওয়া করে যাব, ফিরতে রাত সাড়ে দশটা এগারটা হবে। কেন কি দরকার ?'

'মাস্টার মশাই এসেছেন। বাবার সঙ্গে তাঁর কথা আছে।'

অমরেশ এসেছে অবগত হয়ে অপর্ণার মুখ অপ্রসন্ন হয়ে উঠল। যে সময়ে তার সংসর্গ ত্যাগ করবার পরামর্শ চলছে, ঠিক সেই সময়েই কি সে বাসনার পাশে এসে জুটল! দুষ্ট গ্রহ আর কাকে বলে! অসন্তোষের অকোমল কণ্ঠে অপর্ণা বললেন 'এখন আবার কি জন্য সে এল ?'

টেলিফোনের অপর প্রান্ত থেকে কথাগুলো এ পর্যন্ত অপ্রসন্ন সুরেই আসছিল, অপর্ণার শেষ প্রশ্নের আঘাতে সুরটা আরও রুক্ষ হয়ে উঠল, বলল, 'কি জন্য আসেন তা তো তুমি জান,—আমাকে পড়াতে আসেন। কিন্তু আজ পড়াতে আসেন নি।'

'তবে কেন এসেছে ?'

'অত কথা ফোনে শুনে কি হবে, পরে শুনো। কবে তাঁকে আসতে বলব বল।'

একটু চিন্তা করে অপর্ণা বললেন 'রবিবারে বেলা নটার সময় যেন আসে। এখন আর অপেক্ষা করবার দরকার নেই, তাকে যেতে বলে দে।

অপর প্রান্তে কণ্ঠস্বর আরও রুক্ষ হয়ে উঠল; বলল, 'সে কথা বলবার দরকার নেই, আমার সঙ্গে কথা শেষ হলে আপনিই চলে যাবেন।' যেন রিসিভার নামিয়ে রাখার শব্দ পাওয়া গেল।

'বাসু! হ্যালো—বাসু!'

কোন উত্তর পাওয়া গেল না।

রিসিভার নামিয়ে রেখে আর বারান্দায় না গিয়ে অপর্ণা অপ্রসন্ন চিত্তে অন্দরমহলে উপস্থিত হয়ে তাঁর ভ্রাতৃজায়াকে বললেন, 'বাসু ফোন করছিল, —তাড়াতাড়ি বাড়ি ফিরব। যা হয়েছে তাই দিয়ে তুমি আমাদের দুজনকে খাইয়ে দাও ভাই।'

১৮

বৈকালে অমরেশ তার পাঠাগারে বসে দর্শনশাস্ত্রের একটা গ্রন্থে মগ্ন ছিল, এমন সময়ে চায়ের পেয়ালা হস্তে পূরবী এসে ডাক দিল, 'দাদা !'

পুস্তকের পাতার উপর দৃষ্টি রেখে মৃদুস্বরে অমরেশ বলল, 'বুঝেছি।'

সহাস্যমুখে পূরবী বলল, 'কি বুঝেছ ?'

'চা এনেছিস।'

চায়ের পেয়ালা টেবিলের উপর স্থাপন করে পূরবী বলল, 'বুঝেছ তো বই বন্ধ করে খেয়েই ফেল। কালকের মত যেন ভুলে অর্ধেকটা ফেলে রেখে উঠে যেয়ো না।' বলে হাসতে লাগল।

পূরবীর কথা শুনে অমরেশ বিস্মিত হল, বলল, 'তাই না-কি পূরবী ? কাল অর্ধেকটা ফেলে রেখেছিলাম ? তারপর এক মুহূর্ত চিন্তা করে বলল, 'তা হবে। চা খেতে খেতে কাপড় বদলাতে বদলাতে হয়তো শেষ না করেই অন্যমনস্ক হয়ে বেরিয়ে গিয়েছি।'

পূরবী বলল, 'সে চা-টুকু কিন্তু তাই বলে নষ্ট হয় নি, তোমার ছাত্রী সেটুকুর সদ্ব্যবহার করেছিলেন।'

বিস্মিত কণ্ঠে অমরেশ বলল, 'আমার ছাত্রী ? কে আমার ছাত্রী ?'

'কেন, বাসনাদিদি। বাসনাদিদি ছাড়া আর কে তোমার ছাত্রী আছে ?'

এ কথা শুনে অমরেশের বিস্ময় দশগুণ বর্ধিত হল। বলল, 'বাসনা ! বাসনা কি করে সে চা খেল ? আর, আমার এঁটো চা-ই বা সে খেতে গেল কেন ?'

নিকটে একটা চেয়ারে উপবেশন করে পূরবী বলল, 'তুমি বেরিয়ে যাবার

বোধ হয পাঁচ মিনিটেব মধ্যেই বাসনাদিদি এসে উপস্থিত। মনে হল তোমাব সঙ্গেই দেখা কবতে এসেছিলেন। তুমি হযতো তখনো আছ মনে কবে তোমাব ঘবে দুজনে ঢুকে দেখি, তোমাব চটিজুতো পডে বযেছে। বুঝতে পাবলাম, তুমি বেবিযে গেছ। টেবিলেব উপব তাকিযে দেখি, পেযালায আধ কাপেব বেশি চা পডে বযেছে। বললাম, 'দেখ বাসনাদি, কি অন্যমনস্ক মানুষ আমাব এই দাদাটি! হযতো কিছু ভাবতে ভাবতে এতখানি চা ফেলে বেখে চলে গেছেন।' টেবিলেব নিকটে গিযে বাসনাদি বললেন, 'তা ভালই কবেছেন, তেষ্টায আমাবও গলাটা শুকিযে বযেছে, মিছে এটা ন. হয কেন, এই দিযে গলাটা একটু ভিজিযে নিই।' বলে পেযালা তুলে একেবাবে চুমুক।'

ঈষৎ বিবক্তিভবে অমবেশ বলল, 'একেবাবে চুমুক! তুই মানা কবলি না কেন?'

পূববী বলল, 'মানা কববাব সময পেলাম কোথায বল? আব তাই কি মানাই কবি নি? বললাম, 'বাসনাদি, ওটা যে দাদাব এঁটো চা।' বললেন, 'গুরুজনেব এঁটো খেলে দোষ নেই।' বললাম, 'তা ঠাণ্ডাই বা খাচ্ছ কেন, গবম চা কবে দিচ্ছি তোমাকে।' বললেন, 'এখন তো ঠাণ্ডাই খাই, পবে গবম চা কবে দিয়ো।' বলেই মস্ত বড এক চুমুকে একেবাবে পেযালা শেষ! আচ্ছা, বল তো দাদা, এ লোককে কি কবে ঠেকাই?'

ঠেকানো কঠিন, মনে মনে উপলব্ধি কবে অমবেশ নিঃশব্দে চাযেব পেযালাটা তুলে নিল, তাবপব গভীবভাবে একটা কিছু ভাবতে ভাবতে বড় বড় চুমুকে সেই চা দেখতে দেখতে শেষ কবে ফেলল। ভবিষ্যতে আবাব কোনো পবমাশ্চর্য ঘটনাব জন্য বোধ হয একটি বিন্দুও পড়ে বইল না।

পূববী বলল, 'তাবপব, কিছুক্ষণ পবে যখন গবম চা কবে নিযে গেলাম, তখন বাসনাদিদিব সেই সুন্দব মুখ যেন একটি বোলতাব চাক হযেছে। বললেন, 'আমি চললাম পূববী। মাসিমাব মুখে শুনলাম তোমাব দাদা তোমাদেব

অনুমতি-মাসিব বাড়ি গিয়েছেন, সেখান থেকে তাঁব ফিবতে বাত হবে।' আমি বললাম, 'তা তোমাব জন্য চা কবলাম, চা খেয়ে যাও।' বললেন, 'ঐ ঠাণ্ডা চায়েই যথেষ্ট হয়েছে, আব দবকাব নেই।' বলে সোজা একেবাবে গাড়িতে গিয়ে বসলেন। আচ্ছা, দাদা—'

অমবেশ জিজ্ঞাসু নেত্রে পূববীব প্রতি দৃষ্টিপাত কবল।

'বাসনাদিদি এমনি তো বেশ ভাল লোক কিন্তু একটু বাগী মানুষ না ?'

'একটু।' বলে অমবেশ চট কবে চেয়াব পবিত্যাগ কবে উঠে পড়ল।

পূববীও উঠে পড়ে বলল, 'খাবাব না খেয়ে বেবিয়ো না দাদা। মা খাবাব তৈবি কবছেন।'

'আচ্ছা।'

সন্ধ্যাব পব একটু চিন্তিত মনে অমবেশ বাসনাদেব গৃহে উপস্থিত হল। সামনেই ছিল শৈলনাথেব হেড খানসামা বদবী।

অমবেশ জিজ্ঞাসা কবল, 'সায়েব বাড়ি আছেন বদবী ?'

বদবী বলল, 'আজ্ঞে না, মিনিট পাঁচেক হল সায়েব বেবিয়েছেন।'

'মা ?'

সায়েব আব মা দুজনে এক সঙ্গে শ্যামপুকুবে দাদামশায়েব বাড়ি গেছেন।'

'আসতে দেবি হবে ?'

'তা তো বলতে পাবি নে হুজুব।'

একটু চিন্তা কবে অমবেশ জিজ্ঞাসা কবল, 'দিদিমণি বাড়ি আছেন ?'

এ প্রশ্নেব উত্তব দিতে হল না বদবীকে, স্বয়ং বাসনাকেই দেখা গেল। দ্বিতলেব বাবান্দা থেকে অমরেশকে গৃহে প্রবেশ কবতে দেখতে পেয়ে সে নেমে আসছিল, সিঁড়িব বাঁকের প্রশস্ত ধাপে অমবেশেব সম্মুখীন হয়ে আহ্বান কবল, 'আসুন।'

অমবেশ জিজ্ঞাসা কবল, 'কোথায় ? ওপবে ?'

হ্যাঁ।'

আর কোনো কথা না বলে বাসনাকে অনুসরণ করে অমরেশ দ্বিতলের বারান্দায় দক্ষিণ-পূর্ব কোণে উপনীত হল। সেখানে একটা বেতের গোল টেবিলের চারিদিকে চারখানা বেতের চেয়ার পাতা। একখানা চেয়ার অমরেশের দিকে এগিয়ে দিয়ে বাসনা বলল, 'বসুন।'

অমরেশ উপবেশন করলে সে বলল, 'আপনি একটু অপেক্ষা করুন এখনি আসছি আমি।'

অমরেশ বলল, 'আচ্ছা, এস।'

বৈশাখ মাস শেষের দিকে পদার্পণ করেছে। চৈত্র বৈশাখের সায়াহ্নকাল বাংলা দেশে বিধাতার আশীর্বাদ। সাগরসম্পৃক্ত সুশীতল দক্ষিণ পবন সেদিন সেই আশীর্বাদ অফুরন্ত ধারায় বহন করে আনছিল। পাশে একটা বড় টবে একগাছ বেলফুল ফুটে তীব্র মধুর সৌরভে বারান্দার সেই দিকটা আবেশ-মদির করে রেখেছে। একটা প্রকাশহীন আবেগের অনুগ্র বেদনায় অমরেশের চিত্ত অলস হয়ে উঠল, চক্ষু এল মুদ্রিত হয়ে।

ক্ষণকাল পরে বাসনা যখন ফিরে এল, তখন অমরেশের সাড়া-শব্দ নেই, —চেয়ারের পিছন দিকে মাথাটা হেলান দিয়ে নিশ্চল হয়ে পড়ে আছে। সন্তর্পণে একটা চেয়ার সরিয়ে নিয়ে ধীরে ধীরে উপবেশন করে সে নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল।

তন্দ্রা কাটতে বেশিক্ষণ লাগল না, চক্ষু উন্মীলিত করে বাসনাকে নিঃশব্দে বসে থাকতে দেখে অমরেশ সোজা হয়ে উঠে বসল; বলল, 'কতক্ষণ এসেছ?'

'বেশিক্ষণ নয়।'

তোমার এ জায়গাটার মোহ আছে বাসনা; হঠাৎ ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

বাসনা বলল, 'ঘুম নয়, একটু তন্দ্রা এসেছিল। একটা ঈজি-চেয়ার আনিয়ে দেবো, একটু ঘুমিয়ে নেবেন?'

বাসনার প্রস্তাব শুনে অমরেশ আরো একটু খাড়া হয়ে উঠে বসল; বিস্ফারিত

নেত্রে বলল, 'বল কি তুমি! আমি কি তোমাদের এখানে ঘুমোতে এসেছি?'

'তবে কি জন্য এসেছেন?'

অদ্ভুত এই অতর্কিত অসুবিধাজনক প্রশ্ন! একটু বিমূঢ় বোধ করে অমরেশ বলল, 'কি জন্য এসেছি তা হঠাৎ এক কথায় ঠিক করে বলা শক্ত; কিন্তু ঘুমোতে যে আসি নি তা বলা শক্ত নয়।' বলে হাসতে লাগল।

অপলক নেত্রে অমরেশের প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে বাসনা বলল, 'আমি কিন্তু বলতে পারি কি জন্য আপনি এসেছেন।'

সকৌতূহলে অমরেশ জিজ্ঞাসা করল, 'কি জন্য এসেছি?'

'আমার আবেদন অগ্রাহ্য, সেই কথা বলতে।'

বিস্মিত স্বরে অমরেশ বলল, 'তোমার আবেদন অগ্রাহ্য? কি তোমার আবেদন বাসনা?'

'সেদিন রাত্রে গাড়িতে বসে আপনার কানে কানে বলেছিলাম তো। ভুলে গেছেন এরই মধ্যে?'

স্নিগ্ধ অবিচলিত কণ্ঠে অমরেশ বলল, 'না ভুলি নি, মনে আছে। তোমার সে কথাকে নিতান্তই যদি আবেদন বল, তা হলে তোমার সে আবেদনের কথা এই তিন চার দিনের মধ্যে অনেকবারই ভেবেছি, আর প্রতি বারই মনে হয়েছে সে আবেদন সম্পূর্ণ নিরর্থক; কোনো তার কারণ নেই, কোনো প্রয়োজন নেই।'

নিরুদ্ধ নিঃশ্বাসে বাসনা বলল, 'নেই? কে বলল আপনাকে নেই?'

তেমনি স্নিগ্ধ কণ্ঠে অমরেশ বলল, 'তুমি তো বিপন্ন নও বাসনা, তুমি তো আশ্রয়হীন নও। আমার শরণাগত হবার সত্যিই তো তোমার কোনো প্রয়োজন নেই।'

অমরেশের প্রতি বাসনা এক মুহূর্ত নির্বাক হয়ে চেয়ে রইল, তারপর

আরক্ত মুখে উচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল, 'কিন্তু যদি বলি, আছে? যদি বলি আপনি আমার পড়াশুনো বন্ধ করে দেবার যোগাড় করেছেন? যদি বলি, আপনার জন্য এই বাড়ির আশ্রয় থেকে আমাকে হয়তো অনিচ্ছা সত্ত্বেও বঞ্চিত হতে হবে,—তা হলে?'

গভীর আর্তকণ্ঠে অমরেশ বলল, 'তা হলে আমি ভারি দুঃখিত হব,—কিন্তু আমার জন্য, সে কথা স্বীকার করব না।'

দৃপ্ত স্বরে বাসনা বলল, 'হ্যাঁ, আপনারই জন্য। লেখাপড়া নিয়ে মনের আনন্দে আমার দিন সুখে স্বচ্ছন্দে কাটছিল, কেন আপনি তার মধ্যে এমন করে বিঘ্ন নিয়ে এলেন?'

'বিঘ্ন কেন বলছ বাসনা?'

'কেন বলছি, এখনো তা আপনি বুঝতে পারছেন না?'

'না, সত্যিই পারছি নে,—পারুলের সঙ্গে কোথায় তোমার বিরোধ, সত্যিই ত আমি বুঝি নে।'

'তা হলে কোনো কথাই আপনার বুঝে কাজ নেই।' বলে চেয়ার ত্যাগ করে বাসনা রেলিঙের ধারে গিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়াল।

এ অবস্থায় কি করা কর্তব্য ভেবে অমরেশ চিন্তিত হয়ে উঠেছে, এমন সময়ে দুই হাতে কাঠের ট্রে ধারণ করে দূরে একজন ভৃত্যকে দেখা গেল। ট্রের উপর চায়ের বিবিধ সরঞ্জাম এবং কয়েক প্রকার খাদ্যের ডিশ সাজানো।

পদশব্দে ফিরে দেখে বাসনা চেয়ারের কাছে এসে দাঁড়াল এবং ভৃত্য নিকটে উপস্থিত হলে ট্রের উপর থেকে দ্রব্যগুলো নিয়ে অমরেশের সম্মুখে টেবিলের উপর রাখতে লাগল।

বিস্মিত কণ্ঠে অমরেশ বলল, 'এ সব কী বাসনা?'

বাসনা বলল, 'বলছি, একটু সবুর করুন।'

ভৃত্য বলল, 'চা তৈরি করে দিয়ে যাই দিদিমণি?'

বাসনা বলল, 'না, তুই যা. আমি করে দিচ্ছি।' তারপর ভৃত্য অদৃশ্য হলে চা তৈরি করতে করতে বলল, 'এ সব চা আর খাবার। নিন, খেতে আরম্ভ করুন।'

'কিন্তু বাড়ি থেকে এখনি যে আমি চা আর খাবার খেয়ে আসছি বাসনা।'

চায়ের পেয়ালাটা অমরেশের হাতের কাছে এগিয়ে দিয়ে বাসনা বলল, তা আমি জানি। আধ পেয়ালা চা ফেলে রেখে ছুটে আসবার মত জায়গা আমাদের বাড়ি যে নয়, সে কথা আমাকে না বললেও চলে।'

এত গোলযোগের অবস্থাতেও বাসনার কথা শুনে অমরেশের মুখে হাস্যের ক্ষীণ রেখা ফুটে উঠল, চায়ের পেয়ালায় মুখ দিয়ে বলল, 'কিন্তু পুরো পেয়ালা চা খেয়ে এলেও আবার চা খাবার মত জায়গা যে তোমাদের এ বাড়ি, সে কথাও তোমাকে না বললেও বোধ হয় চলে।'

বাসনা বলল, 'সেটা ভয়ে, খুশি হয়ে নয়।'

চায়ের পেয়ালাটা টেবিলের উপর স্থাপন করে কপট বিস্ময়ের সুরে অমরেশ বলল, 'ও কথা বলো না বাসনা। ছাত্রীর ভয়ে গুরুমশাই খাওয়ার উপর খায়, এ কথা জানতে পারলে লোকের কাছে গুরুমশায়ের প্রতিষ্ঠা নষ্ট হবে।'

বাসনা বলল, 'একটুও নষ্ট হবে না,--বদরাগী ছাত্রীদের গুরুমশায়রা ভয় করে এ কথা সকলেই জানে।' বলে একটা ডিশ থেকে একখানা কাটলেট অমরেশের হাতে তুলে দিল।

কাটলেটখানা হাতে নিয়ে অমরেশ বলল, 'বিচার করলে নিজে, আবার দণ্ডও দিচ্ছ নিজের হাতে! তোমাকে হিংস্র হাকিম বললে রাগ করতে পার না বাসনা।'

এ কথার উত্তরে বাসনা কোনো কথাই বলল না, শুধু একটা অনির্দেশ্য বেদনার আবেগে তার দুই চক্ষু অশ্রুভারাক্রান্ত হয়ে উঠল। সুমার্জিত কৌতুক-পরিহাস-খচিত এই ধরণের সরস কথোপকথন তার দৈনন্দিন জীবনের অতি-পরিচিত প্রিয়

বস্তু, যা সে অমরেশের নিকট হতে প্রতিনিয়ত প্রচুর পরিমাণে পেয়ে এসেছে। কিন্তু দুরদৃষ্ট বুঝি সেই সম্পদ হতে আজ তাকে চিরদিনেরই জন্য বঞ্চিত করতে উদ্যত।

ভয়েই হোক আর খুশি হয়েই হোক, আহার পর্ব শেষ হল। বাথ-রুম থেকে হাত-মুখ ধুয়ে এসে অমরেশ বলল, 'এবার আমি উঠব বাসনা। কিন্তু তোমার বাবা যদি শীঘ্র ফেরেন, তা হলে একটু বসে তাঁর সঙ্গে দেখা করে যাই।

বাসনা জিজ্ঞাসা করল, 'তাঁর সঙ্গে আপনার কি দরকার?'

'একটু কথা আছে।'

'কি কথা?'

একটু ইতস্তত করে অমরেশ বলল, 'এসেছি যখন মুখে মুখেই তার কাছে বিদায়টা নিয়ে যেতাম।'

বাসনার মুখ কালো হয়ে উঠল, বলল, 'বিদায় নিয়ে যেতেন? চিরদিনের জন্য নাকি?'

'ভবিষ্যৎ তো অনিশ্চিত বাসনা, কি করে বলব বল?'

'ও! সে কথা মনে ছিল না। আচ্ছা, একটু বসুন, ফোন করে জেনে এসে বলছি।'

ফোন করবার জন্য বাসনা প্রস্থান করলে অমরেশ ধীরে ধীরে সুগভীর চিন্তার মধ্যে নিমগ্ন হল। সেদিন গগনবিহারীর গৃহ হতে প্রত্যাবর্তনের পথে মোটর থেকে অবতরণ করে বাসনার কথা শুনে যে ক্ষীণ সংশয় তার মনের মধ্যে দেখা দিয়েছিল, আজ যেন তা সকল সংশয়ের সীমান্তরেখা পার হয়ে গেল। 'পারুলের সঙ্গে কোথায় তোমার বিরোধ সত্যিই'। আমি বুঝি নে,—অমরেশের এই উক্তির উত্তরে 'তা হলে কোন কথাই আপনার বুঝে কাজ নেই' —বাসনার এই কয়েকটি কথা যেন তার অন্তরের অনেক কথাই প্রকাশিত করল। দুর্মদ অভিমানের এই উচ্ছ্বসিত বাণী হতে এই কথাই নির্দেশ করল যে, পারুলের সহিত তার বিরোধের যথার্থ কারণ সামাজিক নৈতিকতার মধ্যে ততটা পাওয়া যাবে না, যতটা পাওয়া যাবে ততোধিক জটিল এবং প্রবল কোনো হৃদয়বৃত্তির মধ্যে। অর্থাৎ, ঘৃণা এবং ঈর্ষা যেমন এক বস্তু নয়, ঠিক তেমনি পারুলের বিরুদ্ধে তার মুখের অভিযোগ আর মনের অনুযোগও এক বস্তু নয়।

কিন্তু এ সংশয় যদি সত্য সত্যই মিথ্যা না হয়, তা হলে বাসনার ভবিষ্যৎ জীবনের দুঃখ গ্লানির অনিবার্যতা আশঙ্কা করে অমরেশের মনে তীব্র দুশ্চিন্তা দেখা দিল। জীবনের মধ্যে এই অসঙ্গতিকে প্রশ্রয় দিলে ফল তার কখনই ভাল হবে না, অবিমৃষ্যকারিতার দণ্ড হাতে হাতে গ্রহণ করতে হবে। সরস উর্বর ভূমি পরিত্যাগ করে শুষ্ক ঊষর ক্ষেত্র অবলম্বন করলে লতার কল্যাণ নেই, এ কথা বাসনাকে কে বোঝাবে?

মনে মনে অমরেশ এ প্রশ্নের উত্তর দিয়ে বলল—আমি ছাড়া আর কে

বোঝবে? আমিই বোঝাব। অনিষ্টের মূল যত শীঘ্র উৎপাটিত করে ফেলা যায় ততই মঙ্গল,—সুতরাং বিলম্ব নয়, আজই।

কিন্তু তার এ সংশয় যদি বস্তুত অমূলক হয়, ঔষধ প্রয়োগ করতে গিয়ে যদি দেখা যায় যে, ব্যাধির অস্তিত্ব নেই, তখন যে মহা লজ্জায় পড়তে হবে! অহেতুক চর্চার ধৃষ্টতা নিয়ে পালাবার পথ খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু তা হোক, এ আশঙ্কা বরণ করেও সে বাসনাকে সাবধান করে দিতে প্রবৃত্ত হবে। এ ক্ষেত্রে নিজের সুবিধা অসুবিধার কথা ভাবতে গেলে চলবে না।

ক্ষণকাল পরে বিরস অপ্রসন্ন মুখে বাসনা ফিরে এল। রুদ্ধ গভীর কণ্ঠে সে বলল, 'আর আপনার অপেক্ষা করে কোনো লাভ নেই, ওঁদের ফিরতে অনেক রাত্রি হবে। ওঁরা বললেন, যদি ইচ্ছে করেন, রবিবারে বেলা নটার সময়ে দেখা করতে আসতে পারেন। কিন্তু আমি বলি, তার আর বিশেষ কোনো প্রয়োজন আছে কি?'

অমরেশ বলল, 'না, কিছুই নেই।'

আর চেয়ারে উপবেশন না করে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বাসনা বলল, 'যা বলবার আমিই না হয় বলে দোব?'

অমরেশ বলল, 'তাই দিয়ো।'

'আচ্ছা, আর বোধ হয় আমাদের কোনো কথাবার্তা নেই।'—বলে বাসনা গমনোদ্যত হল।

অমরেশ বলল, 'আর মিনিট দু-চার বসলে তোমার বিশেষ অসুবিধা হবে কি বাসনা?'

এ কথার কোনো উত্তর না দিয়ে বাসনা ধীরে ধীরে একটা চেয়ারে উপবেশন করল।

কথাটা কি ভাবে আরম্ভ করবে মনে মনে এক মুহূর্ত ভেবে নিয়ে অমরেশ বলল, 'আমাকে যদি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী বলে মনে কর বাসনা—'

অসমাপ্ত বাক্যের মধ্যে অধীরভাবে মাথা নেড়ে বাসনা বলল, 'না, আপনাকে আমি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী বলে মনে করি না।'

ক্ষণকাল অপলক নেত্রে বাসনার দিকে চেয়ে থেকে অমরেশ বলল, 'তবে কি তুমি আমাকে তোমার অশুভাকাঙ্ক্ষী বলে মনে কর?'

'হ্যাঁ, তাই করি।'

শান্ত কণ্ঠে অমরেশ বলল, 'তা হলে তো আমার বক্তব্য খুবই সংক্ষিপ্ত আর সহজ হয়ে গেল। শোন বাসনা, এই শুভাকাঙ্ক্ষী লোকটির সঙ্গে আজ থেকে তোমার বাইরের বাঁধন তো আমি শেষ করে দিলাম, ভিতরে যদি কোনো রকমের বন্ধন থাকে তা ও তুমি শেষ করে দাও। অশুভ গ্রহের সঙ্গে যোগ রেখে কোনো মঙ্গল নেই।'

ভ্রুকুঞ্চিত করে বাসনা বলল, 'মঙ্গল নেই, ত তো আপনি প্রমাণ করেছেন, কিন্তু আপনার সঙ্গে আমার ভিতরের কি বন্ধন থাকতে পারে বলুন তো?'

অমরেশ বলল, 'সে কথা তুমিই বলতে পার। আমি কি করে বলব বল? ভক্তি-শ্রদ্ধার কথা বলতে তো আর সাহস হয় না। তবে পশু-পক্ষীর প্রতিও তো মানুষের মায়া মমতা থাকতে দেখা যায়,—আশ্চর্য হব না যদি আমারও প্রতি তোমার তেমনি একটা কিছু থাকে।'

উত্তপ্তস্বরে বাসনা বলল, 'যদিই বা কিছু ছিল, এখন কিন্তু আর নেই।'

অমরেশ বলল, 'তা হলে ভালই হয়েছে। যে অপাত্র, তার বঞ্চিত হওয়াই উচিত।'

তীক্ষ্ণ চক্ষে অমরেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বাসনা বলল, 'তাই? না, যে-পাত্র পূর্ণ হয়ে গিয়েছে তাতে আর অন্য কোনো জিনিসের স্থান নেই?'

মৃদু স্বরে অমরেশ বলল, 'তর্কের দ্বারা এসব কথার মীমাংসা হয় না বাসনা, তর্ক আজ থাক্। আজ তোমাকে আমি শুধু এই কথা বলতে চাই যে, জীবনের বড় বড় সমস্যাগুলোর সমাধান করবার সময়ে নিজের হৃদয়াবেগকে খুব বেশি

প্রশ্রয় দিতে নেই ; যারা বয়সে বড়, যারা হিতৈষী, যাদের ভাল-মন্দ বিচার করবার শক্তি হয়েছে, তাদের মতামমত গ্রহণ করা উচিত।'

অধীরভাবে বাসনা বলল, 'আচ্ছা, জীবনের বড় বড় সমস্যা সমাধান করবার সময়ে তাদের মতামত না-হয় গ্রহণ করব ; কিন্তু আপনি কি মনে করেন, পারুল আমার জীবনের একটা বড়-রকমের সমস্যা ?,

অমরেশ বলল, 'না। বড় রকমের তো নয়ই, ছোট রকমেরও আশা করি নয় ; অন্তত হওয়া তো উচিত নয়।'

'তবে এসব কথার অর্থ কি ?'

'তবু আমার মনে হয়, এসব কথা একেবারে অর্থহীন নয়। পারুল তোমার জীবনের কোনো সমস্যা নয় তা নিশ্চয়, কিন্তু তোমার জীবনে অন্য সমস্যা দেখা দিয়েছে।'

গভীর কৌতূহলে বাসনা জিজ্ঞাসা করল, 'কি সমস্যা ?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে অমরেশ বলল, 'উপস্থিত নরেনবাবু তোমার জীবনে সমস্যা হয়েছেন।'

অবিচলিত কণ্ঠে বাসনা বলল, 'না। এ আপনার ভুল ধারণা। পারুল যদিও বা আমার জীবনের সমস্যা হয়ে থাকে, নরেনবাবু কোনো সমস্যাই নন। তাঁকে নিয়ে আমার কোনো দুশ্চিন্তা নেই।'

'তুমি তা হলে তাঁর বিষয়ে মন স্থির করেছ ?'

নির্বিকল্প প্রশান্তির সহিত বাসনা বলল, 'কোনো দিনই তো তাঁর বিষয়ে আমার মন অস্থির করি নি।'

একটু চিন্তা করে অমরেশ বলল, 'তা হলে অন্তত তোমার বাবা আর মার পক্ষে নরেনবাবু সমস্যা হয়ে উঠলেন, কারণ তাঁরা বোধ হয় তোমার আর নরেনবাবুর বিষয়ে কতকটা মন স্থির করেছেন ?'

বাসনা বলল, 'তা হলে সে সমস্যার সমাধান তাঁরা নিজেরাই করবেন,—

আমি তাব কি কবব বলুন ? আমাব সমস্যা তো কেউ সমাধান কবে দেয না। দেবেন আপনি আমাব সমস্যাব সমাধান কবে ?'

বাসনাব প্রশ্নে অমবেশেব মনে চিন্তা দেখা দিল, মনে কবল, এবাব বুঝি প্রকৃত সঙ্কটেব সম্মুখীন হবাব সময উপস্থিত হল। যে কথা উত্থাপিত কববাব জন্য এতক্ষণ সে নানা দিক দিযে চেষ্টা কবছিল, স্বযং বাসনাই বুঝি এবাব তা উত্থাপিত কবল, মৃদুস্ববে বলল, 'ক তোমাব সমস্যা, বল ?'

অমবেশেব প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ কবে বাসনা বলল, 'হঠাৎ যদি জীবন অর্থহীন হযে যায তা হলে সে জীবনেব অর্থ খুঁজে কোথায পাব, এই আমাব সমস্যা। কিন্তু থাক সে সমস্যাব কথা—আমাব সমস্যা আমি নিজেই সমাধান কবব।'

অমবেশ বলল, 'কিন্তু বাসনা, নবেনবাবুব কথা নিযে আমবা যদি একটু আলোচনা কবি, তা হলে হযতো তোমাব সমস্যাবও খানিকটা সমাধান হতে পাবে।'

এবাব বাসনা হেসে ফেলল, বলল, 'ঠিক যেমন জলে চাল ফেলে একটু ফোটালে ডাল খানিকটা সিদ্ধ হতে পাবে।' বলে ধীব ধীবে চেযাব থেকে উঠে দাঁড়াল।

অমবেশও দাঁড়িযে উঠে বলল, 'কি ? এবই মধ্যে দু-চাব মিনিট হযে গেল না-কি ?'

বাসনা বলল, 'দু মিনিটও হযে গিযেছে চাব মিনিটও হযে গিযেছে ; এমন কি, দুই আব চাবে ছ মিনিট, কিংবা চাব দুগুণে আট মিনিট, তাও হযে গিযেছে।

অমবেশ বলল, 'কিন্তু দুযেব পিঠে চাব চব্বিশ মিনিট তো এখনও হয নি ?'

পূর্বেকার কথোপকথনেব ধাবায পুনবায প্রবেশ করছে দেখে বাসনা একটু স্তব্ধ হযে গেল। মনে মনে বলল, কিছুকাল আগে হলে চাবেব পিঠে দুই বিযাল্লিশ মিনিটেও বোধ হয কুলোত না, কিন্তু দিনকাল বদলে গেছে। প্রকাশ্যে

শুষ্ক কণ্ঠে বলল, 'কি হবে অদরকারী কথার মিথ্যে আলোচনা করে? তা ছাড়া, কিছু মনে করবেন না, এ প্রসঙ্গগুলো একটু ব্যক্তিগত নয় কি?'

অমরেশ বলল 'অর্থাৎ, আমার পক্ষে অনধিকারচর্চা বলছ?'

'যদিই বলি?' বাসনার মুখে মৃদু হাস্যের তীক্ষ্ণ রেখা।

অমরেশ বলল, 'তা হলে অন্যায় কথা বলবে, কারণ, মুখে তুমি যা-ই বল না কেন, মনে মনে নিশ্চয় জান যে, আমি তোমার হিতৈষী, শুভাকাঙ্ক্ষী। সুতরাং —'

অমরেশকে থামিয়ে দিয়ে বাসনা বলল, 'ও আর অত স্পষ্ট করে বলতে হবে না, ও বুঝতে পেরেছি। কিন্তু মনে মনে আমি যদি জানি যে, আপনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী, তা হলে মনে মনে এ কথাও নিশ্চয় জানি যে, কিসে আমার শুভ, আর কিসে অশুভ, তা আপনি জানেন না,—সে বিষয়ে আপনার ভুল ধারণা আছে।'

বাসনার কথা শুনে অমরেশের মুখে নিঃশব্দ হাস্য ফুটে উঠল, বলল, 'তা আছে কি-না জানি নে। আমি কিন্তু তোমাকে এতক্ষণ এই কথাই বোঝাতে চেষ্টা করছিলাম যে, কিসে তোমার শুভ আর কিসে অশুভ, সে কথা তুমিই জান না,— সে বিষয়ে তোমারই ভুল ধারণা আছে।'

শান্তস্বরে বাসনা বলল, 'তা হবে। নিমপাতা তেতো কি মিষ্টি তা হয়তো আমিই জানি নে—সে বিষয়েও হয়তো আমার ভুল ধারণা আছে।' তারপর এক মুহূর্ত নীরব থেকে বলল, 'দেখুন, একটু আগে আপনি যে কথা বলছিলেন তা ঠিক,—তর্কের দ্বারা এ সব কথার মীমাংসা হয় না। সুতরাং বৃথা তর্ক বন্ধ করাই ভাল।'

অমরেশ বলল, 'বন্ধই তা হলে করা যাক। কিন্তু তোমার কি এখন বিশেষ কোনো কাজ আছে বাসনা? মনে হচ্ছে, তুমি যেন একটু ব্যস্ত হয়ে আছ।'

বাসনা বলল, 'হ্যাঁ, ব্যস্তই একটু আছি,—একটা জরুরি চিঠি লিখে শেষ করতে হবে।'

আজ রাত্রেই ?—এত জরুরি ?'

'হ্যাঁ, খুব জরুরি।'

'আচ্ছা, আমি তা হলে এখন চললাম। তুমি সুখী হও, সৌভাগ্যবতী হও। জীবন তোমার সহজ হোক, সুন্দর হোক। এ ছাড়া আর আমার কিছু বলবার নেই।'

অমরেশের দিকে স্বল্প একটু এগিয়ে এসে বাসনা বলল, 'এ আপনি আশীর্বাদ করছেন, না, প্রার্থনা করছেন !'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে স্মিতমুখে অমরেশ বলল, 'এ আমি কামনা করছি।'

গভীর মৃদুস্বরে বাসনা বলল, 'আমি প্রার্থনা করছি, আপনার এ কামনা পূর্ণ হোক।' তারপর নত হয়ে অমরেশের পদধূলি গ্রহণ করে দাঁড়িয়ে উঠে বলল, 'আচ্ছা, এবার তা হলে আসুন। চলুন, আপনাকে এগিয়ে দিয়ে আসি।' বলে অমরেশের অগ্রবর্তিনী হল।'

চলতে চলতে অমরেশ বলল, 'আচ্ছা, তা না হয় চল, কিন্তু হঠাৎ পায়ের ধুলো নিলে কেন বাসনা ?'

অমরেশের আগে-আগে চলতে চলতে বাসনা বলল, হঠাৎ ইচ্ছে হল, তাই নিলাম।'

অমরেশের মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিল ; বলল, 'হঠাৎ ইচ্ছে হলে কোনো কাজ করে ফেলাকে অভিধানে হঠকারিতা বলে। হঠকারিতার পরিণাম অনুশোচনা, তা জান তো ?'

এ কথার আর বাসনা কোনো উত্তর দিল না।

সিঁড়ির যে স্থান হতে অমরেশকে ডেকে নিয়ে গিয়েছিল, ঠিক সেই পর্যন্ত তাকে এগিয়ে দিয়ে সে ধীরে ধীরে উপরে ফিরে এল।

নিজ কক্ষে প্রবেশ করে কিছুক্ষণ সে অন্ধকারে নিঃশব্দে শয্যার উপর উপুড় হয়ে পড়ে রইল, তারপর শয্যা ত্যাগ করে টেবিল-ল্যাম্প জ্বেলে চিঠি লিখতে প্রবৃত্ত হল।

চিঠির কাগজের ডান দিকের কোণে তারিখ এবং সময় লিখে ক্ষণকাল সে স্তব্ধ হয়ে বসে রইল। বোধ হয়, কোন্ সম্বোধন-শব্দ প্রয়োগ করবে সেই কথাই মনে মনে চিন্তা করছিল। প্রথমে লিখল 'শ্রীচরণকমলেষু'—তারপর কি ভেবে সে চিঠির কাগজখানা প্যাড থেকে খুলে ফেলে দিয়ে নূতন করে লিখল 'শ্রদ্ধাস্পদেষু'। তারপর তার নীচে নিম্নলিখিত চিঠিখানা লিখে শেষ করল।

'চিঠি আরম্ভ করলাম 'শ্রদ্ধাস্পদেষু' দিয়ে—কিন্তু এ হঠকারিতা বশত নিশ্চয় নয়,—কারণ প্রথমে আর একটা শব্দ লিখেছিলাম, পরে ভেবে-চিন্তে সে কাগজ-খানা বাতিল করে লিখছি 'শ্রদ্ধাস্পদেষু'। সুতরাং, আশা করি, আপনার হিসাবমত এর জন্য অনুশোচনা করতে হবে না।'

যে জরুরি চিঠি লেখবার কথা একটু আগে আপনার কাছে বলেছিলাম, তা যে এই চিঠিই, সে কথা বোধ করি না বললেও চলে। এ চিঠি লেখবার প্রকৃত উদ্দেশ্য পরে ব্যক্ত করব,—তার আগে আপনার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি।

আজ আপনি আমাদের বাড়ি আসবার পর বাক্যে এবং আচরণে আপনার প্রতি যদি কিছু অন্যায় করে থাকি, তার জন্য আপনি আমাকে অনুগ্রহ করে ক্ষমা করবেন। এত দিন দেখে দেখে আমাকে জানতে তো আপনার বাকি নেই। এত বড় রাগী আর তার্কিক মেয়ে আপনি আর দেখেছেন কি-না জানি নে, আমি তো নিশ্চয় দেখি নি। আমার যখন পাঁচ ছয় বৎসর বয়স, তখন আমার তর্ক করবার বহর দেখে বাবা আমার নাম দিয়েছিলেন 'তর্কপটিষ্ঠা'।

আমার তার্কিকপনার পরিচয় এই দুই বৎসরে আপনাকেও কম পেতে হয় নি। তা ছাড়া, হরিদ্বার থেকে আপনি ফিরে আসার পর আপনার সঙ্গে যে রকম তর্ক করেছি, তাতে আপনি আমার নাম 'তর্কপটিষ্ঠা'র পরিবর্তে

'তর্কপাপিষ্ঠা'ও দিতে পারেন। তর্ক করব না বলে সঙ্কল্প নিতান্ত কম করি নে, কিন্তু কার্যকালে কিছুই মনে থাকে না। স্বভাবত যারা রাগী, তাদের স্বভাব পরিবর্তিত করার মত কঠিন ব্যাপার সংসারে বোধ হয় আর কিছুই নেই,—মনে হয়, কয়লাকে ধুয়ে সাদা করে ফেলার মতই তা অসম্ভব। এই সব কথা বিবেচনা করে আপনি আমাব প্রকৃতির ত্রুটি-বিচ্যুতি অনুগ্রহ করে ক্ষমা করবেন।

এইবার আসল কথাটা বলি। কথা প্রসঙ্গে আজ আপনি বলছিলেন, 'পারুলের সঙ্গে কোথায় তোমার বিবোধ তা আমি বুঝতে পারি নে।' এই ধরণের কথা এর আগেও আপনি কযেকবাব বলেছেন। বুঝতে পারছি, পারুলের সম্পর্কে আপনার সঙ্গে আমাব আচবণ আপনাব কাছে একটা রহস্য হয়ে আছে। সত্যি কথা বলতে কি, আমার কাছেও তা যে একেবারেই বহস্য নয, তাও বলতে পারি নে। আমিও এক এক সময আশ্চর্য হযে ভাবি, আপনি আমাকে পড়ান, আমি আপনাব কাছে পড়ি, সম্পর্ক তো মাত্র এই—এব মধ্যে পারুল প্রবেশ করে কেমন করে, আব কোথা দিয়ে? পারুলের চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে চেষ্টা করি, কিন্তু পারি নে; মনের মধ্যে খচখচ করে সে তার অস্তিত্ব বজায রাখে।

তথাপি, পারুল আমার পক্ষে তেমন কোন সমস্যাই নয়; সমস্যা আপনি। আপনি না হযে যদি আমার আগেকাব শিক্ষক প্রফেসাব বৃন্দাবন মুখোপাধ্যায় হতেন, তা হলে পারুল পারুলই থাকত, যেমন আরও শত শত পারুল রয়েছে; তাতে কোন ক্ষতি হয় না। শুধু পড়াটুকু বুঝে নিলেই যার সঙ্গে দেনা-পাওনার শেষ, কি প্রয়োজন তাব ব্যক্তিগত জীবনের খুঁটিনাটির সঙ্গে নিজেকে জড়িত করে? কিন্তু এই দুই বৎসর আপনাকে আমি শুধু শিক্ষকরূপেই পাই নি, পেয়েছি আমার জীবনের আদর্শরূপে। আপনার শিক্ষা দীক্ষা রুচি অভিমত চরিত্রবল—এমন কি আপনার ধর্মবিশ্বাস পর্যন্ত আমি একান্ত নিষ্ঠার সহিত অনুসরণ করেছি। এক কথায়, আপনার মাটিতে আমি নিজেকে রোপন

করে বাড়িয়ে তুলেছি। আমার সৌভাগ্যক্রমেই বলুন, আর দুর্ভাগ্যক্রমেই বলুন, শুধু শিক্ষার প্রয়োজনেই আপনার সঙ্গ আমার প্রয়োজনের বস্তু ছিল না, রুচির দিক দিয়ে আপনার সঙ্গ আমার কামনার বস্তু ছিল।

রুচির মিলের সঙ্গে মনের মিলের এমন অদ্ভুত একটা সাদৃশ্য আছে যে, আমাদের রুচির মিলকে ক্রমশঃ আমি আমাদের মনের মিলের মত একটা বস্তু বলে ভুল করে বসেছিলাম। এত দিন আমার ধারণা ছিল যে, অন্নবস্ত্রের অভাবই আশ্রয় লাভের একমাত্র দাবি নয়, মনের দিক থেকেও আশ্রয় লাভের একটা দাবি থাকতে পারে। আজ যখন আপনি বললেন যে, আমি আশ্রয়হীন নই, তাই আপনার নিকট আমার আবেদন সম্পূর্ণ নিরর্থক, তার কোন প্রয়োজন নেই, তখন বুঝলাম আমার সে দাবির মূল্য এক কানাকড়িও নয়। আমার আশ্রয় আছে, আমার অন্নবস্ত্রের অভাব নেই,—এ যে আমার পক্ষে এত বড় একটা অপরাধ তা আগে জানতাম না। এই অপরাধের জন্য পাঁকলের দাবির বিরুদ্ধে আমার দাবি এত অবলীলার সহিত আপনি অগ্রাহ্য করতে পারলেন।

এ আপনি কেন পারলেন তা জানেন? আপনি হয়তো বলবেন, যে যুক্তি-দেবতার আপনি উপাসক তার সহায়তায়, তার অনুগ্রহে। কিন্তু এ আপনার ভুল ধারণা। যে যুক্তি ভাল মন্দের, পাপ-পুণ্যের ভেদ করে না সে যুক্তি যুক্তি-দেবতা নয়, সে যুক্তি যুক্তি দানব। নিকৃষ্ট আর উৎকৃষ্ট, ইতর আর অভদ্রকে এক দৃষ্টিতে দেখাকে আপনি যে মনের উদারতা বলে মনে মনে দম্ভ করেন, বস্তুত কিন্তু সে জিনিস তা নয়, সে হচ্ছে ধর্মহীন ঈশ্বরহীন মনের অনাচার। তার মধ্যে বিচারের নাম-গন্ধ নেই।

আমি বুঝতে পারছি, আমার এ কথাগুলো একটু বেশি রকম কটু হয়ে পড়ছে। কিন্তু যে সত্যকে সম্প্রতি আমি মনের মধ্যে খানিকটা উপলব্ধি করেছি বলে মনে করছি, তাকে প্রকাশ না করেও উপায় নেই। আমার মনে হয়, আমাদের সামান্য মনের ছোট ছোট যুক্তি আমাদের জীবনের খুব বড় বড় ব্যাপারে খাটাতে নেই। যা দেখতে পাচ্ছি নে, শুনতে পাচ্ছি নে, তা আমার পক্ষে নেই, অতএব প্রমাণের

অভাবে ঈশ্বর অসিদ্ধ—এ রকম যুক্তির দ্বারা আমরা পাপাচার করি, ঈশ্বরের নাস্তিকত্ব প্রমাণ করি নে।

এর দ্বারা ভাল হয় না,—আত্মার অকল্যাণ হয়। বিশ্বাসহীন, ঈশ্বরহীন, ধর্মহীন মন অবিনয়ী অসরস বস্তু। মায়া-মমতার সহিত তার সম্পর্ক নেই। অন্তঃসারশূন্যতার গহ্বরে যত কিছু সুলভ বাহাদুরির আশ্রয়। আমার ধৃষ্টতা ক্ষমা করবেন, পারুলকে আশ্রয় দিযে একটা খুব কীর্তি করেছেন বলে যে আপনার ভঙ্গী, তাও এই সুলভ বাহাদুরির লক্ষণ।

আমিও এ থেকে অব্যাহতি পাই নি। ধর্মহীন শিক্ষার আবহাওয়ার আওতায় বাস করে আপনার ছোঁয়াচ আমাকেও লেগেছে। তাই বোধ হয় আমার বস্তুবিচারহীন মনে নবেনবাবুর প্রতি এত অবহেলা।

আমি কিন্তু স্থির করেছি, আমার মনের গতি পরিবর্তিত করতে চেষ্টা করব। কলেজের লেখাপড়া আমি ছেড়ে দেব; যা হয়েছে আমার মত হিন্দুঘরের সাধারণ মেয়ের পক্ষে তা যথেষ্ট। এবার থেকে আমি হিন্দুধর্মগ্রন্থ পড়ব, বারব্রত করব, এমন কি পূজাপাঠেও মন দেব। বিশ্বাসের অতল গর্ভে যুক্তি তর্ককে ডুবিয়ে দিয়ে এ পর্যন্ত ঈশ্বরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আপনার কাছ থেকে যা কিছু শিক্ষা-পাঠ পেয়েছি সমস্ত বিস্মৃত হব। অর্থাৎ মনকে নিষ্কণ্টক করব। তারপর যেদিন প্রথম অনুভব করব যে, ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবার মত আমার অধিকার হয়েছে, সেদিন তাঁর কাছে আমার প্রথম প্রার্থনা হবে, তিনি যেন আপনার অন্তরে প্রবেশ করেন, তার জ্যোতির সোনালি রঙে আপনার মন যেন রঙিন হয়ে ওঠে। আপনি বলেন, আপনি আমার শুভাকাঙ্ক্ষী; কিন্তু আমি বলছি, আমিও আপনার কম শুভাকাঙ্ক্ষিণী নই। সেইজন্য, আপনার পক্ষে যা সব চেয়ে শুভ জিনিস—যা থেকে আপনি বঞ্চিত হয়ে রিক্ত হয়ে আছেন—তার জন্য প্রার্থনা আমিই আপনার হয়ে করব। তার আগে আজ আপনাকে বলে রাখলাম, ঈশ্বর আছেন—তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই!

এইটেই আজকে আমার প্রধান কথা বলবার ছিল, কিন্তু তখন বলতে সাহস

পাই নি, পাছে এত বড় কথাটা তর্কে তর্কে ঝগড়ার মত হয়ে দাঁড়ায়। যদিও চিঠিটাও অনেকটা সেই ধরণেরই হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু কি করব বলুন, অনেক জিনিসই আমি উপেক্ষা করতে পারি, কিন্তু যা পারি নে তা একেবারেই পারি নে। এ বিষয়ে আমার মনে মাঝামাঝি বলে কোনো আপোস নেই।

চিঠি হল দীর্ঘ। মা আর বাবা ফিরে এসেছেন, আর এখনো আমি খাই নি বলে মা একবার তাড়া দিয়ে গেছেন। সুতরাং এইখানেই শেষ করলাম। উত্তর পাবার কল্পনা করে এ চিঠিতে কিছুই লিখি নি, সুতরাং উত্তর না পেলে বিস্মিতও হব না, দুঃখিতও হব না। বরং এ বিষয়ে আলোচনা এইখানে বন্ধ হয়ে যাক, এই আমার প্রার্থনা। এ চিঠিতে যদি অন্যায়, অসঙ্গতি অথবা রূঢ়তা প্রকাশ পেয়ে থাকে তা হলে অনুগ্রহ করে তাও ক্ষমা করবেন। ইতি—

প্রণতা

বাসনা'

চিঠিখানা পরদিন প্রাতঃকালে ডাকে পড়ল এবং অমরেশের হাতে পড়ল সেই দিন বৈকালে। মনোযোগ সহকারে চিঠিটা আদ্যন্ত পাঠ করে একখানা চিঠির কাগজ নিয়ে সে লিখল ঃ

'কল্যাণীয়াসু,

তবুও উত্তর দিলাম। জীবনের নূতন পথ তোমাকে সরসতা এবং সফলতার মধ্যে নিয়ে যাক—একান্ত ভাবে এই কামনা করি। ইতি

শুভাকাঙ্ক্ষী

অমরেশ মুখোপাধ্যায়'

চিঠিখানা পেয়ে বাসনা এই অতিসংক্ষিপ্ত লিখনের উপর দীর্ঘকাল দৃষ্টি নিবদ্ধ করে বসে রইল। তারপর মনে মনে অমরেশের নিকট আর একবার পরাজয় স্বীকার করে চিঠিখানা তুলে রাখল। দীর্ঘনিশ্বাস একটা পড়ল বটে, কিন্তু পর মুহূর্তে মনটাও হয়ে উঠল রুক্ষ এবং কঠিন।

২০

পরদিন প্রত্যূষে যখন বাসনার নিদ্রা ভাঙল, তখন তার মনের মধ্যে একটা অপরূপ পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। যা কিছু অভিমান অপমান দুঃখ ক্রোধ সমস্ত ক্ষুদ্রায়তন হয়ে মনের একটা গোপন কোণে গিয়ে আশ্রয় নিয়েছে, কিন্তু মনের যে দিকটার বাইরের সঙ্গে কারবার তা হয়ে গেছে একেবারে হাল্কা। যে তার ব্যক্তিগত জীবনের সুখ-দুঃখ-সমস্যার সহিত পরিচিত, সে-ও তাকে দেখলে হয়তো মনে করবে, এখন আর তার জীবন কোনো দ্বন্দ্বের দ্বারা পীড়িত, কোনো বিরোধের দ্বারা খণ্ডিত নয়। অমরেশ, নরেন্দ্র, পারুল—প্রত্যেকে নিজ নিজ বৈশিষ্ট্য থেকে রিক্ত হয়ে নেমে এসেছে সহজ সাধারণতার স্তরে। এমন কি, এখন যেন অমরেশকে অধ্যাপনের জন্য পুনরায় ডেকে পাঠালেও চলে, এবং বিবাহের পাত্ররূপে নরেন্দ্রের যোগ্যতার কথা বিবেচনা করে দেখবার পক্ষেও এখন আর যেন তেমন বাধা নেই।

স্নান সমাপন করে বাথ-রুম থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে বাসনা ড্রেসিং-টেবিলের সম্মুখে দাঁড়িয়ে চুলটা ঠিক করে নিচ্ছিল, এমন সময়ে পরিচারিকা মালতী এসে বলল, 'খাবার টেবিলে আপনার চা দিয়েছি দিদিমণি!'

বাসনা জিজ্ঞাসা করল, 'মা কোথায়?'

'ঠাকুর-ঘরে।'

'এখনো পূজো করছেন?'

'হ্যাঁ।'

মুখ নিচু করে সিঁথি কাটতে কাটতে বাসনা বলল, 'খাবার এখন তুলে নিয়ে যা। আমার দেরি আছে।' তারপর কেশ-প্রসাধন সমাপ্ত করে দুইটা বারান্দা পার হয়ে অপর্ণার ঠাকুর-ঘরের সম্মুখে উপস্থিত হল।

পূজা সমাপনান্তে অপর্ণা তখন ঘরের অর্গল মুক্ত করে দিয়ে পূজার দ্রব্যাদি গুছিয়ে রাখছিলেন,—একটু ঠেলতেই দ্বারটা খুলে গেল। বাসনাকে দেখে তার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করে অপর্ণা বললেন, 'কি রে বাসু, কি বলছিস ?'

'এখনো পূজো শেষ হয় নি মা তোমার ?' বলে বাসনা ঘরের ভিতর মুখ বাড়িয়ে সকৌতূহলে চতুর্দিক দেখতে লাগল।

স্মিতমুখে অপর্ণা বললেন, 'কেন, তোমার তাতে কি ক্ষতি হল শুনি ?'

বাসনা বলল, 'না, ক্ষতি কিছু হয় নি।' তারপর সম্মুখ দিকে অগ্রসর হওয়ার ঈষৎ উপক্রম করে মৃদুস্মিত মুখে বলল, 'তোমার ঠাকুর-ঘরে একটু-খানি ঢুকব মা ?'

প্রস্তাব শুনে অপর্ণা মনে মনে যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হলেন। যে মানুষ ভুলেও কোনোদিন এ অঞ্চলে পদার্পণ করে না, সে ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করতে চায়! কন্যার মুখের অভিব্যক্তি থেকে তার অন্তরের গোপন তথ্য নির্ণয় করবার চেষ্টা করে তিনি বললেন, 'সে কি কথা রে! হঠাৎ তোর ঠাকুর-ঘরে ঢোকবার খেয়াল হল কেন ?'

'খেয়াল নয় মা,—সাধ।'

'হঠাৎ সাধই বা হল কেন শুনি ?'

'সে কথা তোমার ঠাকুরই বলতে পারেন।'

অপর্ণা বললেন, 'আমার ঠাকুর তো বোকা আর বোবা, তা হলে তিনি বুঝবেনই বা কি উপায়ে, আর বলবেনই বা কি করে ?'

বাসনা বলল, 'তোমার ঠাকুর বোকা আর বোবা তো আমার কাছে, তোমার কাছে তো নন। যাব মা ভিতরে ?'

'স্নান করেছিস ?'

'করেছি।'

অনাবশ্যক প্রশ্ন। বাসনা যে স্নান করে ধৌত বস্ত্র পরিধান করেছিল, সেটা সহজেই প্রতীয়মান হচ্ছিল তার কেশ এবং বেশ থেকে।

অপর্ণা বললেন, 'স্নান করলে কি হবে, টোস্ট আর ডিম দিয়ে দেহটি বেশ করে পবিত্র করে এসেছ তো?'

জননীর দুশ্চিন্তা দেখে বাসনা হেসে ফেলল; বলল, 'তা আসি নি মা,—স্নান করার পর এখনো কিছুই মুখে দিই নি,—টোস্টও নয়, ডিমও নয়।'

অপর্ণা বললেন, 'তবে ভেতরে এসে বস।' বলে বাসনার জন্য নিজের দক্ষিণ পার্শ্বে একটা কুশাসন পেতে দিলেন।

'তুমি কেন পাতলে মা, আমি নিজে পেতে নিতাম।' বলে ঘরের ভিতর প্রবেশ করে বাসনা কুশাসনের উপর উপবেশন করল; তারপর দেবদেবীর মূর্তি ও চিত্রের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলল, 'এত কি পূজো তুমি কর, বল তো মা?'

সহাস্যমুখে অপর্ণা বললেন, 'তুই এত কি বই পড়িস তা আমাকে বল তো শুনি?'

বাসনা বলল, 'আমার যে অনেক বই। অন্তত পঁচিশ-ছাব্বিশখানা হবে।'

অপর্ণা বললেন, 'আর আমার যে অনেক ঠাকুর—তেত্রিশ কোটি, তা জানিস নে বুঝি?'

মৃদু হেসে বাসনা বলল, 'তা জানি; কিন্তু এই তেত্রিশ কোটির সকলের সঙ্গেই তো তোমার কারবার নয় মা।' তারপর সহসা সে কথা পরিত্যাগ করে বলল, 'আচ্ছা মা, এখনো তুমি শিবপূজো কর?—নিত্য, প্রতিদিন?'

অপর্ণা বললেন, 'করি।'

বিস্ময়ের মৃদূচ্ছ্বসিত স্বরে বাসনা বলল, 'কর? কিন্তু কেন আর কর? শিবঠাকুর তো তোমার পূজোয় তুষ্ট হয়ে তোমাকে মনের মত বর দিয়েছেন।'

কন্যার নিকট হতে এই ধরনের পরিহাস-রহস্যে অপর্ণা অভ্যস্ত; সস্নেহে কন্যার

পৃষ্ঠদেশে হস্তার্পণ করে বললেন, 'পাগলী মেয়ে কোথাকার!' তারপর তার মাথাটা ধীরে ধীরে একটু নেড়ে দিয়ে বললেন, 'কিন্তু এখনো যে আর একটা বর বাকি আছে বাসু। তুই তো পূজো-পাঠ করবি নে। সেইজন্যে আমিই তোর হয়ে শিবপূজো করি। 'মায়ে ঝিয়ে বর্ত করে, যার যার বর সেই সেই মাগে'— তুই তো আর তা হতে দিলি নে!'

বাসনা বলল, 'আচ্ছা মা, এখন থেকে আমিও পূজো-পাঠ করব—কিন্তু তাই বলে শিবপূজো নয়। তুমি আমাকে অন্য পূজো শিখিয়ে দিযো।'

'কেন, শিবপূজো করবি নে কেন? শিবঠাকুর কী এমন অপরাধ করলেন তোর কাছে?'

বাসনার ওষ্ঠাধরে ক্ষীণ হাস্যের রেখা দেখা গেল; বলল, 'না, অপরাধ তিনি কিছু করেন নি।' তারপর প্রসঙ্গটা পরিবর্তিত করবার অভিপ্রায়ে বলল, 'তুমি তো মা, গল্প কর, ছেলেবেলায় কত রকমের বারব্রত করেছ। এখনো বছরে বছরে সাবিত্রী-ব্রত করছ। আমাকে দিয়েও তুমি সেই রকম ব্রত-ট্রত করাও না কেন?'

বাসনার ঠাকুর-ঘরে প্রবেশ করবার আগ্রহ দেখে অপর্ণা যথেষ্ট বিস্মিত হয়েছিলেন; তার উপর ব্রতপালনের জন্য তার এই নির্বিকল্প প্রস্তাব শুনে তাঁর বিস্ময়ের পরিসীমা রইল না; বললেন, 'ব্রত করাব তোকে কোন্ সাহসে? তোরা যে নাস্তিক, ঠাকুর-দেবতা মানিস নে।' বাসনার ধর্মমতের উপর স্বামী শৈলনাথ ও গুরু অমরেশের ধর্মমতের প্রভাব স্মরণ করে এই বহুবাচনিক 'তোরা'র প্রয়োগ।

বাসনা বলল, 'আমি নাস্তিক বলেই যদি তোমার মনের বিশ্বাস, তা হলে তুমি আমার বিষয়ে এমন নিশ্চিন্ত হয়ে থেকো না মা। জোর করে ফিরিয়ে নাও আমাকে অবিশ্বাসের পথ থেকে।'

গভীর বিস্ময়ে এবং গভীরতর আনন্দে অপর্ণার মন উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠল।

কন্যার মাথার উপর দক্ষিণ হস্ত স্থাপিত করে স্নিগ্ধ স্বরে তিনি বললেন, 'সত্যি বাসু ?—সত্যি তুই ব্রত-টৈত করবি ?'

শান্তমুখে নিরাবেগ কণ্ঠে বাসনা বলল, 'সত্যি।'

অপর্ণা মনে মনে সিদ্ধান্ত করলেন, বাসনার এই সহসা জাগ্রত ধর্মপ্রবৃত্তি অম-রেশের শক্তি-কেন্দ্র হতে খানিকটা দূরে সরে আসার সুফল ভিন্ন অপর কিছুই নয়, —তা সে বিকর্ষণ যে কোনো প্রকারেই ঘটে থাকুক না কেন। যদিও ব্রতারম্ভের প্রশস্ত দিন ছিল চৈত্র-সংক্রান্তির দিবস, তথাপি সুসময়কে কদাচ অবহেলা করা উচিত নয়—এই বিবেচনায় তিনি বললেন, 'দুই-এক দিনের মধ্যে একটা ভাল দিন দেখে আমি তোকে 'ফল-সাগরে'র ব্রত নেওয়াব বাসু; আজ তুই শুধু সেই ব্রত নেবার সঙ্কল্প করে এই ঠাকুর ঘরে একটা প্রণাম করে যা।'

আসন ত্যাগ করে দাঁড়িয়ে উঠে বাসনা বলল, 'কাকে প্রণাম করব মা? তোমাকে?'

চকিতকণ্ঠে অপর্ণা বললেন, 'কি বলিস রে তুই বাসু ? ঠাকুর-ঘরে আমাকে প্রণাম করবি কি ! দেবতাকে প্রণাম কর্।'

'তা হোক মা, আগে তোমাকেই প্রণাম করি।' বলে অপর্ণাকে আর প্রতিবাদ করবার অবসর না দিয়ে নত হয়ে বাসনা তাঁর পদধূলি গ্রহণ করল।

বিরক্তি সহকারে অপর্ণা বললেন, 'ছি ছি, কি করলি বল্ দেখি! পায়ে হাত দিয়ে হাতটা অপরিষ্কার করলি! নে, হাতটা ধুয়ে ফেলে ঠাকুর প্রণাম কর্।' বলে বাসনার হাতে ঘটি থেকে জল দিতে উদ্যত হলেন।

মৃদু হেসে বাসনা বলল, 'মা, তোমার মহিমা থেকে এমন করে নেমে এসো না।'

স-তর্জনে অপর্ণা বললেন, 'বেশি ফাজলামি করিস নে। নে, হাত ধুয়ে ঠাকুর প্রণাম কর্।' বলে বাসনার দুই হস্তে জল ঢেলে দিলেন।

ভূমিতে উপবেশন করে নতমস্তকে বাসনা প্রণাম করতে যাচ্ছিল, অপর্ণা বললেন, 'ও-রকম করে নয় বাসু, গলায় আঁচল দিয়ে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করতে হয়।'

গলবস্ত্র হয়ে বাসনা মাতার উপদেশমত প্রণাম করল। কোন্ দেবতাকে সে প্রণাম করল, কি কথা বলে তার গোপন হৃদয়ের দুঃখ-বেদনা নিবেদন করল, তা সে-ই বলতে পারে। প্রণাম সমাপন করে যখন সে উঠে দাঁড়াল. উচ্ছল অশ্রুতে তখন তার দুই চক্ষু চক্‌চক করছে।

চকিতে অপর্ণা বাসনার মুখের দিকে একবার দৃষ্টিপাত করলেন। চক্ষের অবস্থা দেখে কন্যার দুঃখদীর্ণ হৃদযেব গোপন ব্যথার কথা অগোচর রইল না। গভীর সমবেদনায় তাঁরও দুই চক্ষু ছলছলিযে এল।

আধ ঘণ্টা পরে বাসনা শৈলনাথের অন্দরমহলের বসবাব ঘরে প্রবেশ করল। রবিবার. অফিসেব তাড়া নেই, দৈনিক সংবাদপত্র পাঠ শেষ করে শৈলনাথ তখন ঈশোপনিষদের একটা শ্লোকের অর্থ–বিচারে নিযুক্ত ছিলেন,— বাসনা কক্ষে প্রবেশ কবে শৈলনাথের সম্মুখে উপস্থিত হযে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করে দাঁড়াল।

পাশের একখানা চেযার দেখিয়ে দিয়ে শৈলনাথ বললেন, 'বসো।' বাসন উপবেশন করলে তার মাথায় হাত রেখে গভীর স্নেহভবে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কি ব্যাপার বল তো বাসু?' এ প্রণাম যে কেবলমাত্র প্রণামই নয়, পরন্তু বিশেষ একটা কোনো ব্যাপারের অভিব্যক্তি সে কথা তিনি উপলব্ধি করেছিলেন।

পিতার মুখের উপর সজল চক্ষু স্থাপিত করে বাসনা বলল. 'তোমার আশীর্বাদ নিতে এলাম বাবা।'

শৈলনাথ বললেন, 'কিন্তু নতুন করে কেন? সে তো সর্বদাই তোমার উপর বর্ষিত হচ্ছে।'

বাসনা বলল, 'আর আমি কলেজে পড়ব না বাবা, সে পড়া অনেক হয়েছে। এবার তুমি আমাকে তর্কবাগীশ মশাযের ছাত্রী করে দাও; তাঁর কাছে আমি কাব্য আর দর্শন পড়ব। তা ছাড়া—' সহসা বাসনা অসমাপ্ত বাক্যের মধ্যে নীরব হয়ে গেল।

কন্যার স্কন্ধে হস্তার্পণ করে শৈলনাথ বললেন, 'তা ছাড়া কি বল?'

'তা ছাড়া, এবার থেকে আমি মার সঙ্গে একটু আধটু বারব্রত পূজোপাঠ করব বলে স্থির করেছি।'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে শৈলনাথ বললেন, 'এ তুমি বেশ বিবেচনা করে তারপর স্থির করেছ তো?'

'হ্যাঁ।'

'এতে তুমি মনের মধ্যে আনন্দ পাবে মনে কর?'

'করি।'

'আচ্ছা, তা হলে আমি আশীর্বাদ করছি, তোমার জীবন-ধারার এই নতুন পরিবর্তন তোমার পক্ষে শুভ হোক, কল্যাণপ্রদ হোক।' বলে বাসনার মস্তকে শৈলনাথ পুনরায় হস্তার্পণ করলেন।

ঠিক এই সময়ে কক্ষে প্রবেশ করলেন অপর্ণা। স্বামীর কাছে এসে প্রসন্নমুখে বললেন, 'শুনেছ সব কথা?'

শৈলনাথ বললেন, 'শুনেছি। কিন্তু আজ থেকে বাসুর গোত্র গেল বদলে।'

অপর্ণা বললেন, 'গোত্র বদলাল কি রকম?'

শৈলনাথ বললেন, 'বদলাল না? এতদিন তার ছিল 'জয়গোবিন্দ' গোত্র, আর আজ থেকে হল 'নারদ' গোত্র।'

সবিস্ময়ে বাসনা বলল, 'সে কি বাবা! 'জয়গোবিন্দ' গোত্র 'নারদ' গোত্র আবার কি?'

শৈলনাথ বললেন, 'তা বুঝি জান না? তোমার মার হচ্ছে 'নারদ' গোত্র; আর, তোমার আর আমার ছিল 'জয়গোবিন্দ' গোত্র।'

'তার মানে?'

শৈলনাথ বললেন, 'একটা ছোট গল্প শুনলে তার মানে বুঝতে পারবে। মধুসূদনকে দর্পহারী বলে, তা জান তো? কারো মনে দর্পের উদয় হলে তখনি তিনি তা হরণ করেন। একবার নারদের মনে দর্প হয়েছিল যে, তাঁর চেয়ে

মধুসূদনের বড় ভক্ত আর কোথাও কেউ নেই। নিজের প্রতি ভক্তি নিয়ে দর্প হলেও দর্প তো দর্পই,—সুতরাং মধুসূদন স্থির করলেন নারদের এ দর্পও ভাঙতে হবে। একদিন নারদ বিষ্ণুলোকে বিষ্ণুমন্দিরের পাশ দিয়ে হরিকীর্তন করতে করতে চলেছেন, দেখলেন, মন্দিরের পাশে দাঁড়িয়ে খড়ম পায়ে ছাতা মাথায় দিয়ে ভগবান রাজমিস্ত্রী খাটাচ্ছেন। একটি প্রাসাদ তৈরি হচ্ছে। প্রখর সূর্যকিরণে ঘর্মাক্ত কলেবর। দেখে নারদের উৎকট বিস্ময় হল। কে সে এমন ভাগ্যবান, যার বাড়ি স্বয়ং ভগবান নিজে দাঁড়িয়ে থেকে নির্মিত করাচ্ছেন। কৌতূহলের বশবর্তী হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'প্রভু, এ কার বাড়ি হচ্ছে আপনার বাড়ির পাশে?' ভগবান বললেন, 'ও আমার একজন ভক্তের।' 'কোথায় সে থাকে?' ভগবান বললেন, 'পৃথিবীতে।' কৌতূহল প্রচণ্ড হল। ঠিকানাটি সংগ্রহ করে নারদ একেবারে পৃথিবীতে এসে হাজির। দেখতে হবে কেমন সে ভক্ত, কী তার পূজা পদ্ধতি। যথাস্থানে উপস্থিত হয়ে নারদ দেখলেন, সেই ভক্ত সামান্য একজন চাষা। সমস্ত দিন তার কাছে কাছে থেকে লক্ষ্য করলেন, পূজা-অর্চনা সে কিছুই করে না, নিদ্রাভঙ্গে সকালে উঠে হাঁক দেয় 'জয়গোবিন্দ, তারপর কিছুক্ষণ পরে 'জয়গোবিন্দ' বলে লাঙলটা কাঁধে নিয়ে ক্ষেতে উপস্থিত হয়। 'জয়গোবিন্দ' বলে লাঙলটা কাঁধ থেকে মাটিতে ফেলে। ভূমি কর্ষণ করতে করতে মাঝে মাঝে দু চার বার 'জয়গোবিন্দ' বলে, তারপর সন্ধ্যা হলে 'জয়গোবিন্দ' বলে লাঙলটি কাঁধে তুলে নিয়ে ফিরে আসে। রাত্রে চোখ বোজবার আগে আরো দু চার বার বলে 'জয়গোবিন্দ'। মাত্র এই, এ ছাড় আর কিছু নয়। না আছে বাণা, না আছে কোশাকুশি, না আছে নামাবলি. না আছে রসকলি। বিষ্ণুলোকে ফিরে এসে নারদ বললেন, 'প্রভু, দেখে এলাম আপনার ভক্তকে। দেখে জানলাম, আপনার মধ্যে সুবিচার নামে কোনো পদার্থ নেই।' ভগবান বললেন, 'কেন বল তো?' নারদ বললেন, 'আপনার পৃথিবীবাসী ভক্তের না আছে পূজাপাঠ, না আছে হরিকীর্তন, থাকবার মধ্যে আছে দিনের মধ্যে শুধু বার কুড়ি-পাঁচিশ 'জয়গোবিন্দ'। তার বাড়ি হচ্ছে

আপনার বাড়ির পাশে ; আর, বীণা বাজিয়ে বাজিয়ে, আর কীর্তন গেয়ে আমাদের হাড় কালি হল, আমাদের বাড়ি এক মাইল দূরে অন্য পাড়ায়।' অল্প হেসে ভগবান বললেন, 'ক্ষমা করো নারদ। বেশি বয়স হয়েছে, বিচার শক্তিটা একটু কমে গেছে। তুমি আমার একটা কাজ করতে পার?' অভিমান-মিশ্রিত কণ্ঠে নারদ বললেন, 'হুকুম করলেই পারি।' একটা বাটিতে কানায় কানায় জল ভরে দিয়ে ভগবান নারদকে বললেন, 'এইটে ধর।' নারদ তাড়াতাড়ি বীণাটা বগলের মধ্যে চেপে ধরে দু হাত পেতে জল-ভরা বাটিটা গ্রহণ করলেন। ভগবান বললেন, 'এই বাটিটা নিয়ে ত্রিভুবন ঘুরে তুমি আমার কাছে ফিরে এস। কিন্তু দেখো, একবিন্দু জল যেন বাটি থেকে মাটিতে না পড়ে। পারবে তো?' নারদের মেজাজটা একটু গরম হয়েই ছিল গম্ভীর মুখে বললেন, 'আশা তো করি।' বগলে বীণা চেপে অতি সন্তর্পণে বাটিটা ধরে নারদ এগিয়ে চললেন। চক্ষু সর্বদা বাটির উপর নিবদ্ধ, যাতে এক ফোঁটা জল উছলে না পড়ে। এই ভাবে ধীরে ধীরে অগ্রসর হয়ে অতি কষ্টে এবং অত্যন্ত বিলম্বে ত্রিভুবন পরিক্রম করে অবশেষে বিষ্ণুলোকে ভগবানের কাছে ফিরে এলেন। বাটিটা ভগবানের কাছে রেখে গর্বিত মুখে বললেন, 'নিন প্রভু, এক ফোঁটা জলও পড়ে নি।' ভগবান বললেন, 'খুব ভাল কথা, কিন্তু নারদ একটা সত্যি কথা বলবে? এই দশ দিনে তুমি কবার আমার কথা চিন্তা করেছিলে ঠিক করে বল তো?' নারদ মনে মনে ভেবে দেখলেন, একবারও নয়। সর্বক্ষণ জল আর বাটির চিন্তায় তাঁর এই দশ দিন কেটেছে। সর্বজ্ঞ ভগবানের কাছে মিথ্যা কথা বলে কোনো লাভ নেই, সুতরাং মহা অপ্রস্তুত হয়ে নারদ নিঃশব্দে ভগবানের দিকে চেয়ে রইলেন। ভগবান বললেন, 'নারদ, এক বাটি জল নিয়ে তুমি আমাকে ভুলে গেলে, আর কত দুঃখ-কষ্ট আপদ বিপদের মধ্যে ঐ চাষার জীবন কাটছে, অথচ সর্বদা তার মুখে 'জয়গোবিন্দ'। এখন বল দেখি, আমার বাড়ির পাশে কার বাড়ি হওয়া উচিত,—তার, না, তোমার?' কোনো কথা না বলে নারদ বীণাটি নিয়ে

প্রস্থান করলেন। এখন বুঝলে বাসু, কেন তোমার মায়ের 'নারদ' গোত্র আর আমাদের 'জয়গোবিন্দ' গোত্র ?'

গল্প শুনে বাসনা হাসতে লাগল, আর অপর্ণা সক্রোধে বললেন, 'বেশ বাবু, বেশ। তোমার বাড়ি না-হয় বিষ্ণুমন্দিরের পাশেই হবে, আর আমাদের হবে এক মাইল দূরে। মাঝে মাঝে নেমন্তন্ন করব, অনুগ্রহ করে খেতে এসো।'

শৈলনাথ বললেন, 'তা আসব, কিন্তু মনে রেখো 'জয়গোবিন্দ' গোত্রের মুর্গির কাট্‌লেটেও বাধা নেই। তোমার বিষ্ণুলোকে যদি সে পদার্থ না থাকে, তা হলে দশটি মুর্গি আর পাঁচটি মোরগ পৃথিবী থেকে যাবার সময় নিয়ে যেয়ো।'

অপর্ণা বললেন, 'যথা আজ্ঞা, তাই নিয়ে যাব, কিন্তু কলসী চারেক গঙ্গাজলও সঙ্গে নিয়ে যেতে হবে।'

অপর্ণার কথায় বাসনা এবং শৈলনাথ উভয়েই সমস্বরে হেসে উঠলেন।

২১

বাসনার সহিত বন্ধন ছিন্ন করে দিয়ে অমরেশ একেবারে গভীরভাবে ডুব দিল তার গ্রন্থরাশির মধ্যে। জলের মাছ ডাঙা থেকে জলে পড়লে প্রথমটা যেমন হয়, ব্যাপারটা হল কতকটা সেই রকম। বাহিরের সহিত যখনই তার বিরোধ বাধে তখনই সে এইরূপে অধ্যয়নের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে আশ্রয় লাভ করে। অধ্যয়ন তার পক্ষে দ্বিতীয় জগৎ যার আকাশের অচঞ্চল বায়ুমণ্ডলী বহির্জগতের তরঙ্গবিক্ষোভের দ্বারা সহজে আলোড়িত হয় না।

এবার কিন্তু ঠিক তা ঘটল না। এবারকার আঘাতটা এমন তীব্র অথচ অপরূপ যে, অমরেশের দুর্গের মধ্যে প্রবেশ করেও অমরেশ তার প্রভাব থেকে একেবারে মুক্তিলাভ করতে পারল না। বিস্ময়ের হাত ধরে একটা অজানা আনন্দ, বঞ্চনার পাশে দাঁড়িয়ে একটা অপরিচিত পরিতৃপ্তি, যেন তার মনকে ব্যবস্থার কেন্দ্রচ্যুত করতে থাকে। বাসনার চিঠির কয়েকটা কথা থেকে-থেকে মনের মধ্যে উদয় হয়—আমাদের সামান্য মনের ছোট ছোট যুক্তি আমাদের জীবনের খুব বড় বড় ব্যাপারে খাটাতে নেই। যা দেখতে পাচ্ছি নে, শুনতে পাচ্ছি নে, তা আমার পক্ষে নেই, অতএব প্রমাণের অভাবে ঈশ্বর অসিদ্ধ, এরূপ যুক্তির দ্বারা আমরা ঈশ্বরের নাস্তিত্ব প্রমাণ করি নে।'

মনে মনে মাথা নেড়ে অমরেশ প্রশ্ন করে, তাই যদি করি নে, তা হলে মহর্ষি কপিল তাঁর সাংখ্যদর্শনে কি এত পরিশ্রম করলেন? সামনের অর্ধপঠিত বইখানা বন্ধ করে রেখে সে আলমারি থেকে তার সাংখ্যদর্শন বার করে নিয়ে বসল। বহুবার পঠিত গ্রন্থের মধ্যে একটা নূতন উদগ্র কৌতূহল নিয়ে নিমগ্ন হল। নিরবচ্ছিন্ন আগ্রহের সহিত কয়েকদিন ধরে সে তন্ন-তন্ন করে কপিল-দর্শন পাঠ করল। শুধু প্রত্যক্ষ প্রমাণের অভাব হেতু চার্বাক নিরীশ্বরবাদ প্রচার করেছেন। কপিল কিন্তু শুধু প্রত্যক্ষ প্রমাণের উপরই নির্ভর করেন নি, প্রত্যক্ষ, অনুমান এবং শব্দ—এই ত্রিবিধ প্রমাণের বিচারের দ্বারাও তিনি ঈশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন নি। সুতরাং বাধ্য হয়ে তাকে বলতে হয়েছে, প্রমাণের অভাবে ঈশ্বর অসিদ্ধ। তবে?

অমরেশের মনে হল, বাসনা যেন তার অন্তরের মধ্যে আবির্ভূত হয়ে বলছে, 'তবে আবার কি? এ থেকে মাত্র এইটুকু প্রমাণ হল যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রমাণ করবার মত পাণ্ডিত্য এবং শক্তি মহর্ষি কপিলের ছিল না। যে জিনিস তিনি সপ্রমাণ করতে অসমর্থ হলেন, বস্তুত তার অস্তিত্বই নেই, কপিলের তর্কমীমাংসায় এতবড় বিশ্বাস স্থাপন করবার কারণ কি আছে শুনি?'

অমরেশ চিন্তিত হল। এ কথাটা ইতিপূর্বে কোনদিন সে এমন করে চিন্তা করে দেখেনি। সৃষ্টি আছে অথচ স্রষ্টা নেই, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের মত এত বিরাট বিপুল একটা

কার্য আছে অথচ তার আদি কারণ নেই,—এই দুর্বিশ্বাস্য মতবাদকে যথোপযুক্তরূপে সমর্থিত করবার মত যুক্তির সারবত্তা সাংখ্যদর্শনের মধ্যে সত্য-সত্যই আছে কি-না, তদ্বিষয়ে সে মনে মনে প্রশ্ন করলে। কপিল-কৃত যে সকল সিদ্ধান্ত পূর্বে অকাট্য বলে মনে হয়েছে, আজ যেন তার মধ্যে সেই অখণ্ডনীয়তা অনুভব করতে মন সাহস পায় না। মনে হয়, দুজ্ঞেয়কে জানবার প্রণালী-সাধনের মধ্যে হয়তো কোথাও ভুল-ভ্রান্তি হয়ে গিয়েছে, তাই জানা যায় নি।

যে ঐশ্বরী কল্পনা সর্বকালে সর্বদেশে মানুষকে উন্নতির পথে টেনে নিয়ে গিয়েছে; অসংশয়িতরূপে যা মানবাত্মার কল্যাণ সাধন করেছে, শোকে যা দিয়েছে সান্ত্বনা; দুঃখে সহনশীলতা, ব্যর্থতায় যা মানুষের মনকে আশার দ্বারা সঞ্জীবিত করেছে; পাপ হতে, প্রলোভন হতে, অনাচার হতে, দুর্নীতি হতে যা মানুষের মনকে নিয়ত রক্ষা করেছে; নাস্তিকতাবাদের কোন্ বিচারপদ্ধতির দ্বারা কপিল এবং চার্বাক তার বিলোপ সাধন করবে? অচিন্ত্য বাঙ্মনস্বর প্রতি তর্কের যোজনা করে কোন্ সত্য আবিষ্কৃত হবে? ঈশ্বর যদি মানুষকে সৃষ্টি না করে থাকেন তো মানুষ ঈশ্বরকে সৃষ্টি করেছে তদ্বিষয়ে সন্দেহ নেই। সুতরাং স্বর্গে ঈশ্বরের অস্তিত্ব না থাকলেও মানুষের কল্পনালোকে আছে। মৃত্তিকা বাস্তব পদার্থ, অতএব মৃত্তিকার মূল্য আছে; কল্পনা অলীক বস্তু, সুতরাং কল্পনার মূল্য নেই, —এ বিচারপদ্ধতি কল্পনাজীবী মানুষের নয়। ইঁদুর ধরতে পারলে যদি কাঠের বিড়ালকে অগ্রাহ্য করা না যায় তা হলে কল্পনার ঈশ্বরকেই বা অস্বীকার করা যায় কেমন করে! সুতরাং বিশ্বাসে মিলয়ে কৃষ্ণ, তর্কে বহুদূর—এ কথার সত্যতা স্বীকার করতে হয়। কি হবে তর্কের দ্বারা কাঁটা-গাছের সৃষ্টি করে, বিশ্বাসের দ্বারা যদি ফলপুষ্পময়ী লতিকা উৎপন্ন করা চলে!

অমরেশ চিন্তিত হল। এ অভিনব চিন্তাভঙ্গী একেবারে অচিন্তিতপূর্ব বললেও বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। কল্পনার ঈশ্বরের দিক দিয়ে মানব জাতির এই গুরুতর সমস্যার কথা সে ঠিক এমন ভাবে কোনো দিন বিচার করে দেখে নি। হঠাৎ মনে পড়ল বাসনার চিঠিতে লেখা সোনালী রঙের কথা।

এ তবে সেই সোনালী রঙেই শেষ পর্যন্ত হৃদয়ের মধ্যে রশ্মি বিকিরণ করল না-কি! বাসনার অভিশাপ তা হলে ফলতে বেশি কিছু বিলম্ব হল না! অমরেশের মুখে মৃদু হাস্যরেখা দেখা দিল। পরক্ষণেই মনের মধ্যে একটা সংশয় উপস্থিত হল, যুক্তি-বিচারের পথ হতে বিচ্যুত হয়ে বিশ্বাসের পথে এই পদক্ষেপ বাসনার কাছে আত্মসমর্পণেরই রূপান্তর নয় তো? হয়তো তাই। দুর্বলতার কথা সন্দেহ নেই, কিন্তু দুঃখের কথা বলে তো ঠিক মনে হয় না। মনে হয়, এই দুর্বলতার মধ্যস্থলে একটু যেন আনন্দের জ্যোতিও বর্তমান আছে—স্বচ্ছ স্ফটিকের মধ্যে লালচে আভার মত।

অমরেশ চিন্তিত হল। মনে মনে মাথা নেড়ে বলল, 'এ কিন্তু ঠিক নয়, ঠিক নয়। ঠিক হয় তো নয়, কিন্তু মিথ্যাও তো নয়। বিবেকে যতটা বাধে, হৃদয়ে যে ততটা বাধে না। বিবেকের সহিত হৃদয়ের যেখানে এইরূপ বিরোধ, সেইখানেই তো আসল ট্রাজেডির সূত্রপাত।

'দাদা!'

চকিত হয়ে অমরেশ পিছন ফিরে দেখলে পূরবী একেবারে নিকটে এসে দাঁড়িয়েছে, বলল, 'কি রে পূরবী, চা তৈরি না কি?'

পূরবী বলল, 'তৈরি করে তো কোনো লাভ নেই,—তুমি মাথা নীচু করে বইয়ের মধ্যে ডুবে থাকবে, আর টেবিলের উপর পড়ে পড়ে পেয়ালার মধ্যে চা শরবৎ হয়ে যাবে।'

মৃদু হাস্য করে অমরেশ বলল, 'আমার পড়া হয়ে গেছে। যা, তৈরি করে নিয়ে আয়।'

মাথা নেড়ে পূরবী বলল, 'না, এখানে নিয়ে আসব না। তোমাকে যেতে হবে।'

'কোথায় রে?'

'রান্নাঘরের বারান্দায়। সেখানে তোমার জন্য আসন পেতে এসেছি। তুমি গেলে মা খাবার দেবেন, আর আমি চা তৈরি করে দোব।'

সবিস্ময়ে অমরেশ বলল, 'আজ আবার এ ব্যবস্থা কেন পূরবী ?'

পূরবী বলল, 'এ ব্যবস্থা, তোমাকে ঘর থেকে টেনে বার করবার জন্য। রাত নেই, দিন নেই, সকাল নেই, সন্ধ্যে নেই,—পড়া, সমস্ত দিন পড়া। কাল শেষরাত্রে তিনটের সময় উঠে দেখি, তোমার ঘরে আলো জ্বলছে। আচ্ছা, দাদা, শরীরটা একেবারে নষ্ট না করে কি তুমি ছাড়বে না ?'

পূরবীর অনুযোগ শুনে অমরেশ হাসতে লাগল। বলল, 'আর পড়া নয় পূরবী, পড়া আপাতত শেষ হয়েছে। এবার দিনরাত ঘাটে মাঠে শ্মশানে মন্দিরে হৈ-হৈ করে ঘুরে বেড়াব।'

চক্ষু বিস্ফারিত করে পূরবী বলল, 'ও মা ! কেন ?'

'একটি ভদ্রলোকের খোঁজে।'

'ভদ্রলোকের খোঁজে ? কে সে ভদ্রলোক ?'

'সে ভদ্রলোক বহু দিন থেকে গা ঢাকা দিয়ে আছেন। কিছুতেই ধরা দিচ্ছেন না। নাম ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত।'

বিস্মিতকণ্ঠে পূরবী বলল, 'ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত ? ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত তো কবি ছিলেন, স্বর্গে গেছেন।'

অমরেশ বলল, 'এ ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্তও স্বর্গে থাকেন। স্বর্গে কিন্তু ইনি গুপ্ত নন গুপ্ত ইনি আমাদের এই ধরাতলে।'

এবার রহস্য ভেদ করতে সমর্থ হয়ে পূরবী খিলখিল করে হেসে উঠল। বলল, 'স্বর্গে ইনি গুপ্ত নন তো কী তিনি সেখানে ? সুপ্ত ?'

পূরবীর কথা শুনে অমরেশ হেসে উঠল, দক্ষিণ হস্ত দিয়ে পূরবীর মাথাটা অল্প একটু নেড়ে দিয়ে বলল, 'সাবাস পূরবী, ঠিক বলেছিস। সুপ্তই তিনি সেখানে, তাই পৃথিবীতে এত বিশৃঙ্খলা। মর্ত্যলোকের আবেদন-নিবেদন কান্নাকাটি কিছুই তাঁর কানে পৌঁছয় না।' তারপর এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করে ঈষৎ গম্ভীরস্বরে বলল, 'আচ্ছা পূরবী, তুই ঈশ্বর মানিস ?'

অবলীলার সহিত পূরবী বলল, 'ওমা, মানে নে আবার !'

'ঈশ্বর আছেন বলে বিশ্বাস করিস ?'

'হ্যাঁ, নিশ্চয় করি।'

একেবারে নির্বিকল্প অভিমত, দ্বিধা-দ্বন্দ্বের কোথাও সামান্য মাত্র অবকাশ নেই।

অমরেশ বলল, 'আচ্ছা, বিশ্বাস তো করিস, কিন্তু এ বিশ্বাসের হেতু কি ? কোনো প্রমাণ দেখাতে পারিস ?'

পূরবী বলল, 'নিশ্চয় পারি। এই পৃথিবী, চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, তারকা—এ সবই তো ঈশ্বরের সৃষ্টি।'

'লজিক পড়িস পূরবী ?'

'পড়ি বইকি।'

'তাও পড়িস !' হতাশার স্বরে অমরেশ বলল, 'কোনো আশা নেই তোকে নিয়ে।'

বিস্মিত কণ্ঠে পূরবী বলল, 'কেন দাদা ?'

অমরেশ বলল, 'সে আর-এক দিন বুঝিয়ে বলব। আপাতত গুপ্ত মহাশয়ের আলোচনা বন্ধ থাক্। তুই গিয়ে চায়ের জল চড়িয়ে দে, —আমি এলাম বলে।'

যেতে যেতে পিছন ফিরে পূরবী বলল, 'পাঁচ মিনিটের বেশি দেরি করো না কিন্তু।'

অমরেশ বলল, 'না, তা করব না।

অল্পক্ষণের মধ্যে চা ও খাবার খেয়ে অমরেশ গৃহ হতে নিষ্ক্রান্ত হল। কয়েকদিন পারুলদের কোনো সংবাদ নেওয়া হয় নি। আশু মুখার্জি রোডে উপস্থিত হয়ে একটা দক্ষিণগামী চলন্ত বাসে উঠে বসল।

অনুমতি দেবীর গৃহে সে যখন উপস্থিত হল, তখন সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হয়েছে। সদর-দরজা ভিতর হতে বন্ধ ছিল, কড়া নাড়তে চাঁপার মা এসে খুলে দিল।

অমরেশকে দেখে চাঁপার মা সহাস্যমুখে বলল, 'দাদাবাবু! কতদিন আস নি গো তুমি! দিদিমণি তোমার জন্যে ভেবে ভেবে একেবারে সারা।'

দরজায় হুড়কা লাগিয়ে দিয়ে চাঁপার মা বলল, 'মা কানাই পতিতুণ্ডীদের বাড়ি কথকতা শুনতে গেছেন। দিদিমণি ঠাকুর-ঘরে আছেন।'

অমরেশ সবিস্ময়ে বলল, 'ঠাকুর-ঘরে আছে? ঠাকুর ঘরে সে কি করছে?'

চাঁপার মা বলল, 'ওমা, দিদিমণি সবই তো করলেন! ঘর নিকানো পিদদীম দেওয়া, ধূপ-ধুনো দেওয়া, শাঁক বাজানো—সব তো দিদিমণিই আজকাল করেন।'

'মাসিমা তাহলে কি করেন?'

'মা পুজো করেন।'

'দিদিমণি পুজো করে না?'

'না, পুজো করেন না; জপ করেন।'

বিস্মিত কণ্ঠে অমরেশ বলল, 'জপ করে! জপ শেখালে কে তাকে?'

'কেন? মা।' বলে চাঁপার মা খিলখিল করে হেসে উঠল।

অমরেশ এসেছে সে কথা পারুল বুঝতে পেরেছিল। সে তাড়াতাড়ি কাজ সমাপন করে ঘর থেকে বেরিয়ে আসবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু তৎপূর্বেই চাঁপার মার সহিত কথা কইতে কইতে অমরেশ দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়াল। পারুল তখন পঞ্চপ্রদীপটা সাজিয়ে রাখছিল, অমরেশকে দেখে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'ভাল আছেন দাদা?'

স্মিতমুখে অমরেশ বলল, 'আছি। তুমি কেমন আছ?'

'ভাল আছি।'

অমরেশ বলল, 'তাড়াতাড়ি করো না পারুল, তোমার কাজকর্ম যা বাকি আছে সমস্ত ঠিক করে সেরে নাও।'

পারুল বলল, 'আমার কাজ শেষ হয়ে গেছে।'

'জপ?'

এবার পারুলের মুখ আরক্ত হয়ে উঠল। নতনেত্রে মৃদুকণ্ঠে বলল, 'আপনি ঘরে গিয়ে বসুন দাদা, আমি এখনি আসছি।' বলে উপবেশন করে পঞ্চপ্রদীপের বাকি দুইটা প্রদীপে ঘৃত ও সলিতা দিতে উদ্যত হল।

পারুলের ঘরে উপস্থিত হয়ে অমরেশ দেখল দক্ষিণ দিকের দেওয়ালের ধারে একখানি টেবিল ও খান তিনেক চেয়ার পড়েছে। টেবিলের উপর বই, খাতা, দোয়াত, কলম প্রভৃতি লেখাপড়ার যাবতীয় উপকরণ। টেবিলের বাম পাশে একটা ছোট কাঠের র‍্যাকে রামায়ণ, মহাভারত, অভিধান, রবীন্দ্রনাথের চয়নিকা, গান এবং অন্যান্য কতকগুলা বই।

টেবিলের সামনে একটা চেয়ারে বসে 'চয়নিকা'খানি নিয়ে অমরেশ পাতা ওলটাচ্ছে, এমন সময়ে ঘরে পারুল প্রবেশ করল। অমরেশের নিকট গিয়ে নত হয়ে তার পদধূলি গ্রহণ করে বলল, 'একটু চা নিয়ে আসি দাদা?'

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে অমরেশ বলল, 'না, নিশ্চয়ই নয়। এক ঘণ্টাও হয় নি চা আর খাবার এক পেট খেয়েছি,—এরই মধ্যে আবার খেলে তোমাকে খুশি করা হলেও নিজেকে দণ্ড দেওয়া হবে। নাও, বস।' বলে পারুলের দিকে একটা চেয়ার টেনে দিল। তাড়না খেয়ে পারুল উপবেশন করলে বই খাতাপত্রের দিকে অঙ্গুলিনির্দেশ করে অমরেশ বলল, 'এসব কি ব্যাপার পারুল? রীতিমত স্কুলের ছাত্রী হয়ে উঠেছ দেখছি।'

স্মিতমুখে পারুল বলল, 'মার কাণ্ড! শুধু কি এই? নিজে তো দু-তিন ঘণ্টা করে আমাকে পড়াচ্ছেন, তার ওপর রোজ সকালে একজন নার্স এসে আমাকে সেবার কাজ শেখাচ্ছে।'

ভ্রূকুঞ্চিত করে অমরেশ বলল, 'সেবার কাজ শেখাচ্ছে! তবে তো রীতিমত সেবিকা হয়ে উঠেছ দেখছি। এদিকে দেবসেবাও তো চলেছে?'

এ কথার পারুল কোনো উত্তর দিল না, চুপ করে রইল।

অমরেশ বলল, 'দেবতার সেবা তো করছ পারুল, কিন্তু দেবতা মান?'

পারুল বলল, 'মানি বইকি দাদা।'

'ঈশ্বর আছেন বলে বিশ্বাস কর ?'

'নিশ্চয় করি।'

'বিশ্বাস তো কর, কিন্তু ঈশ্বর যে আছেন তার প্রমাণ কিছু দিতে পার ?'

অম্লানবদনে পারুল বলল, 'পারি বইকি দাদা, আপনিই তো তার প্রমাণ।'

চক্ষু বিস্ফারিত করে অমরেশ বলল, 'কি সর্বনাশ! আমি কি করে প্রমাণ হলাম পারুল ?'

পারুল বলল, 'ঈশ্বর না থাকলে হরিদ্বারে আপনার দেখা পেয়েছিলাম কেমন করে ?'

পারুলের কথা শুনে অমরেশ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল; বলল, 'চমৎকার প্রমাণ তো! একেবারে অকাট্য! তা হলে হরিদ্বারে আমার দেখা পাওয়ার আগে তোমার পক্ষে ঈশ্বর ছিলেন না ?'

পারুল বলল, 'ছিলেন, কিন্তু প্রমাণ পাই নি।'

এবার আর অমরেশ পূর্বের মত হাসতে পারল না। বিশ্বাসের অনতিবর্তনীয় প্রভাব উপলব্ধি করে বিস্ময়ে সে নির্বাক হয়ে গেল। কত সান্ত্বনা, কত নির্ভরতা, কত পরিতৃপ্তি এই বহুনন্দিত এবং বহুঅবজ্ঞাত অন্ধ বিশ্বাসে! তাই যদি, তা হলে চক্ষুষ্মান হয়ে কি লাভ!

ক্ষণকাল পারুলের দিকে নিষ্পলক নেত্রে তাকিয়ে থেকে অমরেশ বলল, 'তুমি ঠিকই বলেছ পারুল, ঈশ্বর আছেন বলেই হরিদ্বারে তুমি আমার দেখা পেয়েছিলে।' তারপর পরমুহূর্তেই একটা কথা মনে হতে বলল, 'শুধু তাই নয়, হরিদ্বারে তোমার দেখা পেয়েছিলাম বলেই শেষ পর্যন্ত ঈশ্বর না আমার কাছেও প্রমাণ হয়ে যান।'

বিস্ময়গভীর কণ্ঠে পারুল বলল, 'কী যে বলেন দাদা! কত বড় পণ্ডিত মানুষ আপনি, কত শাস্ত্র পড়েছেন! ঈশ্বর আপনার কাছে প্রমাণ হতে এখনো বাকি আছেন না-কি ?'

গম্ভীরমুখে মাথা নেড়ে অমরেশ বলল, 'না, প্রায় কিছুই বাকি নেই।

কিন্তু তুমি যখন আমার মত পণ্ডিত মানুষ হবে পারুল, দেখো যেন ও-সব শাস্ত্র-নীতি পড়ো না।'

অমরেশের কথা শুনে পারুলের ওষ্ঠপ্রান্তে স্মিত হাস্যরেখা দেখা দিল, বলল, 'সে ভাবনা করবেন না দাদা। মেয়েরা পণ্ডিত হয় না, মানুষ যাও বা হয় পণ্ডিত হবে না।'

অমরেশ বলল, 'এ তো খুব ভাল কথা পারুল। মানুষ যদি না হয় তা হলে শুধু যে মাথাব্যথাই হবে না তা নয়, অনেক দুশ্চিন্তার হাত থেকেও রক্ষা পাওয়া যাবে।' তারপর চোখের পাতাগুলো একটু নাচিয়ে উঠে বলল, 'আচ্ছা, আজ এখন চললাম, শীঘ্রই আর একদিন আসব।'

অমরেশের কথা শুনে পারুলের মুখ ভার হয়ে উঠল। ব্যগ্রকণ্ঠে বলল, 'সে কি দাদা! এতদিন পরে এসে এখনি চলে যাবেন কি?'

মৃদু হেসে অমরেশ বলল, 'আজ একটু ব্যস্ত আছি পারুল।'

সমস্ত দিনের কাজের পর এই সন্ধ্যাবেলা আবার কি এমন কাজ আপনার পড়ল?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে অমরেশ বলল, 'কাজ ঠিক নয়, মনে মনে একটু ব্যস্ত আছি।'

বিস্ময়সহকারে পারুল বলল, 'মনে মনে ব্যস্ত আছেন! সে আবার কি দাদা?'

সহাস্যমুখে অমরেশ বলল, 'সে হয়তো তুমি ঠিক বুঝবে না।'

মনের মধ্যে কোন অজ্ঞাত প্রদেশে সহসা অভিমান জাগ্রত হয়ে উঠে পারুলের মুখমণ্ডলে তার মলিন ছায়া বিস্তার করল। ক্ষুব্ধ কণ্ঠে সে বলল, 'কেন বুঝব না দাদা? মনে মনে ব্যস্ত হতে আমরাই কি একেবারে জানি নে? কলকাতায় এসে একটু একটু করে আপনি কিন্তু দূরে সরে যাচ্ছেন।'

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে অমরেশ বলল, 'এ রকম দুশ্চিন্তা করো না পারুল। প্রথমত, দূরে সরে যাচ্ছি নে; দ্বিতীয়ত, যদিই বা যাই, মাসিমার বাড়িতে তুমি যে আশ্রয় পেয়েছ, তাতে তোমার কোন ক্ষতি হবে না।'

অমরেশের কথা শুনে পারুলের মুখে দুঃখ ও বেদনার ম্লান হাস্য-রেখা দেখা দিল; মুখটা অন্য দিকে একটু ফিরিয়ে নিয়ে মৃদু কণ্ঠে সে বলল, 'তাই যদি, তা হলে মাসিমার বাড়ি থেকে আমাকে সরিয়ে এমন কোনো জায়গায় রেখে দিন যেখানে ক্ষতি হবে।'

ক্ষণকাল নির্বাক থেকে মৃদুস্মিত মুখে অমরেশ বলল 'তেমন জায়গা হঠাৎ যা মনে পড়ছে সে তোমার গরানহাটা স্ট্রীটের গাইয়ে বিনির বাড়ি।'

মুহূর্ত মাত্র চিন্তা না করে পারুল বলল, 'তা হলে গরানহাটা স্ট্রীটের গাইয়ে বিনির বাড়িতেই আমাকে রেখে দিন।'

এবার অমরেশ হেসে ফেললে। বলল, 'আমাকে তুমি হারিয়েছ পারুল। তোমার এ কথার ভেবে উত্তর দিই, এত সময় আজ আমার নেই, শীঘ্র আর একদিন আসব। মাসিমা এলে বলো আমি এসেছিলাম।'

মৃদু স্বরে পারুল বলল, 'বলব।'

পথে বেরিয়ে অমরেশ পদব্রজে উত্তর মুখে চলল। কালীঘাটের ট্রাম ডিপোর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে দেখল দলে দলে যাত্রী ট্রাম এবং বাস হতে অবতরণ করে কালী মন্দিরের অভিমুখে ধাবিত হচ্ছে। সে দিন বোধ হয় কোনো তিথি-পর্বের যোগ ছিল। মনের মধ্যে সহসা কি খেয়াল উদিত হল, একদল যাত্রীর পিছনে পিছনে সে-ও মন্দিরের দিকে গতি চালিত করল।

মন্দির-প্রাঙ্গণে উপস্থিত হয়ে অমরেশ দেখল, অগণিত নর-নারী মন্দির প্রদক্ষিণ করছে, মন্দিরে প্রবেশ করছে, পূজা দিচ্ছে ঘণ্টা বাজাচ্ছে। কোথায় কপিল, কোথায় চার্বাক, কোথায় তর্ক, কোথায় বিচার! অন্ধ ভক্তি সমস্ত নিমজ্জিত করে নিয়ে বিপুল প্রবাহে বয়ে চলেছে। দক্ষিণ দিকের নাটমন্দিরে উঠে একজন বৃদ্ধ সাধুর পিছনে স্থানাধিকার করে অমরেশ সেই ভক্তিবিপ্লুত জনতার দিকে চেয়ে বসে রইল।

প্রায় ঘণ্টাখানেক পরে জনতা একটু বিরল হলে হঠাৎ পিছন দিকে দৃষ্টিপাত করে সাধু অমরেশকে নিজের অতি সন্নিকটে দেখতে পেলেন। পাশের দিকে অল্প একটু সরে বসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কে বাবা?'

করজোড়ে অমরেশ বলল, আজ্ঞে, আমি নাস্তিক।'

অমরেশের কথা শুনে সাধুজীর অধর-প্রান্তে মৃদু হাস্যরেখা দেখা দিল। বললেন, 'নাস্তিক তো আমার পিঠের উপর বসে নিশ্বাস ছাড়ছিলে কেন?'

অমরেশ বলল, 'নিশ্বাস ছাড়ছিলাম না, দেখতে চেষ্টা করছিলাম।'

'কি দেখতে চেষ্টা করছিলে?'

'ঈশ্বর।'

সবিস্ময়ে সাধু বললেন, 'ঈশ্বর?—ঈশ্বর আমার পিঠে থাকা আছেন না কি?'

অমরেশ বলল, 'না, তা নেই। ভক্তের মধ্য দিয়ে ভগবানকে দেখতে পাওয়া যায় কি-না তাই দেখছিলাম।'

'দেখতে কিছু পেলে? না, ভক্তকে একেবারে ষোল আনাই নিরেট বলে মনে হল?'

একটু ইতস্তত করে অমরেশ বলল, 'অপরাধ যদি না নেন তা হলে বলি, বেশ স্বচ্ছ বলেও বোধ হল না।'

সাধু বললেন 'না স্বচ্ছ নয়, সত্যি সত্যিই নিরেট। শুধু আমি নয়। প্রায় সব সাধুই আমার মত নিরেট। তুমি কিন্তু ভাগ্যবান।'

কৌতূহলভরে অমরেশ জিজ্ঞাসা করল, 'কেন, আমাকে ভাগ্যবান কিসে দেখলেন?' বলে সে একটু সরে গিয়ে সাধুর দিকে মুখ ফিরিয়ে বসল।

সাধু বললেন, 'তুমি যখন বলছ তুমি নাস্তিক, তখন তুমি ভাগ্যবান বইকি। তোমার অবিশ্বাসের জোর আছে, ঈশ্বর বিষয়ে তোমার মন নির্দ্বন্দ্ব। আমাদের বিশ্বাসেরও জোর নেই, অবিশ্বাসেরও জোর নেই,—সেই জন্যে ঈশ্বর আমাদের কাছে আবির্ভূত হন না। নাস্তিকদের অনেক সময়ে তিনি দেখা দেন।'

'তার মানে?'

'তার মানে, তিনি হয়তো একজন বড় শিকারী, বাঘকে দেখা দেন, ছাগলকে দেন না। নিত্যানন্দকে তিনি দেখা দিয়েছিলেন কি না বলতে পারি নে, কিন্তু জগাই-মাধাই তাঁর দেখা পেয়েছিল।'

অমরেশ বলল, 'আমাকে কি আপনার বাঘ বলে মনে হয়?'

'ডাক তো তোমার সেই রকম।' বলে সাধুজী উচ্চ হাস্য করে উঠলেন।

কোনো উত্তর না দিয়ে অমরেশও হাসতে লাগল।

আসন ত্যাগ করে দাঁড়িয়ে উঠে সাধুজী নিজের জিনিসপত্র গুছিয়ে নিচ্ছেন অমরেশ জিজ্ঞাসা করল 'চললেন না-কি বাবাজী?'

সহাস্য-মুখে সাধুজী বললেন, 'চললাম।'

'আশ্রমে?'

'গৃহে।'

সকৌতূহলে অমরেশ জিজ্ঞাসা করল, 'আপনি গৃহী না-কি?'

পুনরায় সাধুর মুখে মৃদু হাস্য ফুটে উঠল, বললেন, 'গৃহে যখন চলেছি, তখন বৈরাগী কেমন করে বল।'

অমরেশ বলল, 'তবে বৈরাগীর বেশ কেন? মুক্ত কচ্ছ, গেরুয়া বস্ত্র?'

'তোমার জেরার চোটে সাধু অসাধু হয়ে দাঁড়াল দেখছি।' বলে সাধুজী পুনরায় উচ্চ হাস্য করে উঠে প্রস্থানোদ্যত হলেন।

কথাবার্তার ধরনে সাধুকে অমরেশের ভাল লেগেছিল, পিছন হতে ডেকে বলল, বাবাজীকে অনুসরণ করব না-কি?'

অমরেশের দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে সাধুজী বললেন, 'ভদ্রবেশে সি. আই. ডি অফিসার যদি না হও তা হলে করে কাজ নেই, আজ একটু অসুবিধা আছে ইচ্ছা যদি হয় মঙ্গলবার সন্ধ্যাবেলা এইখানে এস, দেখা হবে।'

স্মিতমুখে অমরেশ বলল, যদি অপরাধ না নেন, তা হলে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি।'

'নির্ভয়ে কর।'

'আপনিই সাধুবেশে সি. আই. ডি. অফিসার নন তো?'

অমরেশের কথা শুনে সাধু উচ্চহাস্য করে উঠলেন; বললেন, 'মন্দ বল নি দিনকাল যা পড়েছে কে সাধু আর কে অসাধু চেনবার জো নেই। এমন দি

।মাকেও যদি গৃহীর বেশে বৈরাগী বলে সন্দেহ করি, তা হলে বোধ হয় বিশেষ য দিতে পারব না।' বলে সি ডি ভেঙে প্রাঙ্গণে অবতরণ করে দ্রুতপদে অগ্রসর লন।

অমরেশের একবার ইচ্ছা হল, অলক্ষ্যে সাধুকে অনুসরণ করে তার ·বিধি লক্ষ্য করে, কিন্তু পরমুহূর্তেই অসঙ্গত কৌতূহলকে দমন করে সে র পদে চিন্তাগ্রস্ত মনে কেওড়াতলার শ্মশান ঘাটে উপস্থিত হয়ে চুল্লীশ্রেণীর নিকট ী এক স্থানে প্রবেশ করল।

দুইটা চিতায় তখন দাহকার্য শেষ হয়ে এসেছে। অপর একটা চিতার ব মাত্র শব স্থাপনের উদ্যোগ আরম্ভ হয়েছে। পাঁচ-ছয় বৎসর বয়সের লকের শবদেহ—চোখে তাজা, কিন্তু মলিনতার কোনো চিহ্ন তার মধ্যে ·ই। আত্মীয়বন্ধুদের সঙ্গে কৌতূহলী দর্শকবৃন্দের কথায় তা থেকে অমরেশ নতে পারল, দুই দিনের ডিপথিরিয়া রোগে বালকের মৃত্যু হয়েছে।

এখন প্রাণের পুত্তলির সুন্দর সুকোমল দেহ অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়ে যাবে, ার নিষ্ঠুর নির্মম অপেক্ষায় সান্ত্বনাহীন শোকোন্মাদ পিতা নির্বাক বেদনায় মৃত ত্রের দেহ জড়িয়ে বসে আছে—শাস্ত্রের অনুশাসনে মুখাগ্নি করতে হবে কেই।

দর্শকদের মধ্যে একটি রমণী এই মর্মন্তুদ দৃশ্য দেখে আর্তকণ্ঠে বলে উঠল, 'হা ভগবান! এ কি শাস্তি বাপের!'

শুনে অমরেশ মনে মনে বলল, ঠিক, ঠিক। তা হলে হয়তো তুমি আছ ভগবান। নইলে এই দুঃসহ যন্ত্রণার নিষ্ঠুর অস্ত্র হানবার শক্তি আর কার এতটা থাকবে? এ নির্দয়তা সত্যই অপার্থিব।

ক্ষণকাল পরে অনুভূতি-বিবর্জিত পিতা মৃত পুত্রের মুখে অগ্নি প্রদান করল। ঘৃত এবং কাষ্ঠের সহযোগিতায় অগ্নি তার লেলিহান জিহ্বা বিস্তার করে জ্বলে উঠল। মেদমাংসপুষ্ট সেই সুকুমার দেহ জ্বলন্ত হুতাশনের তাড়নায় দ্রুতগতি ভস্ম এবং অঙ্গারে পরিণত হতে লাগল।

অনির্বেয় ঔৎসুক্যের আবেগে অমরেশ এই নির্মম ধ্বংসলীলার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বসে রইল। এই আপাতবিনশনের মধ্যেই সহসা এক সময়ে সে যেন জীবনের পরিচয় পেল। মনে হল, মৃত্যু যেন অস্তিত্বের পরিসমাপ্তি নয়, জন্ম যেন জন্মান্তরের অগ্রদূত; বিশ্ব যেন প্রাণহীন জড়ত্বের নির্বাক অভিব্যক্তি মাত্রই নয়। তবে কি এই জন্ম-মৃত্যু, সৃষ্টি-স্থিতি ধ্বংস-বিলয় তোমারই মানস-লীলা ভগবান? তবে কি তুমি আছ? হয়তো আছ, কিন্তু তার প্রমাণ নেই।

এ কথা মনে হতেই বাসনার চিঠির কথা মনে পড়ল—আমাদের সামান্য মনের ছোট ছোট যুক্তি জীবনের বড় বড় ব্যাপারে খাটাতে নেই।

হয়তো নেই।

গভীর রাতে গাত্রোত্থান করে অমরেশ গৃহাভিমুখে প্রস্থান করল। বাড়ি পৌঁছে সে দেখল, পূরবী তখনো রাত জেগে নিজের কলেজের বই পড়ছে সবিস্ময়ে বলল, 'কি রে পূরবী, রাত একটা বাজে এখনো জেগে রয়েছিস?'

পূরবী বলল, 'তুমি এলে খাবার দিতে হবে তো?'

'সে তো আমার ঘরে ঢেকে রাখলেই পারতিস।'

মাথা নেড়ে পূরবী বলল, 'না, তা পারতাম না। তুমি কাপড় বদলে শিগগির এস, খাবার ঘরে তোমার খাবার ঠিক করে রাখছি।' তারপর চলে যেতে যেতে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে বলল, 'এত রাত্র পর্যন্ত কোথায় ছিলে দাদা? ঈশ্বর গুপ্তের খোঁজ করছিলে না-কি?'

স্মিতমুখে অমরেশ বলল, 'হ্যাঁ, তাই করছিলাম।'

'সন্ধান পেলে?'

'কায়ার সন্ধান তো পেলাম না, তবে ছায়া যেন এক-আধবার দেখা দিচ্ছিল।'

'কোথায়?'

'মন্দিরে, শ্মশানে।'

সভীতি কণ্ঠে পূরবী বলল, 'ওমা, বলো না দাদা! তোমার কাপড় বদলে কাজ নেই, খাবে চল, খেয়ে-দেয়ে কাপড় বদলাবে।'

বিস্মিত কণ্ঠে অমরেশ বলল, 'কেন রে?'

পূরবী বলল, 'না দাদা, এই গভীর রাত্রে শ্মশান আর ছায়া দেখার গল্প করে কাজ নেই।'

পূরবীর কথা শুনে অমরেশ উচ্চৈঃস্বরে হেসে উঠল, বলল, 'বলিস কি পূরবী! দেবতা থেকে অপদেবতায় পৌঁছতে তোর যে এক পায়েরও বেশি দরকার হল না! ঈশ্বরভক্তির চেয়ে ভূতের ভয় তোর যে অনেক বেশি দেখছি।'

পূরবী বলল, 'আমি তো বলছি নে, বস।'

পকেট থেকে মনিব্যাগ প্রভৃতি টেবিলের উপর রাখতে রাখতে অমরেশ বলল, 'এ কথা শুনলে ঈশ্বর কিন্তু তোর উপর রাগও করবেন, দুঃখও করবেন।'

'তা করেন করবেন, তুমি এখন খাবে চল।'

পূরবীর দিকে ফিরে দাঁড়িয়ে অমরেশ বলল, 'এতখানি উপেক্ষা কি তুই ছায়া দেবতার উপর করতে পারছিস?'

এবার পূরবী হেসে ফেলল, বলল, 'আমি তা জানি না দাদা। তুমি শিগগির করে খাবে চল।'

'আচ্ছা, তুই একটুখানি দাঁড়া, আমি বাথ-রুম থেকে মুখ হাত ধুয়ে আসি।' বলে অমরেশ প্রস্থান করল।

২২

মাঘ মাসের শেষ দিক।

সুদীর্ঘ ছয় মাস কাল ভারতবর্ষের নানা তীর্থ পর্যটন করে মাত্র তিন দিন হল অমরেশ কলকাতায় প্রত্যাগমন করেছে। সম্প্রতি সে হরিদ্বারে অসীমানন্দ স্বামীর আশ্রমে অবস্থান করছিল। সেইখানে অনুমতি দেবীর গুরুতর পীড়ার সংবাদ লাভ করে পারুল কর্তৃক বিশেষভাবে অনুরুদ্ধ হয়ে সে অবিলম্বে হরিদ্বার পরিত্যাগ করতে বাধ্য হয়।

গত আশ্বিন মাসের প্রান্তভাগে অনুমতি বাতব্যাধিতে আক্রান্ত হন। বৎসর চারেক পূর্বে আর একবার তাঁর এই রোগ হয়েছিল। সেবার কতকটা সহজেই অব্যাহতি লাভ করেছিলেন। এবার কিন্তু সূত্রপাত হতেই পীড়ার প্রকোপ হৃৎপিণ্ডের উপর বিস্তার লাভ করেছে; এবং চার মাস কালব্যাপী নির্লাঘব দাপটের ফলে সেই হৃৎপিণ্ড এরূপ গুরুতরভাবে জখম হয়েছে যে, যে-কোনো মুহূর্তে তার ক্রিয়া রহিত হতে পারে বলে অনুমতির জীবন সম্বন্ধে তাঁর চিকিৎসকগণের দুশ্চিন্তার অন্ত নেই। এই তিন দিনের মধ্যে অমরেশ শহরের দুইজন প্রবীণতম চিকিৎসকের দ্বারা অনুমতির চিকিৎসা নিয়ন্ত্রিত করিতেছে। কিন্তু তদ্দ্বারাও কিছুমাত্র উপকার পাওয়া যায় নি। রোগ যখন চিকিৎসক এবং চিকিৎসার আয়ত্তের সীমা অতিক্রম করে, তখন একমাত্র ভরসা দেহের মধ্যে প্রাণশক্তির বিলীয়মান কারখানায় অকস্মাৎ কোনো বিপর্যয়ের সংঘটন। সেইরূপ বিপর্যয়ই অনুমতির জীবনের পক্ষে একমাত্র ভরসার কথা।

পূর্বে শারীরিক অসুস্থতা বশত দেবসেবার কার্যে কদাচিৎ অসমর্থ হলে অনুমতি পাড়ার একটি অনুগত বিধবা রমণীর দ্বারা সে কার্য সম্পন্ন করিয়ে নিতেন। এবারকার অসুখে কিন্তু প্রতিবেশিনীর সাহায্য গ্রহণ না করে দেবসেবার সম্পূর্ণ ভার তিনি পারুলের উপর ন্যস্ত করেছিলেন। একান্ত নিষ্ঠা এবং অনুরাগের সহিত সে-কর্তব্য সম্পন্ন করে বাকি সময় পারুল ঐকান্তিক চিত্তে অনুমতির শুশ্রূষায় আত্মনিয়োগ করে। অনুমতি প্রবলভাবে আপত্তি করেন, এত বেশি পরিশ্রম করে সে পীড়িত হলে অসুবিধা বর্ধিত হবে বলে ভয় দেখান। কিন্তু পারুল সে-সকল ওজর-আপত্তিতে কর্ণপাত করে না, অক্লান্ত পরিশ্রম এবং ধৈর্যের সহিত দেবতা এবং রোগী উভয়ের সেবা করে চলে। অগত্যা অনুমতিকে নিরস্ত হতে হয়।

সন্ধ্যার পর অমরেশ এসে উপস্থিত হল। পারুল তখন ঠাকুর-ঘরে সান্ধ্য অর্চনায় ব্যাপৃত। দ্বারপ্রান্তে অমরেশকে দেখতে পেয়ে অনুমতি হস্ত-সঙ্কেতে তাকে আহ্বান করলেন।

ভিতরে প্রবেশ করে অনুমতির পালঙ্কের নিকট একটা চেয়ার টেনে নিয়ে উপবেশন করে অমরেশ জিজ্ঞাসা করল, 'এবেলা কেমন আছ মাসিমা ?'

মৃদুস্বরে অনুমতি বললেন, 'ভাল।'

'সত্যি বলছ ?'

অনুমতির রোগশীর্ণ পাংশু মুখে হাস্য দেখা দিল; বললেন, 'সত্যিই বলছি। এক বেলায় যখন আরও কয়েক পা এগিয়ে গেলাম, তখন তো ভালই আছি অমর।'

প্রবলভাবে মাথা নেড়ে অমরেশ বলল, 'না, না মাসিমা, ও-সব কথা বলো না, নিশ্চয় তুমি ভাল হয়ে উঠবে।'

অনুমতির মুখে সেই শীর্ণ হাসিটুকু লেগেই ছিল; বললেন, 'সেটা তোর নিজের ইচ্ছে বাবা। কিন্তু মহারাজ যখন সত্যিসত্যিই আসবার ইচ্ছে করেন তখন কারুর ইচ্ছেই কাজে লাগে না, ঠিকই তিনি আসেন। মরণের কথা

এব আগেও যে কখনো কখনো মনে হয নি, তা নয। কিন্তু সে সবেব সঙ্গে এবারকাব তুলনাই হয না। শবীবেব মধ্যে এ এমন একটা আশ্চর্য বকমে আনচানানি, এমন একটা অদ্ভুত বকমেব ঢিলেঢালা হযে যাওযা, যাতে আর সন্দেহ নেই যে মহাবাজ আসছেন। কিন্তু সে কথা যাক, গগনবাবু আসছেন তো?'

অমবেশ বলল, 'নিশ্চয আসছেন। তিনি কথাব লোক; কথা যখন দিযেছেন তখন দশ-পনেবো মিনিটেব মধ্যেই এসে পডবেন। কিন্তু এত তাড়াহুড়ো করে এসব করবাব কি এমন দবকাব ছিল মাসিমা?'

অনুমতি বললেন, 'এ কথা তোব মত বুদ্ধিমান জ্ঞানী লোকেব মুখে সাজে না বাবা। এ সাধাবণ বাজে লোকেব কথা। এ বিষযে তাডাহুডো বলে কোনো কিছু নেই। আজ যদি হয তো কাল নয, এখন যদি হয তো তখন নয। বিশেষত, আমাব মত শবীবেব অবস্থায নিশ্চযই নয। পারুলেব জন্যে আমাব মনে চিন্তাব অন্ত নেই অমব।'

অমবেশ এ কথাব কোনো উত্তব দিল না, চুপ কবে বসে বইল।

ক্ষণকাল মনে মনে চিন্তা কবে অনুমতি বললেন, 'অবশ্য ওব ভাত-কাপডেব জন্য তেমন কিছু ভাবি নে, তাব একটা মোটামুটি ব্যবস্থা আজই তো কবে দিচ্ছি। কিন্তু পারুলেব মত একজন সুন্দবী সমর্থ মেযেব জন্যে ভাত কাপড়েব ভাবনাই তো সব চেযে বড ভাবনা নয অমব। দুদিন আগে যে রীতিমত ভোগিনী ছিল, ধীবে ধীবে সে একেবাবে যোগিনী হযে যাচ্ছে দেখলে মনে শুধু আনন্দই হয না,—একটু দুঃখও হয। হাজাব হোক মেযেমানুষ তো।'

'কে মেযেমানুষ মাসিমা? তুমি, না, পারুল?'

'দুজনেই।' বলে এত দুঃখ-কষ্টের উপরও অনুমতি হেসে উঠলেন।

অমরেশ বলল, 'বেশ তো মাসিমা, যোগিনীব জন্যে যদি তোমার এত দুঃখই হয, তা হলে যোগিনীকে আবাব ভোগিনী কবে দাও না।'

অনুমতি বললেন, 'যদি আমার নিজের পেটের একটা ছেলে থাকত, তা হলে কি দিতাম না অমর ? নিশ্চয় দিতাম। কিন্তু তা যখন নেই, তখন কাকে অনুরোধ করে অপ্রস্তুতে পড়ব বাবা ! বাঙালীর ঘরে কে এমন পুরুষসিংহ আছে, যে এই পাঁকের পদ্মফুলকে মালা করে গলায় পরতে সাহস করবে ? একজন অবিশ্যি আছে। কিন্তু তা হলে শুধু যোগিনীকেই ভোগিনী নয়, যোগীকেও ভোগী করতে হয়। সে বড় শক্ত কাজ অমর, অতটা আমার ভরসা হয় না।'

অমরেশ বলল, 'তা হলে সে কাজে কাজ নেই মাসিমা। এক ঢিলে দুটো পাখি মারতে গেলে হয়তো একটা পাখিও মরবে না।'

অমরেশের এই কথার মধ্যে প্রতিবাদের মত কিছু অনুমান করে অনুমতি সহসা উচ্ছ্বসিত হয়ে বলতে লাগলেন, 'আচ্ছা অমর, মেয়েদের ওপর তোদের এই জুলুম জবরদস্তি উৎপীড়ন কি শেষ হবে না কোনদিন ? পারুল-শ্রেণীর মেয়েদের জন্যে তোদের হতভাগা সমাজের দোর কি চিরদিনই বন্ধ থাকবে ? অথচ পারুলের চেয়ে কত বেশি ঘৃণিত জীবন নিয়ে কত মেয়ে সমাজের মধ্যে সদম্ভে দিনপাত করছে, তা জানতে তো কারো বাকি নেই। আচ্ছা, বুদ্ধি বিচার বিবেচনা কি চিরদিনের জন্যেই সংস্কারের পদানত হয়ে থাকবে ?' আবেগের সহিত কথা বলে অনুমতি হাঁপাতে লাগলেন।

চিন্তিত হয়ে অমরেশ বলল, 'না মাসিমা, তুমি উত্তেজিত হয়ো না, বেশি কথাবার্তাও বলো না। দেখ দেখি, কতটা তুমি হাঁপাচ্ছ !'

অমরেশের কথা শুনে অনুমতি বললেন, 'উত্তেজিত না হয়ে আর কথাবার্তা না বলেও সময়ে সময়ে এর চেয়ে কত বেশি হাঁপাই, তা দেখলে তুই এ কথা বলতিস নে বাবা। তোর কোনো ভয় নেই, এখনো দু-দশ দিন হাঁপের এই কষ্ট ভোগ করতে হবে,—এত শীঘ্র রেহাই পাব না। কিন্তু তুই আমার কথার উত্তর দে। বুদ্ধি বিচার বিবেচনা কি কোনদিনই সংস্কারকে জয় করতে পারবে না ?'

অমরেশ বলল, 'তুমি একটু ভুল করছ মাসিমা, যে তোমার দলের লোক তার সঙ্গে তুমি বিবাদ করছ। এই কথা নিয়ে যাদের সঙ্গে আমার বিবাদ, এমন এক-আধজনের ঠিকানা তোমায় দিতে পারি, তাদের সঙ্গে বিবাদ কবে দেখো যদি কিছু কবতে পার। কিন্তু সে কথা থাক্‌, পারুলের প্রতি তোমাব মনোভাব দেখে নিজের প্রতি দস্তুরমত শ্রদ্ধান্বিত বোধ করছি।'

স্মিতমুখে অনুমতি বলল, কেন, শ্রদ্ধান্বিত বোধ করছিস কিসে?'

'পাঁকের মধ্য থেকে এমন একটি পদ্ম আবিষ্কাব করেছি, এ কি কম বাহাদুরিব কথা?'

অনুমতি বললেন, 'বাহাদুরির কথা নিশ্চয়ই। কিন্তু সে আবিষ্কারের জন্যে নয় অমর, সে অন্য কারণে। এই ন-দশ মাসের মধ্যে কোনো কথা আমাকে বলতে পারুল বাকি রাখে নি। তোর পায়ে সরষের তেল মালিশের কথা পর্যন্ত আমাকে সে বলেছে। কি শুভ মুহূর্তেই ওকে দেখা দিয়েছিলি অমব! দেবতাব স্থানটুকু পর্যন্ত ওর মনের মধ্যে বাকি রাখিস নি, সমস্ত জায়গা নিজেই জুড়ে বসেছিস!'

অমরেশের মুখে মৃদু হাস্যরেখা দেখা দিল; বলল, 'ভারি জবরদস্ত লোক তো দেখছি আমি মাসিমা!'

অনুমতি বললেন, 'তাতে কি আর সন্দেহ আছে? জবরদস্ত না হলে কি কেউ এমন করে চুলের মুঠি ধরে একেবারে উল্টো পথে ফেরাতে পারে?'

সহাস্যমুখে অমরেশ বলল, 'যে-সব প্রাণী পিঠের উপর চুলের বড় বড় বিনুনি ঝোলায়, তাদের ফেরানো কিন্তু খুব শক্ত নয় মাসিমা।'

এ কথার উত্তর দেওয়ার সময় হল না, কক্ষের মধ্যে চাঁপার মা প্রবেশ করে বলল, 'দাদাবাবু, যে বাবুটির আসবার কথা ছিল তিনি এসেছেন।'

ব্যস্ত হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে অমরেশ বলল, 'কে? গগনবাবু?'

'হ্যাঁ।'

'কোথায় আছেন তিনি? গাড়িতে?'

'না, গাড়ি তো চলে গেল। আমি তাঁকে বসবার ঘরে বসিয়েছি।'

অনুমতি বললেন, 'এখানেই তাঁকে নিয়ে আয় অমর!' তারপর চাঁপার মার দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'চাঁপার মা, ঐ বড় চেয়ারটা আমার খাটের কাছে দে।'

বসবার ঘরে উপস্থিত হয়ে অমরেশ হর্ষোচ্ছ্বসিত কণ্ঠে বলল, 'আস্তাজ্ঞে হোক মেজদা। বাড়ি বার করতে কোনো অসুবিধে হয় নি তো?'

স্মিত-মুখে গগনবিহারী বললেন, 'কিছুমাত্র না। তুমি যা নির্দেশ দিয়ে দিয়েছিলে অমর, তাতে কোনো অসুবিধে হয় নি, একেবারে সোজা দোরগোড়ায় এসে হাজির হয়েছি। আর ঠিক সেই সময়ে বাড়ির ঝি কি-একটা দরকারে দোরটি খুলেছে।' বলে হাসতে লাগলেন।

'গাড়ি কোথায় পাঠালেন?'

'পাঠাই নি কোথাও। সামনের দিকের একটা চাকায় একটু হাওয়া কমে গিয়েছিল, বিপিন বড় রাস্তায় পেট্রোলের দোকানে হাওয়া নিতে গেছে।'

অমরেশ বলল, 'চলুন মেজদা, অনুমতি দেবীর ঘরে চলুন। আপনি তো জানেন তিনি চলৎশক্তিহীন। নিজে অগ্রসর হয়ে যে আপনাকে আহ্বান করবেন, সে ক্ষমতা তাঁর নেই।'

'চল।' বলে গগনবিহারী উঠে দাঁড়ালেন।

অমরেশের সহিত অনুমতির ঘরে প্রবেশ করে পালঙ্কের নিকটে উপস্থিত হয়ে গগনবিহারী দেখলেন, যুক্তকর ললাটে স্থাপিত করে অনুমতি তাঁকে নিঃশব্দে নমস্কার করছেন। 'নমস্কার!' বলে অনুমতিকে প্রতি-নমস্কার করে উৎসুক কণ্ঠে গগনবিহারী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন আছেন?'

মৃদুস্বরে অনুমতি বললেন, 'দেখুন, কি দুর্ভাগ্য আমার! আপনার মত সাধু লোকের পায়ের ধুলো পড়ল এ বাড়িতে, কিন্তু আমি যে এগিয়ে গিয়ে আপনার অভ্যর্থনা করব, সে সৌভাগ্য হল না। সুতরাং কেমন করে বলি, ভাল আছি।'

অনুমতির কথা শুনে গগনবিহারী হাসতে লাগলেন, বললেন, 'অনর্থক দুঃখ করবেন না মিসেস চ্যাটার্জি। তীর্থক্ষেত্রে সাধুদের পায়ের ধুলো পড়ে না, তীর্থধূলি অসাধুদের সাধু করে তোলে। অমরেশের মুখে আপনার এ বাড়ির খ্যাতি যা শুনেছি, তাতে এ বাড়িকে আমি তীর্থ বলেই মনে করি।'

অনুমতি বললেন, 'অমরেশের মুখে কি আপনি শুনেছেন তা তো আমি জানি নে বাঁড়ুজ্জে মশায়, কিন্তু আগেকার কথা যদি শুনে থাকেন তা হলে ঠিকই শুনেছেন। আগে এ বাড়ি সত্যিসত্যিই তীর্থ ছিল। কিন্তু সে রামচন্দ্রও নেই, সে অযোধ্যাও নেই!'

গগনবিহারী বললেন, 'আমাকে ক্ষমা করবেন মিসেস চ্যাটার্জি, আমার কিন্তু রামচন্দ্রের বিষয়ে বিশেষ কিছু শোনবার সৌভাগ্য হয় নি, যা কিছু আমি শুনেছি সবই জনকনন্দিনীর কথা শুনেছি।' বলে উচ্চহাস্য করে উঠলেন।

অনুমতি বললেন, 'অমরেশের কথা বিশ্বাস করবেন না, আমার বিয়য়ে ও নিরপেক্ষ নয়।'

অমরেশ বলল, 'অথচ সেই অমরেশের কথা বিশ্বাস করে মেজদাকে তুমি 'সাধু' বলে সম্বোধন করছ! মেজদার বিষয়েও আমি যে নিরপেক্ষ নই, এ তুমি কেন মনে করছ না মাসিমা?'

অমরেশের কথা শুনে গগনবিহারী উচ্চহাস্য করে উঠলেন; বললেন, 'এ প্রসঙ্গ নিয়ে অমরের সঙ্গে আর বেশি বাদানুবাদ করে কাজ নেই মিসেস চ্যাটার্জি, তা হলে ও যে আমাদের দুজনেরই বিষয়ে নিরপেক্ষ, তা সপ্রমাণ হওয়া আটকানো যাবে না।'

মৃদুস্মিত মুখে অনুমতি বললেন, 'তা হলে এমন অসুবিধের প্রসঙ্গ বন্ধ করাই যাক।' তারপর অমরেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'অমর, পারুলকে একবার ডেকে নিয়ে আয় তো বাবা।'

অমরেশ বলল, 'পারুল তো এখন ঠাকুর-ঘরে রয়েছে মাসিমা।'

'এতক্ষণে বেরিয়েছে।'

মিনিট দুই পরে অমরেশের সহিত পারুল ঘরে প্রবেশ করল। দেহ প্রায় নিরাভরণ, পরিধানে একটা মামুলি লাল পাড় শাড়ি; কিন্তু সৃষ্টিকর্তার হাত থেকে যে সৌন্দর্যের সে অধিকারিণী, তার সুষমায় গগনবিহারীর চক্ষু মুগ্ধ হয়ে গেল। আনন্দসংযুক্ত কৌতূহল নিরসনের তাড়নায় তাঁর মুখ থেকে নির্গত হল, 'এই পারুল!'

স্মিতমুখে অমরেশ বলল, 'এই পারুল।'

ততক্ষণে পারুল অবনত হয়ে গগনবিহারীর পদধূলি গ্রহণ করছিল। পারুলের মাথায় হস্তার্পণ করে গগনবিহারী বললেন, 'সুখী হও মা, সুখী হও।'

অধরপ্রান্তে একটু অদ্ভুত রকমের ক্ষীণ হাসি নিয়ে পারুল সোজা হয়ে উঠে দাঁড়াল। ভাল করে লক্ষ্য করলে দেখা যেত, কোথাকার কোন্ অপরিজ্ঞাত বেদনার আবেগে তার চক্ষুপ্রান্তও ঈষৎ সজল হয়ে উঠেছে।

অনুমতি বললেন, 'এই পারুল, কিন্তু এ পারুলের কিছুই নয়। মন দিয়ে তাকে যতটা বোঝা যায়, তার কাছে চোখ দিয়ে তার যেটুকু দেখা যায় তা এতই সামান্য। কিন্তু আমাদের এই দুর্ভাগা সমাজে কেউ কি কিছু বুঝতে চায় বাঁড়ুজ্জে মশায়? চোখে যা দেখা যায়, তাই দেখেই সকলে নিরস্ত হতে চায়।'

সমবেদনার করুণ কণ্ঠে গগনবিহারী বললেন, 'সে কথা একশো বার সত্যি।'

পারুলের প্রতি সস্নেহ নেত্রে দৃষ্টিপাত করে অনুমতি বললেন, 'দাঁড়িয়ে কেন পারুল, ঐ চেয়ারটা টেনে নিয়ে বস।'

পারুল কিন্তু উপবেশন না করে অনুমতির পালঙ্কের অতি নিকটে উপস্থিত হয়ে মৃদু স্বরে বলল, 'মা, তুমি ওষুধটা আগে খেয়ে নাও।'

অনুমতির ইচ্ছা এবং নির্দেশ অনুসারে কিছুদিন হতে পারুল অনুমতিকে 'তুমি' সম্বোধন করতে আরম্ভ করেছে।

অনুমতি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোন্ ওষুধ? সেই সন্ধ্যেবেলাকার তো?'

'হ্যাঁ।'

প্রস্তাব শুনে অনুমতির মুখে অসন্তোষের চিহ্ন দেখা দিল। বিরক্তিমিশ্রিত কণ্ঠে তিনি বললেন, 'আমি কি তোমাকে সেই জন্যে ডাকলাম পারুল? তুমি গিয়ে প্রথমে বাঁড়ুজ্জে মশায়দের জন্যে একটু চায়ের ব্যবস্থা কর: তারপর, ও-সব আপদ-বালাই যা করতে হয় পরে করো।'

মৃদুস্বরে উভয়ের মধ্যে কথোপকথন হলেও অমরেশ এবং গগনবিহারীর ত শ্রুতিগোচর হয়েছিল। প্রবল ভাবে প্রতিবাদ করে গগনবিহারী বললেন 'এত বড় অবিচার অতিথির ওপর করবেন না মিসেস চ্যাটার্জি। আপনার ওষুধ খাওয়ার আগে আমাকে চা খাইয়ে বিনা অপরাধে কঠিন দণ্ড দেবেন না। আচ্ছা, এক দাগ ওষুধ খেতে কত সময় আপনার লাগবে বলুন দেখি?'

অনুমতি বললেন, 'দাগ নয় বাঁড়ুজ্জে মশায়, গুঁড়ো। মকরধ্বজ। আধ ঘণ্টা ধরে সে ওষুধ না মাড়লে পারুল মনে করে, আমাকে বাঁচাতে পারবে না।'

গগনবিহারী বললেন, 'এর জন্যে কিন্তু আমি পারুলকে দোষ দিতে পারি নে। ওরকম মনে করলে আমি তো এক ঘণ্টা না মেড়ে ছাড়তাম না।'

একটা মৃদু হাস্যধ্বনি উত্থিত হল।

স্মিত মুখে পারুল বলল, 'আধ ঘণ্টা নয় বাড়ুজ্জে মশায়, মাড়তে মিনিট দশেকের বেশি লাগে না।' তারপর অনুমতির প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলল, 'মা, তুমি আজ অনেক কথা কয়েছ। এখনো হয়ত অনেক কইতে হবে। ওষুধ খেয়ে নিলেই ভাল হয়।'

এ কথার উত্তর দিলেন গগনবিহারী, বললেন, 'তুমি যাও পারুল, দশ মিনিটই লাগুক আর আধ ঘণ্টাই লাগুক, ওষুধ তৈরি করে নিয়ে এস। ওষুধ খাওয়ানোর আগে তুমি কোনো কাজই করো না।'

গগনবিহারীর নিকট অনুমতি লাভ করে প্রসন্ন মনে পারুল ঔষধ প্রস্তুত করবার জন্যে প্রস্থান করল।

'বাঁড়ুজ্জে মশায়!'

অনুমতির আর একটু কাছে চেয়ারটা টেনে নিয়ে ঈষৎ নত হয়ে গগনবিহারী বললেন, 'আজ্ঞে ?'

'এত কষ্ট করে আপনি আমার কাজটি করে দেবার জন্যে এসেছেন, কি বলে আপনাকে ধন্যবাদ দোব তা জানি নে।'

সহাস্যমুখে গগনবিহারী বললেন, 'জানলে কিন্তু ভাল হত, তা হলে যথার্থ যেটুকু আমার পাওনা তাই আপনি দিতেন। ধন্যবাদের এই ব্ল্যাঙ্ক চেক লিখে দিয়ে আমাকে ঋণগ্রস্ত হবার আশঙ্কায় ফেলতেন না।'

অনুমতি বললেন, 'ও-কথা বলবেন না বাঁড়ুজ্জে মশায়, আপনার মত বিজ্ঞ সহৃদয় লোক দয়া করে এ কাজটি করে দিতে স্বীকৃত হয়েছেন বলে আমি ভাবি নিশ্চিন্ত হয়েছি। আজই কি উইলটা তৈরি হয়ে যাবে ?'

অমরেশ বলল, 'আজ একটা ড্রাফ্‌ট উইল তৈরি হবে, তাতে তোমার অভিপ্রায়টা মোটামুটি ভাবে লেখা থাকবে। সেই ড্রাফ্‌ট উইলে তুমি সই করবে, আর আমরা দুজনে সাক্ষীরূপে সই করব। তারপর দু তিন দিনের মধ্যে আসল পাকা উইল তৈরি হবে।'

অনুমতি বললেন, 'এ উইলটা কি তা হলে কাচা ?'

গগনবিহারী বললেন, 'যতক্ষণ না পরবর্তী পাকা উইল তৈরি হচ্ছে ততক্ষণ এ উইলটা একেবারে পাকা। ব্যস্ত হবেন না মিসেস চ্যাটার্জি, আধ ঘণ্টার মধ্যেই আপনার সম্পত্তির পাকা ব্যবস্থা হয়ে যাচ্ছে।'

অনুমতি বললেন, 'ধন্যবাদ।'

অনুমতির সামান্য নিশ্বাসের কষ্ট হচ্ছে লক্ষ্য করে গগনবিহারী বললেন, 'যতক্ষণ না আপনার ওষুধ খাওয়া হচ্ছে আমরা ও-ঘরে গিয়ে বসছি। আপনি শ্রান্ত হয়েছেন, একটু বিশ্রাম করুন।'

সত্যসত্যই বিশ্রামের একটু প্রয়োজন হয়েছিল, মৃদুস্বরে অনুমতি বললেন, 'আচ্ছা।'

অমরেশের সহিত গগনবিহারী অনুমতির কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পূর্বোক্ত কক্ষে গিয়ে প্রবেশ করলেন। সেই কক্ষেরই এক প্রান্তে একটা ছোট টেবিলের সম্মুখে বসে পারুল ঔষধ প্রস্তুত করছিল, অমরেশ ও গগনবিহারীকে দেখে ধীরে ধীরে চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

পারুলের পার্শ্বে উপস্থিত হযে তাব মাথায দক্ষিণ হস্ত স্থাপিত করে স্নিগ্ধকণ্ঠে গগনবিহারী বললেন, 'তোমাকে আমি স্নেহ কবি, তোমাকে আমি শ্রদ্ধা কবি পারুল।'

বিস্ময়াপ্লুতনেত্রে গগনবিহাবীর মুখেব দিকে তাকিযে পারুল বলল 'কেন ?'

'তোমাকে অমবেশ স্নেহ কবে, শ্রদ্ধা করে বলে। তোমাব সঙ্গে পবিচয ক্রমশ ঘনিষ্ঠ হবে, এখন বসে বসে তোমার কাজ শেষ কব।'

আর একবাব গগনবিহার্বীব পদধূলি গ্রহণ কবে পারুল আসন গ্রহণ করল। চকিতে একবার অমরেশেব সহিত চোখোচোখি হল। দেখলে, অমবেশের মুখে আনন্দের প্রসন্ন হাসি।

২৩

গত নয়-দশ মাসে বাসনা তার জীবনকে একেবারে সম্পূর্ণ নূতন পথে প্রবর্তিত করেছে। কলেজ থেকে নাম কাটিয়ে নিয়েছে, বন্ধু-বান্ধবদেব সঙ্গে মেলামেশা করে না, সিনেমা দেখে না, রঙিন শাড়ি পরিধান করে না, মাংস এবং ডিম খাওয়া ছেড়ে দিয়েছে, এবং মাছের প্রতি তার ক্রমবর্ধমান অনাসক্তি লক্ষ্য করে অপর্ণা মনে মনে সঙ্কল্প করেছেন যে, যে দিন সে মাছ খেতেও আপত্তি করবে সেই দিন তিনি তার বিরুদ্ধে প্রকাশ্য বিদ্রোহ ঘোষণা করবেন।

ধর্ম-কর্ম আচার-অনুষ্ঠানের ব্যাপারেও সে তার জননীকে বহু পশ্চাতে ফেলে গিয়েছে। কয়েক মাস পূর্বেও যে অনভিজ্ঞতা কন্যাকে পূজা পাঠ বিষয়ে প্রাথমিক শিক্ষা দিতে গিয়ে অপর্ণা তার অজ্ঞতা দেখে হেসে আকুল হয়েছেন, আজ তারই কাছ থেকে দুই-একটা অজানা ক্রিয়া-কর্ম পদ্ধতি শিখে নেবার জন্য লোভ হয়,—বাধ বধি, সঙ্কোচ বশতই সে কথা কন্যাকে বলতে পারেন না। মাঝে মাঝে বাসনা তাদের কুলপুরোহিতকে আহ্বান করে তাঁর নিকট হতে প্রাণায়াম মুদ্রা-প্রকরণ প্রভৃতি বিষয়ে শিক্ষা গ্রহণ করে। অনুসন্ধিৎসু শিক্ষার্থিনীর জ্ঞানলিপ্সা নিবারণ করতে গিয়ে স্বীয় জ্ঞানের সঙ্কীর্ণতা উপলব্ধি করে পুরোহিতকে সময়ে সময়ে লজ্জিত হতে হয়। ধর্মাচরণে কন্যার এই অপ্রাকৃত আকর্ষণ দেখে অপর্ণা মনের মধ্যে স্বস্তি পাননা, মনে হয়, ব্যাধি অপেক্ষা চিকিৎসা দুর্বহ হয়ে উঠছে।

বস্তুত, ব্যাধির বিশেষ কোনো লক্ষণ আর দৃষ্টিগোচর ছিল না। দেখে মনে হয়, বাসনা সম্পূর্ণভাবে অমরেশকে বিস্মৃত হয়েছে। অমরেশের কোনো প্রসঙ্গে সে যোগ দেয় না, কখনো ভুলেও অমরেশের নামোচ্চারণ করে না। প্রথম প্রথম বাসনার এই সদাচারের জন্য কতকটা কৃতজ্ঞতাবশত অপর্ণাও নরেনের নামোচ্চারণ করতেন না, এখন তিনি করেন না ভয়ে। মনে হয়, বাসনার এই পরিবর্তিত জীবন-ধারার সহিত নরেন বোধ হয় যাবো অসমঞ্জস হয়ে গেছে। বাসনার মুখ হতে অমরেশের নাম অন্তর্হিত হওয়া যে বাসনা এবং নরেনের মধ্যবর্তী ব্যবধান সঙ্কীর্ণতর হওয়ার লক্ষণ, এ কথা ভাবতে অপর্ণার সাহস হয় না। সদর হতে যে বস্তু বিদায় গ্রহণ করেছে, অন্তরে প্রবেশ করে সে তার অস্তিত্ব বিস্তৃততর করে নি, তা কে বলতে পারে!

বাসনা বারব্রত করে, দেবালয়ে যায় এবং শিবনাথ তর্কবাগীশের নিকট কাব্য এবং বেদান্ত পাঠ করে। সপ্তাহের মধ্যে পাঁচ দিন তর্কবাগীশ মহাশয় অপরাহ্নে বাসনাদের গৃহে উপস্থিত হয়ে অধ্যাপনা করেন। কিন্তু দৈবক্রমে পদস্খলিত হয়ে বাম পায়ে আঘাত লাগায় কয়েক দিন তিনি গৃহ থেকে নির্গত হতে অক্ষম হয়েছেন বলে বাসনা তাঁর গৃহে এসে অধ্যয়ন করে যাচ্ছে।

সন্ধ্যাব পব পাঠান্তে শিবনাথেব গৃহ হতে নির্গত হযে মোটবে আবোহণ কবে বাসনা বলল, 'বতন, অফিস থেকে বাবাব গাডি ফোন কবে আনিযে মা গৌবীপুবে গেছেন। এই গাডি নিয়ে তুমি অফিসে যাবে।'

বতন বলল, 'যে আজ্ঞে দিদিমণি। আপনাকে বাডিতে নামিযে দিযে যাব তো ?'

এক মুহূর্ত চিন্তা কবে বাসনা বলল, 'আমাব একবাব শ্যামপুকুবে দাদামশাযেব বাডি যাওযাব বিশেষ দবকাব আছে। আমাকে সেখানে নাবিযে দিযে অফিসে গেলে বেশি দেবি হযে যাবে কি ?'

বতন বলল, 'না দিদিমণি, দেবি হবে না, সাযেব তো আজ কযদিনই দেবি কবে বাডি ফিবছেন।'

'আচ্ছা, তা হলে শ্যামপুকুবেই চল।'

'সাযেবকে বাডি পৌঁছে দিযে আপনাব কাছে গাডি নিয়ে যাব তো ?'

'না, আমি দাদামশাযেব গাডিতে ফিবব। আমাব ফিবতে বাত্রি হবে, বাডিতে বলে দিযো আমি দাদামশাযেব বাডিতে খাব।'

'যে আজ্ঞে।' বলে বতন গাডিতে স্টার্ট দিল।

গলি থেকে নির্গত হযে বসা বোডে উত্তব দিকে খানিকটা এসেই বতন গাডিব গতি মন্থব কবে পথেব বামপ্রান্তে স্থিব হযে দাঁডাল।

সকৌতূহলে বাসনা জিজ্ঞাসা কবল, 'কি হল বতন ?'

পাশেই পেট্রোলেব দোকানে গগনবিহাবীব ড্রাইভাব বিপিন চাকায হাওযা দিইযে নিচ্ছিল, সেই দিকে হস্তসঙ্কেত কবে বতন বলল, 'দাদামশাযেব গাডি বযেছে।'

বাসনাকে দেখতে পেযে বিপিন ছুটে এল।

বাসনা জিজ্ঞাসা কবল, 'কি খবব বিপিন ? দাদামশায কোথায ?'

বিপিন বলল, 'আজ্ঞে মা-মণি, কর্তাবাবু কাছেই একটা বাডিতে এসেছেন।'

'কাব বাডিতে ?'

'তা তো বলতে পারি নে মা-মণি। আর কখনো এ বাড়িতে আসি নি। কি, অনুকূলবাবু না কে,—কার যেন নাম করলেন।'

অনুকূলবাবু নামক কোনো পরিচিত ব্যক্তিকে বাসনার মনে পড়ল না, জিজ্ঞাসা করল, "কতক্ষণ থাকবেন তিনি সেখানে সে বিষয়ে কিছু তোমাকে বলেছেন?'

বিপিন বলল, 'না, তেমন কিছু স্পষ্ট করে বলেন নি, তবে বেশি বিলম্ব হবে বলে মনে হয় না। বাড়িতে পোখনরামের আসবার কথা আছে। চাকায় হাওয়া দিইয়ে আমাকে শিগগির ফিরে যেতে বলেছেন।'

চোখের কাছে একবার রিস্টওআচ তুলে সময় দেখে বাসনা চিন্তা করতে লাগল।

বাসনার চিন্তার বিষয় যথাযথ অনুমান করে বিপিন বলল, 'মা-মণি, আপনি কি আমাদের বাড়ি যাচ্ছিলেন?'

বিপিনের দিকে দৃষ্টিপাত করে বাসনা বলল, 'হ্যাঁ, তাই তো যাচ্ছিলাম বিপিন, শ্যামপুকুরেই যাচ্ছিলাম।'

'কর্তাবাবুর সঙ্গে দেখা করতে তো?'

'হ্যাঁ।'

তা হলে, কর্তাবাবু যখন এখানে রয়েছেন তখন আমাদের গাড়িতেই আসুন না মা-মণি। এ গাড়ি যখন রয়েইছে, তখন মিছিমিছি আর একটা গাড়ি নিয়ে গিয়ে লাভ কি?'

একমুহূর্ত চিন্তার পর রতনের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বাসনা বলল, 'সেই কথাই ভাল। আমি দাদামশায়ের গাড়িতে চললাম রতন, তুমি গাড়ি অফিসে নিয়ে যাও।'

রতন বলল, 'যে আজ্ঞে দিদিমণি।'

গগনবিহারীর মোটরে আরোহণ করে বাসনা বলল, 'আমি কিন্তু গাড়িতেই বসে থাকব বিপিন, নামব না। তুমি আমার কথা সেখানে কাউকে বলো না।'

বিপিন বলল, 'যে আজ্ঞে মা-মণি।'

চাকায হাওযা দেওযা হযে গিযেছিল, মিনিট দুযেকেব মধ্যে বাসনাকে বহন কবে গাড়ি অনুমতি দেবীব গৃহসম্মুখে এসে স্থিব হল।

জানলা দিযে অল্প একটু মুখ বাড়িযে বাসনা বাড়িটাব দিকে একবাব তাকিযে দেখল। একতলা বাড়ি, কিন্তু সুদৃশ্য এবং সুনির্মিত সদব-দ্বাবেব দক্ষিণ পাশে মর্মব-ফলকেব উপব খোদিত বযেছে 'অসিতাশ্রম' —গ্যাসেব উজ্জল আলোকে সহজেই তা পড়া গেল। অনুমতিব স্বামীব নাম অসিতনাথ। হযতো অমবেশেব মুখে সে কথা কখনো সে শুনে থাকবে, কিন্তু উপস্থিত কিছুই বুঝতে পাবল না। শীতেব কনকনে হাওযা দিচ্ছিল, দুই পাশেব জানলাব কাচ বন্ধ কবে দিযে বাসনা গাড়িব এক ধাবেব কোণে আশ্রয গ্রহণ কবল।

২৪

সময়ে সময়ে বিভিন্ন ঘটনাবলী এমন অদ্ভুত সহযোগিতার সহিত সংঘটিত হয়ে একটা অপ্রত্যাশিত ফলোৎপাদন করে যে, মনে হয় যেন কোন অদৃশ্য ইচ্ছাশক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়েই ঐ ঘটনাগুলির সংযোজন হয়েছে। বাসনাকে কেন্দ্র করে এমনই একটা ঘটনাচক্র যে দ্রুতবেগে গড়ে উঠছিল তদ্বিষয়ে সুদূরতম সংশয়ের দ্বারাও তার মন উদ্বিগ্ন হয় নি।

কার্যব্যপদেশে চাঁপার মা পথ-পার্শ্বের একটা ঘরে অবস্থান করছিল—গৃহসম্মুখে একটু তাড়াতাড়ি গাড়ি থামানোর ব্রেক্ কষার শব্দে আকৃষ্ট হয়ে জানালার ধারে গিয়ে পর্দা একটু সরিয়ে সে দেখল, একটি তরুণী মেয়ে গাড়ি থেকে মুখ বাড়িয়ে কি পর্যবেক্ষণ করছে। দ্রুতপদে পারুলের নিকট উপস্থিত হয়ে চাঁপার মা বলল, 'ও দিদিমণি, ঐ খুড়োবাবুর গাড়ি করে একজন মেয়ে এসে মুখ বাড়িয়ে কি খুঁজছে!'

অনুমতিকে মকরধ্বজ খাইয়ে এসে পারুল তখন গগনবিহারী এবং অমরেশের জন্য চা-পানের আয়োজন করছিল। চাঁপার মার কথা শুনে কৌতূহলের সহিত জিজ্ঞাসা করল, 'কত বড় মেয়ে রে?'

চাঁপার মা বলল, তোমার বয়সীই হবে। দেখতেও তোমার মত সুন্দর।'

পারুল বলল, 'ভাল করে দেখেছিল, ঠিক সেই গাড়ি তো? অন্য গাড়ি নয়?'

অধীর কণ্ঠে চাঁপার মা বলল, 'না গো না। অন্য গাড়ি নয়। সেই গাড়ি, সেই ড্রাইভার।'

পারুল বলল, 'তা যা না, নামিয়ে নিয়ে আয়।' তারপর কি ভেবে বলল, 'আচ্ছা দাঁড়া, আমিই যাচ্ছি।'

জলের কেটলিটা সবে মাত্র স্টোভের উপর বসিয়েছিল, সেটা নামিয়ে রেখে স্টোভটা নিভিয়ে দিয়ে পারুল বাহিরে গগনবিহারীর মোটরের সম্মুখে উপস্থিত হল।

গাড়ির ভিতর থেকে পারুলকে দেখতে পেয়ে বাসনা ধীরে ধীরে জানলার কাচ নামিয়ে দিল।

গাড়ির কাছে মুখ নিয়ে গিয়ে পারুল অভ্যর্থনার সুমিষ্ঠ কণ্ঠে বলল, 'গাড়িতে কষ্ট করে বসে আছেন কেন? আসুন, নেমে আসুন। ভেতরে বসবেন চলুন।'

যুক্ত করে স্মিতমুখে বাসনা বলল, 'না, না, আপনি ব্যস্ত হবেন না, আমি এখানে বেশ আছি। কোন কষ্ট হচ্ছে না।' তারপর তার এই অপ্রত্যাশিত আবির্ভাবের একটা কৈফিয়ৎ দেওয়ার হয়তো প্রয়োজন আছে মনে করে বলল, 'আমি দাদামশায়ের বাড়ি যাচ্ছিলাম। পথে তাঁর গাড়ি দেখে এখানে তিনি আছেন শুনে নিজের গাড়ি ছেড়ে দিয়ে তাঁর গাড়িতেই এলাম। এখানকার কাজ হয়ে গেলে তাঁর সঙ্গে একত্রে তাঁর বাড়ি যাব' জানালার উপর হাত রেখে পারুল দাঁড়িয়ে ছিল, তার হাতের উপর নিজের হাত স্থাপিত করে মিনতিব্যগ্র কণ্ঠে বাসনা বলল, 'আপনি কিছু মনে করবেন না, এ রকম গাড়িতে বসে রাস্তায় অপেক্ষা করবার অভ্যাস আমার আছে। কোনো অসুবিধে হবে না।' বলে হাসতে লাগল।

বাসনার এই দীর্ঘ সংলাপের শেষের দিকের অনেকখানি অংশই বোধ হয় পারুলের কানে ভাল করে প্রবেশ করে নি। সে সাগ্রহ কৌতূহলের সহিত বাসনাকে নিরীক্ষণ করছিল। বাসনার কথা শেষ হলে পুলকিত কণ্ঠে বলল, 'গগনবিহারী বাবু তা হলে আপনার দাদামশায় হন?'

বাসনা বলল, 'হ্যাঁ।'

পারুল বলল, 'চিনতে পেরেছি আপনাকে। সত্যি, আপনি ভারি চমৎকার

দেখতে! দাদার মুখে যা শুনেছিলাম, একেবারে ঠিক তাই। আসুন, আসুন, নেমে আসুন।'

সবিস্ময়ে বাসনা বলল, 'দাদার মুখে শুনেছিলেন? কে আপনার দাদা?' তারপর অকস্মাৎ মনের মধ্যে একটা সংশয় উদিত হতে পারুলের হাতের উপর থেকে নিজের হাত সরিয়ে নিয়ে কুঞ্চিত নেত্রে জিজ্ঞাসা করল, 'এ কার বাড়ি?'

বাসনার এই আকস্মিক ভাবান্তরে এবং রুক্ষ প্রশ্নে ঈষৎ বিস্মিত হয়ে পারুল বলল, 'কেন? তা আপনি জানেন না?—এ অনুমতি দেবীর বাড়ি।'

ঠিক এই আশঙ্কাই বাসনার মনের মধ্যে আবির্ভূত হয়েছিল। সুস্পষ্ট ঘৃণায় এবং বিরক্তিতে তার মুখ মলিন হয়ে উঠল। তীক্ষ্ণকণ্ঠে সে ডাকল, 'বিপিন!'

বিপিন অদূরে দাঁড়িয়ে ছিল, দ্রুতপদে নিকটে এসে বলল, 'মা-মণি?'

'তবে যে তুমি বললে, এ অনুকুলবাবুর বাড়ি?'

সভীতি কণ্ঠে বিপিন বলল, 'আমার তা হলে শুনতে ভুল হয়েছিল মা-মণি। বাড়ি সম্বন্ধে এ বাড়ির ঝির কাছে খোঁজ করবার সময়ে কর্তাবাবু অনুমতি দেবীরই নাম করে থাকবেন,—আমি ভুল করে অনুকূল শুনেছিলাম?'

ক্রুদ্ধস্বরে বাসনা বলল, 'সব কথা ভাল করে না জেনে-শুনে যেখানে-সেখানে আমাকে নিয়ে আসা তোমার অত্যন্ত অন্যায় হয়েছে।'

কেন অন্যায় হয়েছে কিছুমাত্র বুঝতে না পেরে অনুতপ্ত কণ্ঠে বিপিন বলল, 'আজ্ঞে তা হয়েছে, বুঝতে পারছি।'

বিরক্তি সহকারে ক্ষণকাল বাসনা কুঞ্চিতমুখে বসে রইল; তারপর বলল, 'আচ্ছা, দূরে গিয়ে অপেক্ষা কর, ডাকলে এসো।'

বিপিন চলে গেলে পারুলের দিকে দৃষ্টি না ফিরিয়েই রুক্ষস্বরে বাসনা বলল, 'আমি নামব না, গাড়িতেই অপেক্ষা করব।'

পারুল বলল, আচ্ছা, তাই না-হয় করবেন, কিন্তু নামলেও বিশেষ ক্ষতি ছিল না। এ বাড়িকে আপনি 'যেখানে-সেখানে' বলে মনে করছেন কেন?'

পারুলের প্রতি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করে বাসনা বলল, 'সে কৈফিয়ৎও দিয়ে যেতে হবে না-কি এখানে ?'

উত্তর শুনে পারুল বিস্মিত হল। ভদ্রতা ও সৌজন্যের পর্দা থেকে বাসনার এই আকস্মিক সুর-পরিবর্তনের হেতু কি, তা সে কিছুই বুঝতে পারলে না। তা ছাড়া, অনুমতি দেবীর গৃহকে 'যেখানে-সেখানে' বলে অভিহিত করবার পক্ষে এই নির্বন্ধ তার ভাল লাগল না। দৃঢ় কিন্তু শান্ত কণ্ঠে সে বলল, 'কৈফিয়ৎ দেবার কথা তো বলছি নে ; কিন্তু যে বাড়িতে গোপীনাথ আছেন, যে বাড়িতে অনুমতি দেবী বাস করেন, যে বাড়িতে দাদার যাতায়াত আছে, সে বাড়িকে, অন্তত আমি তো বুঝতে পারি নে, কি করে 'যেখানে-সেখানে' বলা যায় !'

সংযমের যে সামান্য অবশেষ তখনো বাসনার মনে কোনো প্রকারে অবস্থান করছিল, পারুলের মুখে অমরেশের প্রশস্তি শুনে নিমেষের মধ্যে তা অন্তর্হিত হল। অসৌজন্যের বিদ্রূপতরল কণ্ঠে সে বলল, 'ওরে বাস্ রে ! যে বাড়িতে দাদার যাতায়াত আছে সে বাড়ি তো পরম পবিত্র স্থান !'

অবিচলিত স্বরে পারুল বলল, 'এ কথা ঠিক বলেছেন, সত্যিই সে বাড়ি পরম পবিত্র স্থান। দাদা পা দিলে অপবিত্র স্থানও পবিত্র হয়ে ওঠে।' তারপর কণ্ঠের স্বর একটু গাঢ় করে নিয়ে কতকটা যেন নিজের মনে-মনেই বলতে লাগল, 'ছ মাস ছিলেন না, বাড়িটা যেন কি-এক বিশ্রী রকম হয়ে ছিল ; তিন দিন এসেছেন, হাওয়া বদলে গেছে।'

তিন দিন অমরেশ এসেছে ! পারুলের কথা শুনে বাসনা চমকে উঠল। অমরেশ তীর্থ হতে কলিকাতায় ফিরে এসেছে, এ কথা সে এ পর্য্যন্ত অবগত ছিল না। তিন দিন পরে সে সংবাদ পারুলের মুখ থেকেই শুনতে হল। অদৃষ্টে এতও ছিল ! বেদনা এবং অপমানের যৌথ আঘাতে বাসনা ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল।

দেহের মধ্যে ব্যাধির মত, মানুষের মনের মধ্যে কাম ক্রোধ প্রভৃতি রিপু আধ্যাত্ম শক্তির প্রভাবে মাত্র বশীভূত হয়ে অবস্থান করে। মনে হয়, একেবারে লুপ্ত হয়েছে ; কিন্তু বস্তুত লুপ্ত হয় না, সুপ্ত হয়েই থাকে। তারপর কোনো

আকস্মিক উত্তেজনার আলগা মুহূর্তে যখন সহসা জাগ্রত হয়ে ওঠে, তখন বহুদিনের সাধনার দ্বারা গঠিত সংযমের বাঁধ এমন করে ভাঙে যে, মনে হয় কোনোদিনই যেন তার অস্তিত্ব ছিল না। অমরেশের বিষয়ে পারুলের মন্তব্য শুনে বাসনারও সংযম ঠিক তেমনি করেই ভাঙল। তিক্ত বিকৃত কণ্ঠে সে বলল, 'ফর্দটা এতদূর এগিয়ে একটুর জন্যে অসম্পূর্ণ রয়ে গেল কেন? গোপীনাথ, অনুমতি দেবী, আর দাদা। এই তিনের সঙ্গে আর একটি জুড়ে দিলেই তো পবিত্রতার চতুষ্কলা পূর্ণ হয়, গণ্ডা পূরে যায়।'

বাসনার কথা শুনে পারুলের মুখে শীর্ণ হাস্য দেখা দিল; শান্তকণ্ঠে বলল, 'পারুলের কথা বলছেন? তা পাপিষ্ঠা পারুলকে দাদা যে-রকম পুড়িয়ে-টুড়িয়ে শুদ্ধ করে নিয়েছেন তাতে তাকে যে ফর্দে একেবারে যোগ করা যায় না তা নয়। তবে তা করলে নিতান্তই গণ্ডায় আণ্ডা মেলানো হবে।' বলে মৃদুস্বরে হেসে উঠল।

বাসনার এই পরিবর্তিত আচরণের যে কারণটা পারুল এতক্ষণ খুঁজে পাচ্ছিল না, এবার তা পেলে। তা হলে তারই প্রতি নিষ্করুণ ঘৃণা ভিন্ন এ আর কিছুই নয়! উঃ! এতই সে অশুচি বস্তু যে, তার স্পর্শে এ গৃহ পর্যন্ত অশুচি হয়ে গেছে; গোপীনাথ, অনুমতি দেবী এবং অমরেশের পবিত্র সমষ্টিও এর ভদ্রতা রক্ষা করতে সমর্থ হয় নি! এখন সে বুঝতে পারছে, কেন তার আগ্রহ এবং অনুরোধ সত্ত্বেও অমরেশ বাসনার সহিত তাকে পরিচিত করিয়ে দেবার বিষয়ে উদাসীন ছিল। একটা কুৎসিৎ বিরক্তিতে পারুলের বিক্ষুব্ধ মন কুঞ্চিত হয়ে উঠল। এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করে সে বলল, 'আমাদের এ গলির পথে লোকজনের তেমন ভিড় নেই, তবুও পথে দাঁড়িয়ে এমন করে কথাকাটাকাটি করা আমার মত লোকের পক্ষেও বোধ হয় উচিত নয়। বড্ড ঠাণ্ডা, কাচটা তুলে দিয়ে বসুন। আমি চললাম আপনার দাদামশায়দের খাবার উয্যুগ করতে। চায়ের জল স্টোভে চড়িয়ে নামিয়ে রেখে এসেছি।' বলে পিছন ফিরে গমনোদ্যত হল।

উদ্ধত কণ্ঠে বাসনা ডাকল, 'শোন।'

ফিরে দাঁড়িয়ে পারুল জিজ্ঞাসা করল, 'কি ?'

'দাদামশায়কে কে খাবার দেবে ?'

এক মুহূর্ত চিন্তা করে পারুল বলল, 'হয়তো আমি।'

এতক্ষণে বাসনা পারুলকে ভাল করে অপমানিত করবার মত একটা সুযোগের সন্ধান পেল ; রুষ্ট স্বরে বলল, 'আমি কিন্তু যার-তার হাতে দাদামশায়কে খেতে দেব না ; তিনি সত্যিসত্যিই ভদ্রলোক।'

স্থির অপলক নেত্রে বাসনার প্রতি দৃষ্টি স্থাপিত করে পারুল বলল, 'এত অপবিত্র আমি ? এত ঘৃণা ?'

'হাঁ, এত অপবিত্র, এত ঘৃণা।' বলে বাসনা দরজা খুলে নেমে দাঁড়াল।

ক্ষিপ্রপদে বাসনার সম্মুখে এসে তার গতিরোধ করে দাঁড়িয়ে পারুল জিজ্ঞাসা করল, 'কোথায় যাচ্ছেন ?'

'দাদামশায়ের কাছে।'

'না, আপনার যাওয়া হবে না।'

'তার মানে ?'

'তার মানে, অনুমতি দেবীর হার্টের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ। ডাক্তার বলেছেন, সামান্য মাত্র উত্তেজনা হলেও বিপদের সম্ভাবনা আছে। সেখানে গিয়ে এই সব কথা তুলে আপনি তাঁকে উত্তেজিত করবেন না।'

তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বাসনা বলল, 'আচ্ছা; আচ্ছা, সে বিবেচনা আমার আছে।' তারপর পারুলকে পাশ কাটিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হতে গেল।

পাশের দিকে একটু সরে গিয়ে বাসনার ঠিক সম্মুখবর্তিনী হয়ে পারুল বলল, 'শুনুন, আমি আপনার কাছে শপথ করছি, আমার হাতের ছোঁয়া কোনো জিনিস আপনার দাদামশায়কে খেতে দেব না। আমাদের বাড়িতে চাঁপার মা ঝি আছে, সেই চা-টা যা-কিছু করবার করে দেবে। ঝিদের-ছোঁয়া খাবার খাওয়া আপনাদের ভদ্রসমাজে তো চলিত আছে। চাঁপার মার হাতে খেলে নিশ্চয়ই যার-তার হাতে খাওয়া হবে না!'

পারুলের প্রতি তীব্র কটাক্ষপাত করে রুক্ষস্বরে বাসনা বলল, 'চল, চল। তোমার লেক্‌চার শোনবার মত আমার যথেষ্ট সময় নেই।'

পারুল বলল, 'চলুন যাচ্ছি। কিন্তু যাবার আগে লেক্‌চারের বাকি অংশ-টুকু শেষ করে যাই। আপনি বলছিলেন, আপনার দাদামশায় সত্যিসত্যিই ভদ্রলোক। তিনি যে ভদ্রলোক সে বিষয়ে আমারও সন্দেহ নেই। কিন্তু আপনাদের সমাজের বিস্তর ভদ্রলোক আমাদের সমাজে গিয়ে শুধু আমাদের ছোঁযাই খায় না, আমাদের উচ্ছিষ্টও খেয়ে আসে। আমরা কিন্তু তাদেরই ভদ্রলোক বলি। যারা মেকি ভদ্রলোক, যারা ভদ্রলোকের গর্জন করে অথচ ভদ্র নয়,—তাদের বলি নে। এবার চলুন।' বলে পারুল অন্দরের দিকে অগ্রসর হল।

পারুলের এই সুতীব্র শ্লেষাক্ত প্রতিঘাতের পর ঘৃণায় এবং বিদ্বেষে হয়তো বাসনার সবেগে পিছিয়ে যাওয়াই উচিত ছিল। কিন্তু তবুও কেন সে নিরুত্তরে পারুলকে অনুসরণ করল, তার হেতু নির্ণয় করতে হলে বাসনার অন্তরের গভীরতম প্রদেশে নিমজ্জিত হয়ে অনুসন্ধান করতে হয়। কিন্তু মানুষের মনের পরস্পরবিরোধী বৃত্তিনিচয়ের সংঘর্ষপ্রসূত হার-জিত, সব সময়ে সহজ-বিশ্লেষ্য ব্যাপার নয়। বাসনার এই বর্তমান ক্ষেত্রেও হয়তো তা নয়।

অন্দরে প্রবেশ করে প্রথমেই সাক্ষাৎ হল চাঁপার মার সঙ্গে। কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে পারুল ডাকল, 'চাঁপার মা!'

দ্রুতপদে নিকটে এসে চাঁপার মা বলল, 'দিদিমণি?'

'গগনবিহারীবাবুদের খাবার চা-টা যা-কিছু সব তুই তৈরি করে দিবি।'

সবিস্ময়ে চাঁপার মা বলল, 'আর তুমি?'

'আমার জন্য কাজ আছে!'

একটু সঙ্কোচের সহিত চাঁপার মা বলল, 'ঘরে খাবার দিয়ে আসবে কে দিদিমণি?'

'তুই দিয়ে আসবি।'

'সেটাও তুমি পারবে না?'

'না। সেটাও আমি পারব না।' বলে বাসনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে পারুল বলল, 'আসুন।'

নীরবে নিঃশব্দে বাসনা পারুলকে অনুসরণ করল।

অনুমতি দেবীর কক্ষের নিকটে উপস্থিত হয়ে দূর থেকে বাসনাকে দরজা দেখিয়ে দিয়ে নিমেষের মধ্যে পারুল অন্তর্হিত হল।

২৫

কক্ষে প্রবেশ করবার পূর্বে বাসনা মুহূর্তের জন্য দ্বারের সম্মুখে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়াতেই অমরেশ তাকে দেখতে পেল। চেয়ার ছেড়ে তাড়াতাড়ি উঠে কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে বলল, 'এই যে বাসনা! এস, এস।' তারপর অনুমতির প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলল, 'মাসিমা, বাসনা এসেছে।'

অমরেশের কথা শুনে সকৌতূহলে পিছন ফিরে দেখে গভীর বিস্ময়ের সহিত গগনবিহারী বললেন, 'একি বাসু! তুমি কেমন করে এখানে এলে?'

বাসনা গগনবিহারীর প্রশ্নের কোনো উত্তর দিলে না; হয়তো বা সে প্রশ্ন সে শুনতেই পেলে না। সে তখন আরক্ত মুখে অমরেশের সম্মুখে চোখে চোখে আবদ্ধ হয়ে নিঃশব্দে দাঁড়িয়ে,—ঠিক যেমন প্রবলতর শক্তির সম্মুখে অকস্মাৎ পড়ে গিয়ে দুর্বলতর শক্তি আবিষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে, তেমনি। পর-মুহূর্তেই কিন্তু এই সহসাজাত আত্মবিস্মৃতি হতে মুক্তিলাভ করে সে তাড়াতাড়ি

অনুমতিব পালঙ্কেব নিকট উপস্থিত হল এবং নত হযে তাঁকে প্রণাম কবে শয্যাব একেবাবে ধাবে সামান্য একটু স্থান গ্রহণ কবে বসে অস্ফুট কণ্ঠে জিজ্ঞাসা কবল, 'কেমন আছেন মাসিমা ?'

বাসনাব চিবুকে হাত দিযে চুম্বন কবে অনুমতি বললেন, 'ভাল আছি।' তাব পব তাব দক্ষিণ হস্ত নিজ দক্ষিণ হস্তেব মধ্যে গ্রহণ কবে বললেন, 'সুখী হও মা। বাজবাণী হও। আজ ঘুম ভেঙে কাব মুখ দেখেছিলাম জানি নে যে, তোমাব চাঁদমুখ দেখেও চোখ জুড়ল। অমবেব মুখে তোমাব কথা এত বেশি শুনেছি যে, আজ তোমাকে প্রথম দেখলেও একটুও অজানা বলে মনে হচ্ছে না। কি সুখ্যাতিই যে সে তোমাব কবে তা কি বলব!'

চকিত হযে অমবেশ বলল, 'সে তো অনেব দিনেব কথা মাসিমা। সে কথা এখনও ভোল নি তুমি? তোমাব স্মৃতিশক্তি তো তা হলে খুব প্রখব দেখছি!'

বিস্মযেব সুবে অনুমতি বললেন, 'অনেক দিনেব কথা কি বলছিস অমব? এই তো এবাবও হবিদ্বাব থেকে ফিবে এসে কাল বিকেলেই বাসনাব কত সুখ্যাতি কবছিলি।'

স্মিতমুখে অমবেশ বলল, 'কি আশ্চর্য। তা-ও কবছিলাম না-কি? তা হলে বলতে হবে আমাব স্মৃতিশক্তিই খুব দুর্বল।' বলে হাসতে লাগল।

এ সকল কথোপকথনেব প্রতি গগনবিহাবীব বোধ হয তেমন মনোযোগ ছিল না। বাসনাব অপ্রত্যাশিত আগমনজনিত বিস্মযেব মোহ হতে তখনও তিনি পবিপূর্ণভাবে মুক্তিলাভ কবতে সক্ষম হন নি। বাসনাব প্রতি দৃষ্টিপাত কবে বললেন, 'কিন্তু তোমাব এই নাটকীয আবির্ভাবেব বহস্য একটুও বোঝা যাচ্ছে না বাসু। মনে হচ্ছে, তুমি যেন অকস্মাৎ আকাশ থেকেই নামলে, অথবা মাটি ফুঁড়েই উঠলে!'

সহাস্য মুখে অনুমতি দেবী বললেন, 'আপনাব নাতনীটি যে-বকম সুন্দবী বাঁড়ুজ্জে মশায, তাতে আমাব মনে হচ্ছে বোধ হয আকাশ থেকেই নামল।'

অমরেশ বলল, 'আমার কিন্তু মনে হচ্ছে, আকাশ থেকেও নামে নি, মাটি ফুঁড়েও ওঠে নি, পেট্রোলের দোকান থেকে সোজা মেজদাদার গাড়ি করে এসে হাজির হয়েছে : সেখানে খুব সম্ভবত একটা কোনো রকম যোগাযোগ ঘটে থাকবে।'

উৎসুক নেত্রে বাসনার দিকে তাকিয়ে গগনবিহারী বললেন, 'তাই না-কি বাসু ?'

মৃদু স্মিত মুখে বাসনা বলল, 'তাই।'

সংক্ষেপে বাসনার মুখে ব্যাপারটা অবগত হয়ে গগনবিহারী যৎপরোনাস্তি বিস্মিত হলেন ; বললেন, 'ঠিক তো ধরেছিস অমর ! খুব বুদ্ধি দেখি তো তোর !'

অমরেশ বলল, 'বুদ্ধি নয়, মেজদাদা, অনুমান। অনুমানশক্তি যার যত বেশি, বুদ্ধিশক্তি তার তত কম।'

'তা হলে বেশি বুদ্ধিমান হয়ে আমরা তো বোকা বনে গেছি অমর !' বলে গগনবিহারী হো হো করে হেসে উঠলেন।

অনুমতি বললেন 'বুদ্ধি আর অনুমানের হিসেব যাই হোক না বাঁড়ুজ্জে মশায়, বাসনা যে এসেছে সেইটেই আমাদের বড় কথা ; কেমন করে এসেছে, সেটা বড় কথা নয়।' তারপর নিজের মুষ্টি হতে বাসনার হাত মুক্ত করে নিয়ে বললেন, 'যাও মা, ঐ চেয়ারটায় গিয়ে বস। এখানে বসে কষ্ট হচ্ছে।'

অমরেশ তখন ধীরে ধীরে ঘরের মধ্যে ইতস্তত ঘুরে বেড়াচ্ছিল। বাসনা তার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে একবার জিজ্ঞাসা করল, 'ভাল আছেন তো আপনি ?' তারপর উত্তরের জন্য অপেক্ষা না করেই নত হয়ে অমরেশের পদস্পর্শ করতে গেল।

ব্যস্ত হয়ে দুই পা পিছিয়ে গিয়ে অমরেশ বলল, 'আহা, কর কি, কর কি বাসনা ! পায়ে হাত দিয়ো না।'

সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠে মৃদু স্বরে বাসনা জিজ্ঞাসা করল, 'কেন ?'

অমরেশ বলল, 'বুঝতে পারছ না ? বেশি পায়ে হাত-টাত দিলে শেষ পর্যন্ত পায়াভারি হয়ে যাব।' বলে হেসে উঠল।

এ যেন সেই আগেকার সুরের রেশ, আগেকার কথারই ধরন। কিন্তু কে জানে তাই, না,—আর কিছু! আর কোনো কথা না বলে, যুক্ত করের দ্বারাই অমরেশের প্রণাম সমাপন করে, বাসনা গগনবিহারীর নিকট উপস্থিত হয়ে তাঁর পদধূলি গ্রহণ করল।

বাম হস্ত দিযে বাসনাকে বেষ্টিত করে ধরে গগনবিহাবী বললেন, 'পায়াভারি বোগের প্রতিষেধকও আছে অমরেশ। পায হাত দিযে প্রণাম করলে যদি এই রকম করে মাথায় হাত দিযে আশীর্বাদ করা যায়, তা হলে আর পায়া ভারি হবার ভয় থাকে না।' বলে বাসনাব মস্তকের উপর দক্ষিণ হস্ত বুলিয়ে দিলেন।

অমরেশ বলল, 'ও-রকম জোরালো প্রতিসেধক আপনার মত প্রবীণ কবিরাজই সাহস করে দিতে পারে মেজদা, আমার মত হাতুড়ের কর্ম নয।'

অনুমতি এ কথার প্রতিবাদ করলেন; বললেন, 'এ কিন্তু নিতান্তই তোমার বিনয় অমরেশ। তুমি যদি হাতুড়ে হতে, তা হলে পারুলের মত অমন শক্ত রোগীর চিকিৎসার ভার নিতে সাহস করতে না, আর অমন করে সাবাতেও পারতে না। আমার তো মনে হয়, এমন কোনো কঠিন রোগ নেই, যার চিকিৎসার ভার তোমার ওপর দেওয়া যায না।'

সহাস্য মুখে অমরেশ বললে, 'তোমার কথা শুনে লোভ হচ্ছে মাসিমা, 'ধন্বন্তরি' উপাধির সার্টিফিকেটটা তোমাকে দিযে আজ লিখিয়ে নিই।'

গগনবিহারী বললেন, 'সে সার্টিফিকেট যদি মিসেস চ্যাটার্জি তোমাকে লিখে দেন অমর, তা হলে তাঁর সইয়ের নিচে আমি আমার নিজের নামও স্বাক্ষর করতে রাজি আছি।'

অমরেশ বলল, 'তা আপনি কি করে করবেন মেজদা? আপনি জানেন, কে রোগী কে চিকিৎসক সব সময়ে আমি তা ঠিক করতে পারি নে। অপরকে চিকিৎসা করতে গিয়ে কখনো-কখনো নিজেই চিকিৎসিত হয়ে ফিরে এসেছি, এমন কথাও আপনার জানা আছে।'

অমরেশের কথা শুনে গগনবিহারী উচ্চহাস্য করে উঠলেন ; বললেন, 'কখনো-কখনো কি-না তা বলতে পারি নে, তবে একবারকার কথা সেই রকমই যেন মনে হয়।'

এই 'একবারকার কথা' কার কথা এবং কি কথা, তদ্বিষয়ে অনুমতির মনে একটা প্রবল ঔৎসুক্য এবং বাসনার মনে একটা তীক্ষ্ণ সংশয় জাগ্রত হল ; কিন্তু একটা অসঙ্গত-রকম বৃহৎ গোলাকার টিপয় অতিশয় অসুবিধার সহিত বহন করে চাঁপার মা ঘরে প্রবেশ করায় সকলের মনোযোগ সেই দিকে আকৃষ্ট হয়ে প্রসঙ্গটা এমন গুরুতর ভাবে চাপা পড়ে গেল যে, তা নিরাসনের আর কোনো সম্ভাবনা রইল না।

দ্রুতপদে চাঁপার মার নিকট উপস্থিত হয়ে টিপয়ের একটা দিক নিজে ধারণ করে অমরেশ বলল, 'কি আশ্চর্য, চাঁপার মা ! অনর্থক এত প্রকাণ্ড একটা জিনিস কষ্ট করে বয়ে আনলে কেন ? একটা ছোট-খাটো কিছু আনলেই তো পারতে।'

মৃদু হেসে অনুমতি বললেন, 'এতদিনেও চাঁপার মাকে চিনলে না অমর ? খুঁজে পেতে এর চেয়েও বড় একটা কিছু যে নিয়ে আসে নি, তার জন্যে ওকে তুমি ধন্যবাদ দিতে পার।'

অনুমতির মন্তব্য শুনে চাঁপার মা তার লজ্জাস্মিত মুখ এক পাশে ফিরিয়ে বেশ খানিকটা জিহ্বাগ্র অবলীলাক্রমে নির্গত করে দিলে। তারপর অমরেশের সাহায্যে গগনবিহারীর সম্মুখে টিপয়টি রেখে তিন গ্লাস জল এনে তদুপরি স্থাপন করলে।

এ পর্যন্ত অনুমতির মনে বিশেষ কোনো দ্বিধা উপস্থিত হয় নি, কিন্তু তিন প্লেট খাবার রেখে গিয়ে একটা কাঠের ট্রের উপর চায়ের যাবতীয় উপকরণ বহন করে একা চাঁপার মা-ই যখন কক্ষে প্রবেশ করল, তখন তাঁর মনে সংশয় জাগ্রত হল। বিস্মিত কণ্ঠে তিনি বললেন, 'পারুল কি করছে করছে চাঁপার মা ?'

চাঁপার মা বলল, 'তা তো জানি নে মা। আমাকে খাবার দিতে বলে সেই যে দিদিমণি ঠাকুর-ঘরে সেঁদিয়েছে, এখনো বেরোয় নি।'

এ কথা শুনে অনুমতি অপ্রসন্ন হলেন। নিজে তিনি ব্যাধি নিয়ে শয্যাগত,

সুতরাং তাঁর অক্ষমতা হেতু মাননীয় অতিথির সর্বপ্রকার পরিচর্যার ভার পারুল গ্রহণ করবে—এরূপ শুধু তাঁর ইচ্ছাই ছিল না, পারুলের প্রতি নির্দ্দেশও ছিল তাই। খাবার-ঘরে টেবিল-চেয়ারের ব্যবস্থা আছে; চা-পানের বন্দোবস্ত তথায় করলে তাঁর শয়ন-কক্ষে টিপয় প্রভৃতি বহন করে আনবার প্রয়োজন হত না। শুধু পরিচর্যায় ব্যাপারে তিনি যৎসামান্য যোগ দিতে পারবেন। তদুদ্দেশ্যেই এই ব্যবস্থা করা। আতিথেয়তার তত্ত্বাবধানে একমাত্র গৃহের পরিচারিকাকে নিযুক্ত দেখে অনুমতি ক্ষুব্ধ হয়ে বললেন, "ঠাকুর-ঘরের সব কাজ তো সে আগেই সেরে রেখেছে, আবার ঠাকুর-ঘরে তার কি দরকার পড়ল?'

এ কথার উত্তর অমরেশ দিলে; বলল, 'কি দরকারে গোপীনাথ আবার তাকে ঠাকুর-ঘরে তলব করেছেন, তা চাঁপার মা কেমন করে জানবে মাসিমা?'

মৃদু স্বরে অনুমতি বললেন, 'যে দরকারেই করুন, অসময়ে তলব করে গোপীনাথ অন্যায় করেছেন; অতিথি-নারায়ণের সেবার জন্যে এখন পারুলকে তাঁর ছেড়ে দেওয়া উচিত ছিল।' তারপর কোনো প্রয়োজনহেতু চাঁপার মা কক্ষ ত্যাগ করেছে দেখে গগনবিহারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'দোষই বা ওর দিই কি করে বাঁড়ুজ্জে মশায়, দেবতা ওকে ক্ষমা করেছেন, কিন্তু মানুষ এখনো করলে না; তাই মানুষের কাছে ওর সঙ্কোচও গেল না। নতুন লোক দেখলেই গা-ঢাকা দিতে চায়। যা কিছু ওর মধ্যে খাদ ময়লা ছিল, অমব তা পুড়িয়ে গালিয়ে একেবারে ওকে খাঁটি করে দিয়েছি। কিন্তু তা হলে কি হয়? বাজারে কত মরা-সোনার কেনা-বেচা চলছে, কিন্তু খাঁটি সোনা হয়েও পারুল অচল হয়ে রইল।'

কয়েক দিন পূর্বে দেশ থেকে দুইজন দূর-সম্পর্কীয় আত্মীয় এসে পারুলের পরিচয় পেয়ে জলস্পর্শ না করে তখনি সপ্রতিবাদে অনুমতির গৃহ পরিত্যাগ করেছিল, এ সেই আঘাতের বিরুদ্ধে অভিমান। সেদিনকার সেই মর্মপীড়ক ঘটনার কথা স্মরণ করে মনটা অধিকতর ক্ষুব্ধ হয়ে ওঠবার উপক্রম করছিল, এমন সময়ে মনে পড়ল টেবিলের উপর চা-পানের ব্যবস্থা ব্যর্থ হয়ে পড়ে রয়েছে এবং

আর কিছু না হোক, টি-পটের মধ্যে চায়ের জল ক্রমশ শীতল হয়ে আসছে, তদ্বিষয়ে কিছুমাত্র সন্দেহ নেই। অপ্রতিভ হয়ে অনুমতি বললেন, 'এই দেখুন! নিজের দুঃখ নিয়েই ভুলে রয়েছি, এদিকে চায়ের জল ঠাণ্ডা হয়ে এল। অতিশয় সামান্য আয়োজন বাঁড়ুজ্জে মশায়, অনুগ্রহ করে একটু জলযোগ করুন।' বলে করজোড়ে অনুরোধ করলেন।

গগনবিহারী বললেন, 'চা-পানের নিমন্ত্রণে জল-খাবারের এই বৃহৎ আয়োজন নিশ্চয় সামান্য না। কিন্তু পূজোর আগে দক্ষিণা চুকিয়ে দিয়ে ভাল করছেন না মিসেস চ্যাটার্জি,—শেষকালে কাজের সময়ে পুরুত ফাঁকি দিলে অসুবিধায় পড়তে হবে।' বলে উচ্চহাস্য করে উঠলেন।

গগনবিহারীর কথা শুনে অনুমতি স্মিতমুখে বললেন, 'সে ভয় যদি থাকে তো এটা না-হয় পুরুত বরণের দক্ষিণা বলে ধরা যাক বাঁড়ুজ্জে মশায়, আসল কর্মের দক্ষিণান্ত রাত নটার সময় করলেই হবে।'

'দক্ষিণ হস্তের ব্যাপার দিয়ে একেবারে ষোল আনা দক্ষিণান্ত!' বলে গগনবিহারী পুনর্বার উচ্চহাস্য করে উঠলেন। তারপর বাথ-রুম থেকে মুখ-হাত ধুয়ে এসে চা পানে ব্যাপৃত হলেন।

অ-ক্ষুধার আপত্তি উত্থাপন করে বাসনা কিছুই খেতে স্বীকৃত হল না, বলল, 'একেবারে ক্ষিদে নেই মাসিমা, একটু আগে চা জলখাবার খেয়েছি।'

অনুমতি বললেন, 'শুধু একটা সন্দেশ না হয় খাও।'

'না, তা-ও থাক্।'

অনুমতি আর অধিক পীড়াপীড়ি করলেন না। আত্মীয়দের সহিত সেদিনকার ব্যবহারের পর থেকে এ সকল ব্যাপারে তাঁর সাহসও কমে গেছে, প্রবৃত্তিও কমে গেছে; বললেন, 'তবে থাক। কিন্তু তোমার সঙ্গে পরিচয়টা অন্তত একটু মিষ্টি-মুখ দিয়ে আরম্ভ হলে খুশি হতাম।' এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে বললেন, 'তা হোক, আজকেও আমাদের মিষ্টির অভাব হয় নি। তোমার মিষ্টি মুখখানি দেখে আমার চোখ মিষ্টি হয়ে গেছে। আজ মিষ্টি চোখ পর্যন্ত রইল; এবার

যেদিন আসবে সেদিন একটুখানি ক্ষিধে সঙ্গে করে এনে মিষ্টি-মুখও করো।' বলে অল্প একটু হাসলেন।

গগনবিহারী বললেন, 'পরিচয়ের প্রথম দিনের পক্ষে এ এক-রকম ভালই হল মিসেস চ্যাটার্জি। কারণ, চোখ দিয়ে মিষ্টি প্রবেশ করে অন্তরে, আর মুখ দিয়ে উদরে। পরিচয়টা ঔদরিক হওয়ার চেয়ে আন্তরিক হওয়াই বাঞ্ছনীয়।'

গগনবিহারীর মন্তব্য শুনে অনুমতি এবং অমরেশ উভয়েই হেসে উঠলেন। এমন কি বাসনারও মুখে মৃদু হাস্যরেখা মুহূর্তের জন্য স্ফুরিত হয়ে মিলিয়ে গেল।

পারুলের সহিত প্রথম পরিচয়ের উত্তেজনার অসতর্ক মুহূর্তে বাসনার মন সহসা তিক্ত এবং ক্ষিপ্ত হয়ে উঠেছিল বটে, কিন্তু শান্ত হওয়ার পক্ষে খানিকটা অবসর পাওয়ার পরই পারুলের সহিত কথোপকথন কালে ওরূপভাবে স্থৈর্য এবং ধৈর্য হারানোর জন্য তার মনে গভীর অনুতাপ উপস্থিত হয়েছিল। এমন কি, বিদায় গ্রহণের পূর্বে নিজের অসঙ্গত আচরণের জন্য পারুলের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবার মত একটা কিছু করে যাবে, এরূপ কল্পনাও তার মনের মধ্যে প্রতিষ্ঠা লাভ করবার চেষ্টা করছিল। সুতরাং ঘৃণা অথবা বিদ্বেষবশত বাসনা যে কিছু খেল না, তা নয়; মনের আন্দোলিত অবস্থার যে ক্লেশ এখনও বর্তমান ছিল, তাকে উপলব্ধি করে খুব সহজে খাওয়া যায় না বলেই খেল না।

গগনবিহারী এবং অমরেশও তাকে খাবার জন্য অনুরোধ করল না, গগনবিহারী করলেন না—করা নিরাপদ নয় আশঙ্কা করে, এবং অমরেশ করল না—করলে বাসনার প্রতি অবিচার করা হবে সেই বিবেচনায়।

২৬

অনুমতির পক্ষ হতে যথাশক্তি আদব-যত্ন উপবোধ-অনুবোধের মধ্য দিযে চা-পানের পর্ব শেষ হল। তারপর আরম্ভ হল উইল-তৈয়ারিব পালা।

উইলেব মর্ম নিতান্তই সরল ও সংক্ষিপ্ত। অনুমতি দেবীব মৃত্যুব পর তাঁর ত্যক্ত সমস্ত স্থাবর এবং অস্থাবব সম্পত্তি নির্ব্যূঢ় ভাবে পারুলেব অধিকার ভুক্ত হবে, সমস্ত সম্পত্তিব উপব দান-বিক্রয়ের অবাধ ক্ষমতা পারুলের থাকবে। অর্থাৎ, উইলের দ্বারা স্বামীর নিকট হতে যে ভাবে অনুমতি সম্পত্তি লাভ করেছিলেন, ঠিক সেই ভাবে তিনি সমস্ত সম্পত্তি পারুলকে দিয়ে যাবেন।

অমরেশের নিকট হতে অনুমতি দেবীর অভিপ্রায মোটামুটি অবগত হযে গগনবিহারী একটা খসড়া উইল প্রস্তুত কবে এনেছিলেন। সেইটে অনুমতি দেবীকে পড়ে শুনিয়ে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেমন, এই রকমই তো আপনার ইচ্ছে?'

প্রসন্ন কণ্ঠে অনুমতি বললেন, 'হ্যাঁ বাঁড়ুজ্জে মশায়, ঠিক এই রকমই আমার ইচ্ছে।'

'অন্তত স্থাবর সম্পত্তিব দান-বিক্রয় সম্বন্ধে পারুলের উপর কোনো রকম বাধার ব্যবস্থা করবেন না কি?'

'না, করব না।'

'আর, আপনার গোপীনাথ সম্বন্ধে?'

সকৌতূহলে অনুমতি জিজ্ঞাসা করলেন, 'গোপীনাথ সম্বন্ধে কি বলুন?'

'গোপীনাথের সেবা-যত্ন রক্ষণাবেক্ষণ যাতে চিরকাল ভালভাবে চলে, সে জন্যে এমন কোনো সম্পত্তি পৃথক করে রাখবেন না কি, যার উপর পারুলের দান-বিক্রয়ের ক্ষমতা থাকবে না?'

অনুমতি বললেন, 'না তা-ও রাখব না। আমাব হাতে গোপীনাথ যেমন নিরাপদে আছেন, পারুলের হাতেও তেমনি থাকবেন বলে মনে করি। আমার এ বিশ্বাস যদি ভুল হয়, আব তার জন্যে ভবিষ্যতে গোপীনাথেব সেবায় যদি ত্রুটি-বিচ্যুতি ঘটে, এমন কি সেবা যদি একেবারে বন্ধই হয়ে যায় তো সে জন্যে পারুলকে দোষী করব না বাঁড়ুজ্জে মশায়, নিজেব অনুমান শক্তিকে দোষী করব।'

অনুমতির এই অনন্যসাধারণ উদারচিত্ততা দেখে গগনবিহাবী বিমুগ্ধ হলেন; আনন্দোচ্ছল কণ্ঠে বললেন, 'যে অনুমানে এতটা বিশ্বাসের দৃঢ়তা রয়েছে, তা কখনো ভুল হবে না মিসেস চ্যাটার্জি। যেমন খসড়া হযেছে, আপনার উইলও ঠিক তেমনি তৈরি হবে। কোন পরিবর্তনের প্রযোজন নেই?'

ধীরে ধীরে মাথা নেড়ে অনুমতি বললেন, 'না, কোনো প্রয়োজন নেই। তা ছাড়া, উইলের একজিকিউটর হয়ে অমরেশ যখন রইল, তখন তো কোনো চিন্তাবই কারণ রইল না। এমন কোনো কাজই পারুল কববে না, যা করতে অমরেশ মানা করবে।'

মুখমণ্ডলে কপট গাম্ভীর্যের অবলেপ মাখিযে অমবেশ বলল, 'কিন্তু মাসিমা, তেমন কোনো কাজ যদি সে করে বসে, যা তাকে আমি করতে বলব?'

অমরেশের প্রশ্নের মর্ম এক মুহূর্ত চিন্তা করে দেখে অনুমতি বললেন, 'তেমন কোন কাজ কি আবার অমর? যে-কোনো কাজ তাকে করতে বলবি, তাই তো সে করবে। তোর কথার অবাধ্য হবে সে অবস্থা কি তার বেখেছিস? তুই যদি ওকে জলে ডুবতে বলিস তো জলে ডুববে, আগুনে পুড়তে বলিস তো আগুনে পুড়বে।'

অমরেশ বলল, 'কিন্তু ধর, ও-দুটো মারাত্মক কাজের কোনটাই করতে

না বলে তোমার কাছ থেকে পাওয়া সমস্ত সম্পত্তি যদি আমাকে দান করে দিতে বলি, তা হলে ?'

অমরেশের কথা শুনে সহাস্য মুখে অনুমতি বললেন, 'তা হলে তো এক-রকম ভালই হবে। বাঁ হাত থেকে সম্পত্তি ডান হাতে আসবে।'

বিস্মিতকণ্ঠে অমরেশ বলল, 'কার বাঁ হাত থেকে কার ডান হাতে আসবে মাসিমা ?'

অনুমতি বললেন, 'তা-ও তোকে বলে দিতে হবে অমর, তবে তুই বুঝবি ? পারুলের বাঁ হাত থেকে পারুলেরই ডান হাতে আসবে।'

চক্ষু বিস্ফারিত করে অমরেশ বলল, 'বল কি মাসিমা ! এ এমন জটিল ব্যাপার, এমন একটা অদ্ভুত দৈহিক রহস্য যে, বলে দিলেও বুঝতে পারছি নে। আমি পারুলের ডান হাত না-কি ?'

অনুমতি বললেন, 'শুধু ডান হাত কেন, তুই পারুলের কী যে নোস তা আমি জানি নে।' তারপর গগনবিহারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'আমি একটুও অত্যুক্তি করছি নে বাঁড়ুজ্জে মশায়, পারুলকে অমরেশ ভেঙে-চুরে এমন নতুন করে সৃষ্টি করেছে যে, পারুলের আজকালকার জীবন থেকে অমরেশকে বাদ দিলে বোধ হয় পারুলের মাংসপিণ্ডটাই শুধু পড়ে থাকে।'

মৌখিক কিছু না বলে মৃদু হাস্যের দ্বারা গগনবিহারী এ কথার উত্তর দিলেন। বীজগণিতের সমীকরণ প্রণালী অনুসারে শরীরতত্ত্বের এই অঙ্কটি মনে মনে কষে দেখে অমরেশকে পারুলের যে অংশ বলে তাঁর মনে হ'ল, বাসনার উপস্থিতি হেতু তা প্রকাশ করতে সাহস করলেন না। তা ছাড়া, যে পারুল-অমরেশ প্রসঙ্গ বাসনার মনে বিক্ষোভ সঞ্চার করেছে বলে তাঁর বিশ্বাস, সে প্রসঙ্গে যোগ দিতে তিনি মনের মধ্যে পীড়া বোধ করছিলেন।

অমরেশও বাসনার কথা স্মরণ করে অনুমতি দেবীর উচ্ছ্বাসকে আর অগ্রসর হতে না দেবার উদ্দেশ্যে বলল, 'আমি যদি পারুলের ডান হাত হই মাসিমা, তা হলে পারুলের ডান হাতের অধিকারে বিষয় এলে তোমার গোপীনাথ কিন্তু

বিপদে পড়বেন, পাকলের ডান হাত নাস্তিকের হাত, তা যেন ভুলো না।'

অনুমতি বললেন, 'গোপীনাথ বিপদে পড়বার পাত্র নন অমর। ভবিষ্যতে একদিন তিনি নাস্তিকের হাত আর ভাবুকের হাত—ডান হাত আর বাঁ হাত—দুই হাতই তাঁর সেবায় মিলিয়ে নিয়ে এক ক'রে দেবেন—এ আমি আজ তোকে ব'লে রাখলাম। আমি অবশ্য তখন থাকব না, কিন্তু রইলি তুই, রইল পাকল, রইলেন গোপীনাথ। দেখিস, আমার কথা সত্যি হয় কি-না।' তারপর খানিকটা যেন নিজের মনে মনেই গুনগুন ক'রে বলতে লাগলেন, 'শুধু কি মন্ত্র পড়েই মানুষের সঙ্গে মানুষের মিলন হয়! কত ভাবে, কত রকমে, কত অপড়া মন্ত্রের মধ্যে দিয়ে যে মনে মানুষের অন্তরের মিলন হয়ে ওঠে তা একমাত্র অন্তর্যামীই জানেন।'

মনোজগতের এই সব গুরুতর তথ্যের ঘাত-প্রতিঘাতে কাজের মধ্যে যেন চিন্তা-প্রবাহ চলাচল ক'রে বেড়াচ্ছিল। নিমেষের জন্য বাসনা এবং অমরেশের পরস্পর চক্ষের দৃষ্টি বিনিময় হ'ল। সেই তিলার্ধ সময়ের মধ্যে অমরেশ দেখল, বাসনার উৎকণ্ঠিত উদ্বিগ্ন মুখমণ্ডল আরক্ত হয়ে চকচক করছে। দুঃখে এবং সহানুভূতিতে অমরেশের মন উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল।

'মাসিমা!'

অমরেশের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, 'কি বাবা?'

'নিজেকে রিক্ত করবার ব্যবস্থা করছ—সেই আনন্দে মন তোমার আজকে মাতাল হয়ে রয়েছে। তাই যত বাজে বাজে কথা মুখ দিয়ে বেরুচ্ছে। এদিকে আসল কাজের কথা এখনো শেষ হয় নি, তা মনে আছে তো?'

'কি কাজের কথা?'

'ড্রাফট উইলে সকলের সই করা?'

অনুমতি বললেন, 'হ্যাঁ, সে কথা মনে আছে। আচ্ছা, তা হ'লে সে কাজটা যা-হয় সেরে নাও।'

গগনবিহারীও বললেন, 'হাঁ কাজটা সেরে ফেলাই ভাল, শিগগির বাড়ি ফেরবার জন্য আমারও একটু তাড়া আছে।'

অনুমতির ইচ্ছা ছিল, ড্রাফ্‌ট উইল সই হবার সময়ে পারুল উপস্থিত থাকে। পারুলকে ডেকে আনবার জন্য তিনি অমরেশকে অনুরোধ করলেন।

চেয়ার ছেড়ে দাঁড়িয়ে উঠে অমরেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বাসনা বলল, আপনি বসুন, আমি ডেকে দিচ্ছি।'

অনুমতি জিজ্ঞাসা করলেন, "তোমার সঙ্গে পারুলের পরিচয় হয়েছে মা?'

'হ্যাঁ, হয়েছে।' বলে বাসনা প্রস্থান করল।

কক্ষ হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে চাঁপার মাকে দেখতে পেয়ে বাসনা পারুলের কথা জিজ্ঞাসা করল। পারুল তখন নিজের ঘরে অবস্থান করছিল। পারুলের ঘরের সম্মুখে বাসনাকে নিয়ে গিয়ে চাঁপার মা বলল, 'ভেতরে যান, দিদিমণি ঘরে আছেন।'

বাসনা ঘরে প্রবেশ করতেই পারুল নিকটে এসে জিজ্ঞাসা করল, কি?

বাসনা বলল, 'তোমার সঙ্গে একটা কথা আছে।'

বাসনার প্রতি ভ্রূকুঞ্চিত দৃষ্টিপাত ক'রে পারুল জিজ্ঞাসা করল, 'আবার কি কথা?'

এক মুহূর্ত নীরবে অবস্থান করে বাসনা বলল, 'তখন যে বলছিলাম তোমাকে আমি ঘৃণা করি, সে কথা সত্যি নয়,—তোমাকে আমি ঘৃণা ঠিক করি নে।'

তবে?'

নিরুদ্ধ নিশ্বাসে বাসনা বলল, 'তোমাকে আমি ভয় করি, হিংসে করি।'

বিস্মিত কণ্ঠে পারুল বলল, 'ও মা! কেন? কি অপরাধ, আমি করলাম?

তীক্ষ্ণ জ্বলন্ত নেত্রে পারুলের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বাসনা বলল, "কি অপরাধ, তা তুমি জান না? কেন তুমি দুষ্ট গ্রহের মতো আমার সমস্ত জীবনটা নষ্ট করে দিতে চাচ্ছ?—কেন তুমি হরিদ্বার থেকে অমরেশবাবুর সঙ্গে কলকাতায়

ফিরে এলে?—কেন তুমি তোমাদের জাতের ছল-কৌশল খাটিয়ে আমার কাছ থেকে তাঁকে কেড়ে নেবার মতলব করেছ?'

আবেগে উত্তেজনায় ঘন ঘন নিশ্বাস প্রশ্বাসের তাড়নায় বাসনার দেহ বায়ুবিক্ষুব্ধ জলরাশির মত আন্দোলিত হতে লাগল।

ক্ষণকাল স্তব্ধভাবে অপলক নেত্রে বাসনার দিকে তাকিয়ে থেকে ধীর অবিচলিত কণ্ঠে পারুল বলল, 'আমি কিন্তু এ-সব কথা জানতাম না।'

বাসনা বলল, 'জানতে না যদি, এখন তো জানলে। দোহাই তোমার, আমাদের পথ থেকে তুমি সরে যাও। আমাদের দুজনের মধ্যে এমন করে এসে দাঁড়িয়ে আমার সর্বনাশ করো না।'

পারুল বলল, 'অমরেশবাবুও কি মনে করেন, আমি দুজনের মধ্যে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছি?'

বাসনা বলল, 'তিনি কি মনে করেন তা তিনিই জানেন, কিন্তু আমার কথা তা তোমাকে বললাম। দয়া করে তুমি সরে যাও, তাঁকে মুক্তি দাও।'

ভূমিতলে ক্ষণকাল দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে ধীরে ধীরে ঘাড় নেড়ে পারুল বলল, আচ্ছা, তাই হবে,—সরেই যাব।' তারপর চক্ষু উত্তোলিত করে বাসনার দিকে চেয়ে দেখে বলল, আর কোনো কথা আছে?'

বাসনা বলল, 'না, আর কোনো কথা নেই। তোমাকে অনুমতি দেবী ডাকছেন।' বলে পারুলের কক্ষ ত্যাগ করে একেবারে বাজপথে উপস্থিত হয়ে উর এক কোণে গিয়ে আশ্রয় নিল।

জলভরা গভীর মেঘের মত বেদনাগর্ভ মন নিয়ে পারুল ধীর মন্থর গতিতে অনুমতির কক্ষে উপস্থিত হল। তারপর অনুমতির পদপ্রান্তে পালঙ্কের উপর উপবেশন করে বলল, 'মা, তুমি আমাকে ডেকেছ?'

অনুমতি বললেন, 'হ্যাঁ, ডেকেছি! কোথায় ছিলে এতক্ষণ পারুল?'

এ কথার পারুল কোনো উত্তর দিল না, নীরবে বসে রইল।

অনুমতি বললেন, 'বাঁড়ুজ্জে মশায় অনুগ্রহ করে উইলের একটা খসড়া

করে দিয়েছেন. তোমার সামনে এখনি আমরা তাতে সই করব। আমি আমার সমস্ত সম্পত্তি বিনা শর্তে তোমাকে উইল করে দিচ্ছি পারুল। আমার অবর্তমানে তুমি এ সম্পত্তি সম্পূর্ণ নিজের ইচ্ছামত ব্যবহার করতে পারবে কোনো রকম বাধা আমি সৃষ্টি করে যাচ্ছি না। শুধু গোপীনাথের সেবার ভার রইল তোমার ওপর—কিন্তু তাও তুমি নিজের ইচ্ছা মতই করবে সে বিষয়েও তোমার স্বাধীনতা আমি কমিয়ে দিচ্ছি না।'

অনুমতির পায়ের ওপর ডান হাত রেখে আর্তকণ্ঠে পারুল বলল, 'এত বিশ্বাস তোমার এই নোংরা মেয়ের উপর করো না মা। এত অনুগ্রহের আমি যোগ্য নই।'

পারুলের হাত ধরে নিজের কাছে টেনে নিয়ে অনুমতি বললেন, 'তুমি আমার নোংরা মেয়ে নও পারুল, তুমি পবিত্র। যে তোমাকে নোংরা বলে —আমি তাকে বলি নোংরা। তুমি যদি নোংরা হতে, তা হলে গোপীনাথের মোটা আনা সেবা তোমার হাতে ছেড়ে দিতাম না।'

পারুল বলল, 'সে তোমার দয়া,—কিন্তু উইল তুমি করো না মা। এর কোনো দরকার নেই।'

এক মুহূর্ত মনে মনে কি চিন্তা করে অনুমতি বললেন, 'দরকার যে আছে তা তো সেদিন বুঝেছিলে, যেদিন দেশ থেকে আমার আত্মীয়েরা এসে কম চমৎকার ব্যবহার করেছিলেন। বিষয়ের ব্যবস্থা না করে গেলে আমার মৃত্যুর পর গোপীনাথের কি দশা হবে তা ঠিক বলতে পারি না, কিন্তু তুমি যে একদিনও এ বাড়িতে টেঁকতে পারবে না, সে বিষযে বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই।'

'তা হলে দাদার নামে লিখে দাও।'

পারুলের কথা শুনে অনুমতি মৃদু স্বরে হাস্য করে বললেন, 'তোমার নামে লিখে দিলে কি দাদার নামেও লিখে দেওয়া হবে না পারুল? তুমি আর দাদা কি ভিন্ন? আমি তো মনে করি—তোমরা দুজনে দুই দেহ, কিন্তু এক প্রাণ। ছেলেপিলে আমার হয় নি, কিন্তু অমরেশকে দিয়ে আর তোমার

দিয়ে সে সাধ আমার পূর্ণ হয়েছে। তুমি যে আমার কত লক্ষ্মী মেয়ে তা শুধু আমিই জানি। গোপীনাথের কৃপায় তোমাকে পেয়েছি বটে, কিন্তু অদৃষ্ট আমার মন্দ, বেশিদিন ভোগ করতে পেলাম না।'

পারুলের দুই চক্ষু দিয়ে টপ্‌টপ্‌ করে জল ঝরে পড়তে আরম্ভ হয়েছিল, কিন্তু এ কথার পরে আর সে স্থির থাকতে পারল না,—দুই হাত দিয়ে অন্নমতিকে জড়িয়ে ধরে তাঁর দেহের উপর নিজের বেদনাদুর্বল মস্তক স্থাপন করে উচ্ছ্বসিত হয়ে কাঁদতে লাগল।

পারুলের রোদনকম্পিত পৃষ্ঠের উপর বাম হস্ত স্থাপিত করে অন্নমতি দেবীও অশ্রুতে ঘন ঘন চক্ষু মার্জিত করতে লাগলেন। এমন কি গগনবিহারীকেও পকেট থেকে রুমাল বের করে বার কয়েক চক্ষু মুছতে হল। শুধু অমরেশ চেয়ার ছেড়ে উঠে গিয়ে জানলার ধারে পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে রইল।

কিন্তু কান্না এমন সংক্রামক ব্যাধি যে, সে-ও যে সম্পূর্ণ এ থেকে অব্যাহতি লাভ করেছিল ছিল তা বলা যায় না।

একটা অনির্বচনীয় করুণতার পীড়নে সমস্ত ঘরটা থমথম্‌ করতে লাগল।

২৭

পরদিন সকালবেলা।

দালানে একটা কাঠের বড় টেবিলের উপর পূরবী চা তৈয়ার করবার উদ্যোগ করছে, এমন সময় অদূরে বাসনা প্রবেশ করল। মুখ তার আরক্ত, চক্ষে স্পষ্ট উৎকণ্ঠার একটা সুস্পষ্ট উদভ্রান্তত।

দূর থেকে বাসনাকে দেখতে পেয়ে প্রসন্নমুখে পূরবী বলল, 'এই যে বাসনাদি। কি আমাদের সৌভাগ্য যে, সকালবেলাই—' তারপর সমীপগত বাসনার মুখাকৃতি ভাল করে লক্ষ্য করে অসম্পূর্ণ বাক্য অসমাপ্ত রেখেই সত্রাসে জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে বাসনাদি?'

বাসনা বলল, 'কিছু হয় নি। তোমার দাদা কোথায় পূরবী?'

পূরবী বলল, 'দাদা পড়বার ঘরে।'

'আর মাসিমা?'

'মা পূজো করছেন।'

পূরবীর বাম স্কন্ধে দক্ষিণ হস্ত স্থাপিত করে বাসনা বলল, 'তোমার দাদার সঙ্গে একটা জরুরি কথা আছে ভাই,—হয়তো কিছু দেরি হবে। একটু দেখো ও-দিকে যেন কেউ না যায়।'

পূরবী বলল, 'কে আবার ও-দিকে যাবে, তুমি নির্ভয়ে কথা কওগে।' মনে মনে বলল, একে রাগী মানুষ, তাতে মুখ লাল, কথা মানে তো বুঝছি ঝগড়া আজ দেখছি দাদার দিনটা সুবিধের নয়।

ক্ষৌরকার্যের পর অমরেশ ড্রেসিং-টেবিলের উপর ক্ষুর প্রভৃতির সাজিয়ে রাখছিল, পদশব্দে পিছন ফিরে চেয়ে দেখে সহাস্যমুখে বলল, 'বাসনা যে! এস, এস, এই চেয়ারটায় বস।' বলে একটা চেয়ার বাসনার দিকে ঠেলে দিল।

চেয়ারটা অমরেশের কাছে টেনে নিয়ে উপবেশন করে গাম্ভীর্যপূর্ণ মুখে বাসনা বলল, 'তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।'

সকৌতুহলে অমরেশ জিজ্ঞাসা করল, 'কার সঙ্গে?'

'তোমার সঙ্গে।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে স্মিতমুখে অমরেশ বলল, 'যদিও কানে ভারি মিষ্টি লাগছে, তবুও জিজ্ঞাসা করি, আমাকে তুমি 'তুমি' বলে সম্বোধন করছ কেন?'

আরক্তমুখে নতনেত্রে বাসনা বলল, 'আমার খুশি, আমার ইচ্ছে।'

সহাস্যমুখে অমরেশ বলল, 'খুব আনন্দের কথা। এ ছাড়া অন্য কোন কারণ শুনলে এতটা বেশি আনন্দ হত না। এখন বল, কি তোমার কথা?'

একবার দক্ষিণে একবার বামে দৃষ্টি সঞ্চালিত করে ক্ষণেকের জন্য একবার অমরেশের মুখের উপর চকিতনেত্রে চেয়ে দেখে, তারপর ভূমিতলে দৃষ্টি নত করে বাসনা বলল, 'আমাকে তুমি নাও।'

বিস্মিতকণ্ঠে অমরেশ বলল, 'তোমাকে আমি নেব?'

'হ্যা, নেবে।'

'তার মানে কি বাসনা?'

'তার মানে কি, তা বোঝবার মত তোমার যথেষ্ট বুদ্ধি আছে।'

অমরেশ বলল, 'আচ্ছা, তা যেন বুঝলাম, কিন্তু একটা কথা তুমি বোধ হয় তেমন করে ভেবে দেখ নি।'

'কি কথা?'

'আমার বয়স কত, সে বিষয়ে তোমার বোধ হয় একটা আন্দাজ আছে?'

'আছে।'

'তোমার বয়স কত, তা বোধ হয় তুমি নিশ্চয় করে জান?'

'জানি।'

'তা যদি, তা হলে তুমি যেন কতকটা জেনে-শুনে বৈধব্য বরণ করতে চাচ্ছ না?'

অমরেশের কথা শুনে বাসনার মুখে আর্ততার ছায়া পড়ল, উদ্বেগকণ্ঠে সে বলল, 'ছি, এ-সব কথা বলতে নেই। কখখনো আমি তা চাচ্ছি নে।'

অমরেশ বলল, 'ইচ্ছে করে তুমি চাচ্ছ না তা নিশ্চয়, ফলে কিন্তু দাঁড়াচ্ছে তাই। কথাটা একেবারে উপেক্ষা করবার মত সামান্য নয়। তোমার বয়স বড় জোর একুশ বাইশ, আর আমার প্রায় চুয়াল্লিশ। আমার সঙ্গে তোমার যদি বিয়ে হয়, আর আমাদের দুজনের আয়ু যদি সমান অনুপাতে দীর্ঘ হয়—যেটা হওয়া স্বাভাবিক আর বাঞ্ছনীয়—তা হলে তোমার বৈধব্য তো সুনিশ্চিত বাসনা। শুধু সুনিশ্চিতই নয়, দীর্ঘকাল ধরে সে দুর্ভাগ্য তোমাকে বহন করতে হবে—এ কথাটা বোধ হয় তুমি ভেবে দেখ নি।'

ক্ষণকাল স্তব্ধ হয়ে থেকে অমরেশের মুখের উপর এক অপূর্ব ভাবালোকের জ্যোতির্ময় দৃষ্টি স্থাপিত করে বক্ষোচ্ছ্বসিত মুখে বাসনা বলল, 'না, এ কথা এর আগে ভেবে দেখি নি। কিন্তু তুমিও বোধ হয় এ কথা ভেবে দেখ নি যে এমন মেয়েও থাকতে পারে, একজন সাধারণ লোকের সধবা স্ত্রী হয়ে সুখে স্বচ্ছন্দে হেসে খেলে বেড়িয়ে বেড়ানোর চেয়ে বিশেষ কোনো লোকের বিধবা স্ত্রী হয়ে জীবন ধারণ করা যে বেশি গৌরবজনক মনে করে।'

এই অপরূপ শক্তিগর্ভ বাক্য শ্রবণ করে বিমুগ্ধ অমরেশ চেয়ার ত্যাগ করে বাসনার সম্মুখে উপস্থিত হল, তারপর দুই বাহু ধরে তাকে নিজের সামনে দাঁড় করিয়ে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে একবার তার হর্ষব্রীড়াবিহ্বল মুখ শুদ্ধ আনন্দে নিরীক্ষণ করে বলল, 'সাধ্য কি বাসনা, এর পর তোমার হাতে আত্মসমর্পণ না করে আমি রক্ষে পাই! তুমি আজ অপরাজেয় শক্তির দ্বারা আক্রমণ করে

আমাকে জয় করেছ। আমাকে নিশ্বাস ফেলবার সময় দাও নি, প্রস্তুত হবার অবকাশ রাখ নি। আমি নিশ্চয় করে বলতে পারি, যে অদ্ভুত কথা তুমি এখন বললে, তোমার আগে বাংলা দেশের কোনো মেয়ের কখনো তেমন কথা বলবার সামর্থ্য হয় নি। তুমি যথার্থই আজ আমার সুন্দরী বিজয়িনী বধূ।' বলে প্রগাঢ় অনুরাগের সহিত বাসনার কণ্ঠে বাহু বেষ্টিত করল।

অমরেশের মুখের দিকে তাকিয়ে সজল চক্ষে বাসনা বলল, 'এবার তা হলে পায়ের ধুলো নিতে দেবে তো?'

অমরেশ বলল, 'না, না, পায়ের ধুলো নেবে কি! এ কিন্তু তোমাদের বাংলা দেশের মেয়েদের ভারি একটা বদ অভ্যাস।'

'হোক বদ অভ্যাস, তবু নিই।' বলে অঞ্চলে চক্ষু মার্জিত করে নত হয়ে বাসনা অমরেশের পদস্পর্শ করল।

নিজ নিজ চেয়ারে উপবেশন করবার পর উভয়ে ক্ষণকাল ভাবচকিত চিত্তে আত্মবিস্মৃত হয়ে বসে রইল। তারপর অমরেশ মৌনভঙ্গ করে বলল, 'আসল পালা তো সগৌরবে সাঙ্গ করলে বাসনা। কিন্তু গৌণ দু-একটা কথা এখনো বাকি রয়েছে।'

সকৌতূহলে বাসনা জিজ্ঞাসা করল, 'কি কথা?'

'তোমার বাপ-মার মত নিয়ে এখানে এসেছ কি?'

বাসনা বলল, 'না।'

'তাঁরা যদি অমত করেন?'

'সে ভাবনা তোমার নয়, সে ভাবনা আমার, সে ভাবনা দাদামশায়ের। দাদামশায়কে ফোনে জানিয়ে এসেছি।'

'তাঁর সঙ্গে কাল রাত্রে এ বিষয়ে কোনো কথা হয়েছিল?'

'তা কেমন করে হবে? এ মতলব তো স্থির করলাম রাত দুটোর সময়। কাল সারারাত এক মিনিটও কি চোখ বুজেছি!'

অমরেশের মুখে নিঃশব্দ হাস্যফুটে উঠল ; বলল, 'তা কতকটা বুঝতে পারছি। অনুমতি দেবী তোমাকে কাল অতিশয় ভাবিয়ে দিয়েছিলেন।'

সহাস্য মুখে বাসনা বলল, 'শুধু অতিশয় নয়, যৎপরোনাস্তি।'

অমরেশ বলল, 'মেজদাদাকে কি বললে তুমি আজ?'

'বিশেষ কিছুই বললাম না ; শুধু বললাম, তোমার কাছে যাচ্ছি।'

'তাতে তিনি কি বললেন?'

'তিনি বললেন, নিশ্চয় যাও, আরো আগে যাওয়া উচিত ছিল। আর বললেন—' কথা শেষ না করে সহসা বাসনা অসমাপ্ত বাক্যের মধ্যে থেমে গেল।

সকৌতূহলে অমরেশ জিজ্ঞাসা করল, 'আর কি বললেন, বল?'

একমুহূর্ত অপেক্ষা করে আরক্ত মুখে বাসনা বলল, 'বললেন, যেমন করে পার জোড়ে বাড়ি ফিরো. আমি সেখানে গিয়ে তোমাদের দুজনের অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করে রাখব। দাদামশায় উপস্থিত থাকলে আমাদের কোনো অসুবিধা হবে না, এ তুমি নিশ্চয় জেনো। সুতরাং এ বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত হতে পার। আর কি কথা আছে তোমার বল?'

অমরেশ বলল, 'আর শুধু একটা কথা আছে। সে কথা হচ্ছে পারুলকে নিয়ে। তোমার-আমার সম্পর্কে পারুলের প্রসঙ্গ একেবারে অবান্তর। কোনো দিন কোনো বিষয়ে মুহূর্তের জন্যও তার সঙ্গে তোমার বিন্দুমাত্র প্রতিযোগিতার কারণ ঘটে নি। কিন্তু তবুও তুমি নিতান্ত ছেলেমানুষি করে একেবারে অকারণে তার সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে নিয়ে এমন একটা জটিলতার সৃষ্টি করেছিলে, আমাদের মিলন নিখুঁত হওয়ার জন্য যা একটু পরিষ্কার হয়ে গেলে ভাল হয়। কাল তুমি অনুমতি দেবীর বাড়িতে শুনেছ, ভবিষ্যতে পারুলকে দেখা-শোনার ভার আমার ওপর একটু বেশি রকম পড়তে পারে। সুতরাং তোমার-আমার জীবনের মধ্যে পারুল একেবারে সহজ হয়ে যাওয়া দরকার। তা ছাড়া. কাল রাত্রে তুমি রীতিমত কোমর বেঁধে পারুলের সঙ্গে ঝগড়া করে এসেছ। পারুল অবশ্য আমাকে সে বিষয়ে একটা কথাও বলে

নি। চাঁপার মার মুখে খানিকটা আভাস পেয়ে এসেছি।' বলে অমরেশ হাসতে লাগল।

বাসনা বলল, 'হ্যাঁ, কাল রাত্রে পারুলের সঙ্গে ঝগড় করেছি বটে, কিন্তু তাকে ঘৃণা করি না, ভয় করি, হিংসে করি—এ কথাও জানিয়ে এসেছি। কিন্তু সে কথা যাক। পারুলের বিষয়েও তুমি তোমার মন নিশ্চিন্ত কর। আমি আগেই স্থির করে রেখেছি, তার কাছে ক্ষমা চাইব।'

স্নিগ্ধ কণ্ঠে অমরেশ বলল, 'এ তুমি পারবে বাসনা?'

বাসনার মুখে মৃদু হাস্যরেখা দেখা দিল; বলল, 'নিশ্চয় পারব। তোমাকে পাবার জন্য লজ্জা-সঙ্কোচ ত্যাগ করে তোমার বাড়ি ছুটে আসতে পারলাম, আর তোমাকে পাওয়ার পর পারুলের কাছে ক্ষমা চাইতে পারব না? আগে অনুমতি দেবীর বাড়ি গিয়ে পারুলের কাছে ক্ষমা চাইব, তারপর বাড়ি ফিরব। এ বিষয়ে মন ভারি করে বেশিক্ষণ আমি থাকতে পারব না। তুমি চল, আর দেরি করো না।'

অমরেশ বলল, 'এ তো খুবই ভাল কথা। তুমি পুনবাবুর কাছে গিয়ে মিনিট দুই অপেক্ষা কর, আমি এখখুনি আসছি।'

খানিকটা এগিয়ে গিয়ে পুনরায় ফিরে এসে ঈষৎ আরক্ত মুখে বাসনা বলল, 'একটা জিজ্ঞেস করব তোমাকে?'

অমরেশ বলল, 'হ্যাঁ, নিশ্চয় করবে।'

এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বাসনা বলল, 'আচ্ছা, নিতান্ত জোর করে তোমার ঘাড়ে পড়লাম, না, তুমিও আমাকে ভালবাসতে?'

উৎসাহ ভরে অমরেশ বলল, 'বাঃ! সে কি কথা? আমিও নিশ্চয় ভালবাসতাম।'

ব্যগ্র কণ্ঠে বাসনা বলল, 'না, না, স্নেহ-টেহর কথা বলছি না, আমার মত ভালবাসতে কি না?'

হাসি মুখে অমরেশ বলল, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ, তোমারই মত ভালবাসতাম, কিন্তু তোমার চেয়েও বেশি বাসতাম।'

তবে আমাকে চাইতে না কেন?'

'তুমি তোমাকে ভালবাসতে বলে আমাকে চাইতে,—আর, আমি তোমাকে তার চেয়েও বেশি ভালবাসতাম বলে তোমাকে চাওয়ার লোভ সম্বরণ করতাম। তোমাকে যেন পাই, এ কামনা সমীচীন নয় মনে করে মনের মধ্যে সে কামনা প্রবেশ করতে দিতাম না। কিন্তু তোমাকে যেন না হারাই, এই কামনায় মন ভরে থাকত। সত্যি কিন্তু কিছুতেই ঠেকাতে পারতাম না।

মৃদু হেসে বাসনা বলল, 'তবু ভাল।'

অমরেশ বলল, 'তোমাকেও একটা কথা জিজ্ঞাসা করব বাসনা। এই ছ মাস ধরে এত [illegible] করলে — [illegible] তুমি পেলে বল তো?'

বাসনা বলল, 'সত্যি কথা বলব?'

'বল না।

যতটা পারি মন দিয়ে পূজা পাঠ তো করি, কিন্তু দেবতার দেখা পাই না।' তারপর এক মুহূর্ত অপেক্ষা করে আরক্ত মুখে বলল, 'পূজোর শেষ প্রণাম করতে যখন যাই, তখন প্রায়ই দেখি মনের মধ্যে দেবতার বদলে একজন নাস্তিকের মূর্তি এসে দাঁড়িয়েছে।' বলে খিল খিল করে হেসে উঠল।

চক্ষু বিস্ফারিত করে অমরেশ বলল, 'বল কি বাসনা! এখনো সে নাস্তিক তোমার দেবতাকে ঠেকিয়ে রেখেছে নাকি? ভারি জবরদস্ত লোক তো দেখছি!'

সহাস্যমুখে বাসনা বলল, 'উঃ! ভারি জবরদস্ত লোক! আমাকে নাস্তানাবুদ করে ছেড়েছে!'

অমরেশ বলল, 'কিন্তু তুমিও তো কম জবরদস্ত লোক নও বাসনা। সেই জবরদস্ত লোককে আজ তুমি অবলীলাক্রমে নাস্তানাবুদ করে ছাড়লে!'

একটু অন্যমনস্কতার সহিত বাসনা বলল, 'সে কথাও সত্যি। শুনেছিলাম কঠোর বৈরাগ্য,—কিন্তু দেখলাম, কতকটা সহজেই যোগভঙ্গ হল।'

অমরেশ বলল, 'তাতে আর আশ্চর্য কি বল? তোমাদের মত সুন্দরী মেয়েরা সেই পৌরাণিক যুগ থেকে মুনি ঋষিদের যোগভঙ্গ করে আসছে। আমি তাদের কাছে কোন্ ছার! কিন্তু শোন। তোমার চিঠিতে সোনালী রঙের কথা লিখেছিলে মনে আছে?'

বাসনা বলল, 'আছে।'

'তোমার অভিশাপ ব্যর্থ হয় নি, সোনালী রঙের ধাঁধায় আমার মন ভরে গেছে। কিন্তু সে সোনালী রঙ ভগবদ্ভক্তির নয়,—তোমার প্রেমের।'

অমরেশের প্রতি চকিত চক্ষের একটা সুমিষ্ট দৃষ্টি নিক্ষেপ করে আনন্দোদ্বেল হৃদয়ে বাসনা পূরবীর নিকট উপস্থিত হল। দু-চার মিনিট পরেই তথায় অমরেশ উপস্থিত হয়ে বলল, 'কি রে পূরবী, কি নিয়ে অত তর্ক করছিস?'

পূরবী বলল, 'দেখ না দাদা, বাসনাদি বলছেন—চা একটুও খাবেন না।'

অমরেশ বলল, 'তা হলে আমারও তো খাওয়া হল না বাসনা। অতিথি অভুক্ত থাকবে, আর—'

অমরেশকে কথা শেষ করতে না দিয়ে বাসনা বলল 'না, না, তুমি খাও। অতিথি তাড়াতাড়ি খেতে পারে না, ফিরে এসে খাবে।' তারপর টেবিলের উপর থেকে খাবারের একটা প্লেট নিয়ে অমরেশের দিকে এগিয়ে ধরে বলল, 'নাও, ধর। দেরি করো না, তাড়াতাড়ি খেয়ে নাও।' পূরবীর দিকে তাকিয়ে বলল, 'কিছু মনে করো না ভাই পূরবী, তোমার কাজটা আমিই সেরে দিচ্ছি।'

বিস্মিত মুখে পূরবী বাসনার কথা শ্রবণ করছিল। সকৌতূহলে বলল, 'তা না হয় মনে করব না। কিন্তু বাসনাদি, তুমি দাদাকে 'তুমি' বলছ যে?'

হো হো করে হেসে উঠে অমরেশ বিমূঢ়া আরক্তমুখী বাসনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলল, 'তুমি নিজের ফাঁদে ধরা পড়ে গেছ বাসনা।'

উগ্র ঔৎসুক্যের সহিত পূরবী জিজ্ঞাসা করল, 'কি হয়েছে দাদা?

সহাস্যমুখে অমরেশ বলল, 'আজ থেকে আমাকে তোর বাসনাদি 'তুমি' বলেই ডাকবে পূরবী।'

এক মুহূর্ত স্তব্ধ ভাবে চিন্তার পর সহসা অমরেশের কথার মর্মোপলব্ধি করে আনন্দে অধীর হয়ে পূরবী বাসনাকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'বউদি ?'

সলজ্জ মুখে পূরবীর কানে কানে অতি মৃদুস্বরে বাসনা বলল, 'হ্যাঁ ভাই, ঠাকুরঝি।'

শুনে পূরবী বাসনাকে আলিঙ্গনমুক্ত করে লাফিয়ে উঠল, 'কক্ষণো নয়। ও পাড়াগাঁয়ে নাম কক্ষণো নয়। তুমি আমাকে পূরবী বলেই ডাকবে। তারপর ব্যস্ত হয়ে প্রসন্ন মুখে বলল, 'যাই মাকে বলে আসি।'

পূরবীকে নিরস্ত করে অমরেশ বলল, 'এখন নয় পূরবী। একটু পরে ফিরে এসে আমরা দুজনে মাকে প্রণাম করব,—তখন বলিস।'

এ প্রস্তাব পূরবীর সমীচীন বলে বোধ হল। কিন্তু বাসনার আপত্তিতে সে আর বিন্দুমাত্র কর্ণপাত করল না, দাদা এবং নবোদ্ভূতা বউদিকে পেট ভরে চা ও জলখাবার খাইয়ে তবে সে ছাড়ল।

অমরেশ ও বাসনা যখন মোটরে গিয়ে আরোহণ করল তখন ঘন কুজ্ঝটিকায় রাজপথ আচ্ছন্ন।

২৮

অনুমতির গৃহদ্বারে উপনীত হয়ে অমরেশ ও বাসনা মোটর হতে অবতরণ করে দরজার সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল। কড়ায় হাত দিয়েই হাত সরিয়ে নিয়ে অমরেশ সহাস্যমুখে বলল, 'বিশেষ করে তোমার প্রয়োজনেই যখন আমরা এসেছি, তখন তুমিই কড়া নাড়ো।'

কড়া ধরে বাসনা একটু জোরের সঙ্গেই নাড়া দিল।—জীবন-নাট্যের নূতন অঙ্কের অজানা সম্ভাবনার আবেগে তার মনের তন্ত্রী আবার একটু চড়া সুরেই উঠে গিয়েছিল।

দু-তিনবার নাড়া দিতেই চাঁপার মা এসে দরজা খুলল। অমরেশ ও বাসনাকে দেখে সে চোখে কাপড় দিয়ে ফাঁস-ফাঁস করে কাঁদতে লাগল।

ব্যস্ত হয়ে বাসনাকে পাশে ঠেলে দিয়ে এগিয়ে গিয়ে অমরেশ জিজ্ঞাসা করল, 'কাঁদছ কেন চাঁপার মা? কি হয়েছে? মাসিমা কেমন আছেন?'

কাঁদতে কাঁদতে চাঁপার মা বলল, 'মা ভাল আছেন, দিদিমণি নেই।'

'নেই কি! কি হয়েছে তার?'

'চলে গেছে।'

'কোথায় চলে গেছে?'

'তা তো জানি নে; মার কাছে যাও জানতে পারবে।'

দ্রুতবেগে অনুমতির ঘরে উপস্থিত হয়ে অমরেশ জিজ্ঞাসা করল, 'পারুলের কি হয়েছে মাসিমা? কোথায় গেছে সে?'

শান্ত নেত্রে অমরেশের দিকে তাকিয়ে অনুমতি বললেন, 'আজ সকাল থেকে তাকে দেখতে পাওয়া যায় নি। রাত্রি দুটো পর্যন্ত জোর করে আমার কাছে ছিল। শেষ-রাত্রে কোনো সময়ে খিড়কির দোর খুলে বেরিয়ে দোরে তালা দিয়ে চলে গেছে। দুখানা চিঠি—একখানা তোমাকে লেখা আর একখানা আমাকে লেখা—তার টেবিলের উপর রেখে গেছে।' মাথার শিয়র হতে একখানা চিঠি বার করে অমরেশের হাতে দিয়ে বললেন, 'এই তোমার চিঠি। পড়ে দেখলেই বোধ হয় অনেক কথা বুঝতে পারবে।'

নিকটবর্তী একটা চেয়ারে উপবেশন করে খাম ছিঁড়ে অমরেশ চিঠি পড়তে লাগল। বাসনাও অমরেশের পিছনে দাঁড়িয়ে চেয়ারের পিঠে ভর দিয়ে চিঠির উপর দৃষ্টি বুলিয়ে চলল। চিঠি দীর্ঘ নয়, সংক্ষিপ্ত।

'শ্রীশ্রীচরণেষু,

হেরে গেলেন দাদা! কয়লার ময়লা ছাড়াতে পারলেন না। আবার গরানহাটা স্ট্রীটে ফিরে চললাম। ভদ্র সমাজ আমার অদৃষ্টে সইল না, তাই আবার নিজের গোয়ালেই নাম লেখাতে চলেছি। তীর্থে যাবার আগে একদিন ঠাট্টা করে বলেছিলেন, আবার আমাকে গরানহাটা স্ট্রীটে গাইয়ে বিনির বাড়ি রেখে দেবেন। শেষ পর্যন্ত তাই হল। আপনার কথা বেদবাক্য, ভুল হবার যো কি?

গোপীনাথকে ছেড়ে যাচ্ছি তার জন্য তত দুঃখ নেই, যত দুঃখ আপনাকে ছেড়ে যাচ্ছি বলে। আপনি সে আমার কি, তা অনেকেই বুঝতে পারে না। তাই সামান্য কথা সন্দেহ করে ভুল করে। যার কথা যার চিঠিতেই লিখব, আপনার চিঠিতে আর লিখলাম না।

দুই-এক দিনের মধ্যে মার আর গোপীনাথের একটা সুব্যবস্থা দয়া করে করে দেবেন। এ কথা আপনাকে সুব্যবস্থা দয়া করে দেবেন। এ কথা আপনাকে লেখা বাহুল্য, তবু লিখে একটু শান্তি পাচ্ছি।

আমার জীবনটা ভারি অদ্ভুত। দুই দিকে ঘন অন্ধকার, মাঝখানে কিছুদিন আলোর খেলা। এই আলোর সূর্য আপনি!

আপনার চরণে শত কোটি প্রণাম। ইতি

অভাগিনী—পারুল'

চিঠি শেষ করে অমরেশ এবং বাসনা উভয়েই অচিন্তিত বেদনার আঘাতে নির্বাক হয়ে বসে রইল। যে আনন্দের দীপ্তিতে ক্ষণকাল পূর্বে তাদের হৃদয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছিল, বিষাদের সুনিবিড় ছায়াপাতে তা সহসা মলিন হয়ে গেল।

অনুমতি বললেন, 'আজ আমি নিঃশব্দে পড়ে থাকব অমর, কথাবার্তা বেশি কইব না। কাল তুই একবার আসিস। আমাকে লেখা পারুলের চিঠিটা পড়ে যা হয় একটা কিছু পরামর্শ করিস।'

অমরেশ বললে, 'তোমাকে দেখা-শোনা করবার জন্য পূরবীকে রেখে যাই মাসিমা।'

এ প্রস্তাবে অনুমতি কিছুতেই স্বীকৃত হলেন না; বললেন 'চাঁপার মা সবই জানে, ওকে দিয়ে বেশ চলে যাবে। আজ না-হয় সন্ধ্যার পর তুই একা একবার আসিস।'

অমরেশ বলল, 'সন্ধ্যার পর নয়, একটু পরেই এসে আমি সমস্ত ব্যবস্থা করছি। যতদিন না তুমি সেরে ওঠ, আমি এখানেই থাকব।'

এ প্রস্তাবেও অনুমতি প্রবলভাবে আপত্তি করলেন; কিন্তু যখন বুঝলেন কিছুতেই অমরেশকে নিবৃত্ত করা যাবে না, তখন অগত্যা চুপ করে রইলেন।

এই শোচনীয় অবস্থায় অনুমতি দেবীর পক্ষে অন্তত কিছুক্ষণেরও জন্য দেহ ও মনের বিশ্রাম একান্ত আবশ্যক বিবেচনা করে বাসনাকে নিয়ে অমরেশ অবিলম্বে উঠে পড়ল।

গাড়িতে এসে বসে বাসনা ড্রাইভারকে নেমে গিয়ে দূরে অপেক্ষা করতে বলল। সে চলে গেলে অমরেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বলল, 'এ অনর্থের জন্য অপরাধী আমি। তোমার কাছে দোষ স্বীকার করছি—আমি পারুলকে সরে

যেতে বলেছিলাম। কিন্তু চলে যেতে বলি নি ; বলেছিলাম আমাদের পথ থেকে সরে যেতে।'

কিছু না বলে অমরেশ নিঃশব্দে বাসনার একখানা হাত নিজের হাতের মধ্যে টেনে নিল।

অমরেশের হাত থেকে ধীরে ধীরে নিজের হাত মুক্ত করে নিয়ে বাসনা বলল, 'শোন। গরানহাটা স্ট্রীটে চল। ক্ষমা চেয়ে এখনি পারুলকে ফিরিয়ে আনব!'

এ সঙ্কল্প হতে আপাতত নিরস্ত হব'র জন্য অমরেশ বাসনাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করল, কিন্তু বাসনা কিছুতেই নিবৃত্ত হল না ; বলল, 'তুমি তো আমার প্রকৃতি জান, এখনি এ কাজ না করলে আমার আহার নিদ্রা পর্যন্ত বন্ধ হয়ে যাবে।'

অগত্যা ধর্মতলার মোড় পর্যন্ত এসে গাড়িটা এক জায়গায় অপেক্ষা করতে বলে একটা ট্যাক্সি নিয়ে বাসনার সহিত অমরেশ গরানহাটা স্ট্রীটে উপস্থিত হল। ও অঞ্চলে গাইয়ে বিনি যথেষ্ট বিখ্যাত ব্যক্তি, সুতরাং তার বাড়ির সন্ধান করা বিশেষ কঠিন হল না।

একটি তরুণীকে সঙ্গে নিয়ে একজন ভদ্রলোক ট্যাক্সি করে এসেছেন শুনে কৌতূহলী হয়ে গৃহের ভিতর হতে একজন স্ত্রীলোক বহির্গত হয়ে এল। অমরেশ তার কাছে পারুলের সংবাদ অনুসন্ধান করল।

অমরেশকে অপেক্ষা করতে বলে স্ত্রীলোকটি অন্দরে প্রবেশ করল।

মিনিট দুয়েক পর একটি স্থূলকায়া রমণী নির্গত হয়ে অমরেশের ট্যাক্সির কাছে এসে বলল, 'আপনার নাম কি জানতে পারি।'

অমরেশ বলল 'আমার নাম অমরেশ মুখোপাধ্যায়।'

স্ত্রীলোকটি বললে, 'তা হলে ঠিক হয়েছে। আজ সকালে পারুল এখানে এসেছিল, কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক থেকেই আবার কোথায় চলে গিয়েছে। আপনার

নামে একখানি চিঠি লিখে আপনি এসে দিতে বলে গিয়েছে।' ব'লে একখানা চিঠি অমরেশের হাতে দিল।

চিঠিখানি তাড়াতাড়ি খুলে অমরেশ ও বাসনা পড়তে লাগল।

'শ্রীশ্রীচরণেষু,

দাদা, আমার মাথাটি আপনি একেবারে ঘোল খাইয়ে গেছেন দেখছি। আমার এ কূল ওকূল দুকূল গেল এখানেও টেঁকাতে পারলাম না। দুঃখে দম বেরিয়ে আসে। কিন্তু তাতে কিছু আসে-যায় না। যে ছলনার মন্ত্র আপনি আমাকে পড়িয়েছেন, আমার আশ্রয়ের ভাবনা কি? এবার নাই ঘর ছেড়ে বাইরে বেরিয়ে পড়লাম।

কেমন বারে বারে মনে হচ্ছে, একবার আপনি এখানে নিশ্চয় আমার খোঁজে আসবেন। তাই আপনার নামে এই চিঠি লিখে রেখে যাচ্ছি। এবার কিন্তু কোনো সন্ধান দিয়ে গেলাম না। সুতরাং বোধ হয় এ জন্মের মত আপনার কাছ থেকে বিদায়। 'পরজন্মে যাতে আপনাকে আপন জনের মত পাই, এ জীবনে এই প্রার্থনাই শুধু করব।

আমার শতকোটি প্রণাম গ্রহণ করবেন। ইতি

অভাগিনী—পারুল'

পার্শ্ববর্তিনী বাসনার প্রতি দৃষ্টিপাত করে অমরেশ দেখল, গাড়ির কোণে মাথা রেখে সে উচ্ছ্বসিত হ'য়ে রোদন করছে। 'আচ্ছা, তা হলে চললুম।' ব'লে স্ত্রীলোকটির কাছে বিদায় গ্রহণ ক'রে ড্রাইভারকে অমরেশ বলল, 'বর্মতলা চলো।' তারপর বাসনার মাথায় হস্তার্পণ করে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে বলল, 'কাঁদছ কেন বাসনা?'

অঞ্চলে চক্ষু মার্জিত ক'রে বাসনা বলল, 'অদৃষ্টে তোমার সঙ্গে আমার মিলন নেই দেখছি।

ব্যগ্রকণ্ঠে অমরেশ বলল, 'কেন বাসনা এ কথা বলছ কেন? তোমার সঙ্গে র মিলনের বাকি নেই তো কিছু?'

বাসনা বলল, 'তোমাকে যখন আত্মসমর্পণ করেছি, তখন মৃত্যু পর্যন্ত তোমার জন্য অপেক্ষা করব—এ তো নিশ্চয়। কিন্তু পারুলের কাছ থেকে ক্ষমা না পাওয়া পর্যন্ত তোমার সঙ্গে আমার বিয়ে হতে পারে না। পারুলের কাছে ক্ষমা ভিক্ষা করে নিয়ে তবে তোমাকে বিয়ে করব—পারুলের প্রথম চিঠি পড়ার পর এ প্রতিজ্ঞা মনে মনে করেছি। কিন্তু পারুল তার সুযোগ দিল না।'

অমরেশ বলল, 'পারুলের দেখা যদি এখন দশ বৎসর না পাও।'

'তা হলে দশ বৎসর তোমার জন্য অপেক্ষা করে থাকব।'

বাসনার কথা শুনে অমরেশের ললাটে দুশ্চিন্তার রেখা দেখা দিল। নিঃশব্দে সে বাসনার পাশে বসে রইল।

ধর্মতলায় এসে অমরেশ ভাড়া দিয়ে ট্যাক্সি বিদায় করে দিল। তারপর, কার্জন পার্কে গিয়ে গাছতলায় একটা বেঞ্চের উপর বাসনাকে নিয়ে উপবেশন করল।

ক্ষণকাল নীরবে বসে থাকার পর সহসা অমরেশের মুখ প্রফুল্ল হয়ে উঠল। বাসনার একখানা হাত নিজ হস্তের মধ্যে গ্রহণ করে সে বলল, 'কোনো ভয় নেই বাসনা, এখনি তুমি পারুলের ক্ষমা পাবে।

চকিত নেত্রে অমরেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করে বাসনা বলল, 'এখনি পাব ?'

অমরেশ বলল, 'হ্যাঁ, এখনি পাবে।'

গভীর বিস্ময়ে বাসনা জিজ্ঞাসা করল, 'কি করে ?'

অমরেশ বলল, 'কি করে তা বলছি। কিন্তু তার আগে একটা কথা তোমাকে জিজ্ঞাসা করি। জল-মাটি-গাছপালার এই বাস্তব পৃথিবী ছাড়া, মানুষের একটা অধ্যাত্ম জগৎও আছে, তা তুমি স্বীকার কর ?'

বাসনা বলল, 'করি।'

'শ্রদ্ধা আছে তার প্রতি !'

'আছে।'

'তা হলে আমার মুখ দিয়ে তুমি পারুলের ক্ষমা পাবে। বিশ্বাস কর, এ অধিকার আমার আছে। পারুলের হয়ে আমি তোমাকে সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা

করলাম।' বলে নিজের আঙুল থেকে স্বর্ণাঙ্গুরি উন্মোচিত করে বাসনার আঙুলে পরিয়ে দিল।

অমরেশের মুখের দিকে চেয়ে বিহ্বল নেত্রে বাসনা জিজ্ঞাসা করল, 'এ কি আমি সত্যি সত্যি পারুলেরই ক্ষমা পেলাম?'

স্মিতমুখে স্নেহার্দ্র কণ্ঠে অমরেশ বলল, 'পেলে কি-না, পারুলের সঙ্গে কখনো যদি দেখা হয়, জিজ্ঞাসা করে দেখো। আপাতত আমার মুখ থেকে শুনে রাখ, নিশ্চয় পেলে। তা যদি না পেয়ে থাক, তা হলে এ কথাও নিশ্চয় জেনো, পারুল আমার জীবনে ব্যর্থ হয়েছে, আর আমি ব্যর্থ হয়েছি তোমার জীবনে।'

অমরেশের মুখের উপর হতে তার দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে এক মুহূর্ত বাসনা মনে মনে কি চিন্তা করল, তারপর মৃদুস্বরে বলল, 'কিন্তু আমার জীবনে তুমি তো ব্যর্থ হও নি।'

শান্ত-স্মিত মুখে অমরেশ বলল 'হই নি, তা আমি নিশ্চয় করে জানি।' তারপর বাসনার দক্ষিণ হাতখানা নিজ হস্তের মধ্যে গ্রহণ করে ডাকল, 'বাসু!'

আরক্ত মুখে জিজ্ঞাসু নেত্রে বাসনা অমরেশের প্রতি দৃষ্টিপাত করল।

'এবার কি তা হলে আমরা যেতে পারি?'

বেঞ্চ থেকে ধীরে ধীরে উঠে বাসনা বলল, 'চল।'

বাসনাকে নিয়ে কার্জন পার্ক থেকে বেরিয়ে এসে মোটরে আরোহণ করে অমরেশ বলল, 'বালিগঞ্জ।'

দ্রুতবেগে গাড়ি শৈলনাথের গৃহাভিমুখে ধাবিত হল।